তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম-৩
প্রথম খণ্ড
সেবা
কিশোর
থ্রিলার

হারানো তিমি

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

'ওই যে, তিমির ফোয়ারা!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত রবিন। 'আরে দেখছ না, ওই যে···ওইই,' সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

এইবার দেখল মুসা। ঠিকই। তীর থেকে মাইল তিন-চার দূরে ভেসে উঠেছে যেন ছোটখাট এক দ্বীপ, পানির ফোয়ারা ছিটাচ্ছে। মিনিটখানেক এদিক ওদিক পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল আবার ধূসর মস্ত জীবটা।

সৈকতের ধারে উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা ঃ কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। আবার এসেছে বসন্ত, স্কুল ছুটি। এই ছুটিতে তিমির ওপর গবেষণা চালাবে ওরা, ঠিক করেছে। খুব ভোরে তাই সাইকেল নিয়ে ছুটে এসেছে সাগর পারে, তিমির যাওয়া দেখার জন্যে।

প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারির এই সময়ে আলাসকা আর মেকসিকো থেকে আসে তিমিরা, হাজারে হাজারে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে চলে যায়, যাওয়ার পথে থামে একবার বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। মেয়েরা বাচ্চা দেয় ল্যাগুনের উষ্ণ পানিতে, পুরুষেরা বিশ্রাম নেয়।

কয়েক হপ্তা পর বাচ্চারা একটু বড় হলে আবার বেরিয়ে পড়ে ওরা। এবার আর থামাথামি নেই, একটানা চলা। প্রায় পাঁচ হাজার মাইল সাগরপথ পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছায় উত্তর মেরুসাগরে। গরমের সময় ওখানকার পানি ছেয়ে থাকে খুদে চিংড়ি আর প্ল্যাঙ্কটনে, ধূসর তিমির প্রিয় খাবার।

'যাওয়ার সময় সবাই দেখে ওদেরকে,' বলল রবিন, 'কিন্তু ফেরার সময় দেখে না।' আগের দিন রকি বীচ লাইব্রেরিতে তিমির ওপর পড়াশোনা করে কাটিয়েছে সে। যা যা গিলেছে সেগুলো উগড়াচ্ছে এখন।

'কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'ফেরার পথে হদিস রাখা যায় না বোধহয়,' হাতের খোলা নোটবুকের দিকে তাকাল আরেকবার রবিন। 'যাওয়ার সময় দল বেঁধে যায় ওরা, সবার চোখে পড়ে। ফেরার পথে বড় একটা পড়ে না, হয়তো একা একা ফেরে বলে। কারও কারও মতে ফেরে একা নয়, জোড়ায় জোড়ায়। তাহলেও বিশাল সাগরে দুটো তিমির পেছনে কে কতক্ষণ লেগে থাকতে পারবে? পথ তো কম নয়, হাজার হাজার মাইলের ধাক্কা।'

'তা ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

কিন্তু ওদের কথায় কান নেই গোয়েন্দাপ্রধানের। দূরে সাগরের যেখানে তিমির ফোয়ারা দেখা গেছে, সেদিকেও চোখ নেই। সে তাকিয়ে আছে নিচের নির্জন

সৈকতের একটা অগভীর খাঁড়ির দিকে। আগের দিন রাতে ঝড় হয়েছিল, ঢেউ নানারকম জঞ্জাল—ভাসমান কাঠের গুঁড়ি, প্ল্যাসটিকের টুকরো, খাবারের খালি টিন, উপড়ানো আগাছা, শেওলা, আরও নানারকম টুকিটাকি জিনিস এনে ফেলেছে খাঁড়িতে।

'কি যেন একটা নড়ছে,' বলে উঠল কিশোর। 'চলো তো, দেখি।' কারও জবাবের অপেক্ষা না করেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। তাকে অনুসরণ করল অন্য দুজন।

ভাটা শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যেই অর্ধেক নেমে গেছে পানি। খাঁড়ির কাছে এসে থামল কিশোর, আঙুল তুলে দেখাল।

'আরে তিমি!' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আটকে গেছে। সাহায্য না পেলে মরবে।'

তাড়াতাড়ি জুতো-মোজা খুলে নিল তিনজনে। শুকনো বালিতে রেখে, প্যান্ট গুটিয়ে এসে নামল কাদাপানিতে।

ছোট্ট একটা তিমি, মাত্র ফুট সাতেক লম্বা। বাচ্চা তো, তাই এত ছোট—ভাবল রবিন। ঝড়ের সময় কোনভাবে মায়ের কাছছাড়া হয়ে পড়েছিল, ঢেউয়ের ধাক্কায় এসে আটকা পড়েছে চরায়।

সৈকত এখানে বেশ ঢালু, ফলে খুব দ্রুত নামছে পানি। ওরা তিমিটার কাছে আসতে আসতেই গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেল পানি। এতে সুবিধেই হলো ওদের। বেশি পানি হলে অসুবিধে হত, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, বরফ-শীতল পানি। তবে পানি কমে যাওয়ায় বাচ্চাটা পড়ল বিপদে, সাগরে নামতে পারছে না।

তিনজনে মিলে গায়ের জোরে ঠেলা-ধাক্কা দিল, কিন্তু নড়াতে পারল না ওটাকে। হাজার হোক তিমির বাচ্চা তো, যত ছোটই হোক, মানুষের জন্যে বেজায় ভারি। তিরিশ মণের কম না, ভাবল কিশোর। বান মাছের মত পিচ্ছিল শরীর, হাত পিছলে যায়। তার ওপর না ধরা যাচ্ছে পাখনা, না লেজ, কিছু ধরে টেনেটুনে যে সরাবে তারও উপায় নেই। বেশি জোরে টানাটানি করতেও ভয় পাচ্ছে, কি জানি কোথাও যদি আবার ব্যথা পায় তিমির বাচ্চা।

ওদের মোটেও ভয় পাচ্ছে না বাচ্চাটা, যেন বুঝতে পেরেছে, ওকে সাহায্য করারই চেষ্টা হচ্ছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে। কথা বলতে পারলে বুঝি বলেই উঠত ঃ মারো জোয়ান হেঁইও, জোরসে মারো হেঁইও।

রবিন এসে দাঁড়াল মাথার কাছে। বিশাল মাথা ধরে ঠেলার চেষ্টা করতে গিয়েই খেয়াল করল, ফোয়ারার ছিদ্রটা অন্যরকম। ভুল ভেবেছে এতক্ষণ। বাচ্চা তিমি না এটা।

কিশোর আর মুসাকে কথাটা বলতে যাবে, এই সময় বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল, এক ধাক্কায় চিত করে ফেলল ওদেরকে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার খাড়া হলো ওরা, ততক্ষণে চলে গেছে পানি। ঢেউ আসার আগে গোড়ালি অবধি ছিল, সেটা কমে গিয়ে হয়েছে বুড়ো আঙুল সমান। খাঁড়ি থেকে উঠে তিমিটা গিয়ে আরও খারাপ জায়গায় আটকেছে, সৈকতের বালিতে। খাঁড়িতে যা হোক কিছু পানি

আছে, ওখানে তা-ও নেই।

'মরছে,' বলে উঠল মুসা। 'এবার আরও ভালমত আটকাল। জোয়ার আসতে আসতে কর্ম খতম।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'হ্যাঁ,আরও অন্তত ছয় ঘণ্টা।'

'শুকনোয় এতক্ষণ বাঁচতে পারে তিমি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মনে হয় না। পানি না পেলে খুব তাড়াতাড়ি ডি-হাইড্রেটেড হয়ে পড়ে ওদের শরীর, চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়।'

ঝুঁকে বিশাল মাথাটায় আলতো চাপড় দিল রবিন, 'দুঃখ হচ্ছে তিমিটার জন্যে। পানিতে রাখতে হবে, নইলে বাঁচবে না।'

কথা বুঝতে পেরেই যেন ক্ষণিকের জন্যে চোখ মেলল তিমি। বিষণ্ণ হতাশা মাখা দৃষ্টি, রবিনের তা-ই মনে হলো। ধীরে ধীরে আবার চোখের পাতা বন্ধ করল তিমিটা।

'কিভাবে রাখব।' বলল মুসা, 'পানিতে যখন ছিল তখনই ঠেলে সরাতে পারিনি, আর এখানে তো খটখটে শুকনো।'

জবাব দিতে পারল না রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলছে না গোয়েন্দাপ্রধান, তাদের আলোচনায় মন নেই।

গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর, ঘন ঘন তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিড়বিড় করল, 'পর্বতের কাছে যদি যাওয়া না যায় পর্বতকেই কাছে আনতে হবে।'

'আরে, এই কিশোর,' জোরে বলল মুসা, 'কি বলছ? ইংরেজী বলো, ইংরেজী বলো। এখানে কিসের পর্বত? আমরা পড়েছি তিমি-সমস্যায়।'

মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ বলা কিংবা দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব।

'তিমির কথাই তো বলছি।' সাগরে দেখাল কিশোর, 'ওই যে, পর্বত, ওটাকেই কাছে আসতে বাধ্য করতে হবে। একটা বেলচা দরকার। আর...আর একটা তারপুলিন। আর পুরানো একটা হ্যাণ্ড পাম্প, গত মাসে যেটা বাতিল মালের সঙ্গে কিনে এনেছে চাচা...'

'গর্ত,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'গর্ত! কিসের গর্ত?' মুসা অবাক।

'একটা গর্ত খুঁড়ে, তাতে তারপুলিন বিছিয়ে পাম্প করে পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে গর্তটা,' বলল কিশোর। 'ছোটখাট একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেব তিমিটার জন্যে, যতক্ষণ না জোয়ার আসে টিকে থাকতে পারবে।'

দ্রুত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হলো, সাইকেল নিয়ে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসবে মুসা আর রবিন। ততক্ষণ তিমিটাকে পাহারা দেবে কিশোর।

মুসা, রবিন চলে গেল। কিশোর বসে রইল না। প্লাসটিকের একটা বাঁকাচোরা বাকেট খুঁজে আনল খাঁড়ি থেকে। হাত দিয়ে চেপেচুপে কোনমতে কিছুটা সোজা করে নিয়ে ওটাতে করে পানি এনে গায়ে ছিটাল তিমিটার।

পরের আধ ঘণ্টা পানি ছিটানোয় ব্যস্ত রইল কিশোর। রবিন আর মুসা যা করতে গেছে, তার চেয়ে কঠিন কাজ করতে হচ্ছে তাকে, সন্দেহ নেই। ঢালু ভেজা পাড় বেয়ে সাগরে নেমে পানি তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে হচ্ছে. এতবড় একটা শরীর ভিজিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। ছোট বাকেটে কতটুকুই বা পানি ধরে, তার ওপর তিমির চামড়া যেন মরুভূমির বালি, পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুঁষে নিচ্ছে।

গতর খাটাতে কোন সময়েই বিশেষ ভাল লাগে না কিশোরের। ঠেকায় পড়লে কাজ করে, তার চেয়ে মগজ খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। 'ওই যে, এসে গেছে,' তিমিটাকে বলল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল দুই সহকারী গোয়েন্দা। যা যা দরকার নিয়ে এসেছে। প্রায় নতুন একটা বেলচা, তারপুলিনের রোল, হ্যাণ্ড-পাম্প, হোস পাইপের কুণ্ডলী নামিয়ে রাখল বালিতে।

কিশোরও হাঁপাচ্ছে। বলল, 'ওটার গা ঘেঁষে গর্ত খুঁড়তে হবে। তারপর যে ভাবেই হোক ঠেলেঠুলে ফেলব গর্তে।' তিনজনের মাঝে গায়ে জোর বেশি মুসার, কায়িক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত, বেলচাটা সে-ই আগে তুলে নিল। গর্তের বেশির ভাগটাই সে খুঁড়ল। ভেজা বালি. আলগা. খুঁড়তে বিশেষ বেগ পেতে হলো না, সময়ও লাগল না তেমন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দশ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া আর তিন ফুট মত গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল ওরা।

গর্তে তারপুলিন বিছিয়ে দিল ভালভাবে, চারপাশের দেয়ালও তারপুলিনে ঢাকা পড়ল, ফলে পানি শুঁষে নিতে পারবে না বালি। পাম্প নিয়ে সাগরের দিকে দৌড়াল মুসা। রবিন আর কিশোর হোস পাইপের কুণ্ডলী খুলল, পাম্পের সঙ্গে এক মাথা লাগিয়ে আরেক মাথা টেনে এনে ফেলল গর্তে। পাম্পটা বেশ ভাল, কোন মাছধরা নৌকায় পানি সেঁচার কাজে ব্যবহার হত হয়তো।

পালা করে পাম্প করে অল্পক্ষণেই গর্তটা পানি দিয়ে ভরে ফেলল ওরা।

'সব চেয়ে শক্ত কাজটা এবার,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আল্লাহ ভরসা,' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মুসা। 'এসো ঠেলা লাগাই।'

'দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই,' ধপাস করে বালিতে বসে পড়ল কিশোর। 'আর কয়েক মিনিটে মরবে না।'

জিরিয়ে নিয়ে উঠল ওরা। ভারি পিপে ঠেলে গড়িয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে তিমির গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। মাথার কাছে চলে এল রবিন। তিমির মাথায় আলতো চাপড় দিল।

চোখ মেলল তিমি। রবিনের মনে হলো, তার দিকে চেয়ে হাসছে।

'ঠেলো বললেই ঠেলা লাগাবে। এক সঙ্গে···,' কিন্তু কিশোরের কথা শেষ হলো না। তার আগেই ভীষণভাবে নড়ে উঠল তিমি। বান মাছের মত মোচড় দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে, বালিতে লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে পাশে সরে গেল. ঝপাত করে কাত হয়ে পড়ল পানিতে। পানি ছিটকে উঠল অনেক ওপরে।

তিমির গায়ে বেশি ভর দিয়ে ফেলেছিল মুসা. উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা!'

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন।

হাতের তালু ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বলল, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। নিজের কাজ নিজেই সেরে নিল।'

পুরো এক মিনিট পানিতে গা ডুবিয়ে রইল তিমি, মুখ দিয়ে পানি টানল, তারপর সামান্য ভেসে উঠে ফোয়ারা ছিটাল মাথার ফুটো দিয়ে, তিন গোয়েন্দার গা ভিজিয়ে দিয়ে যেন ধন্যবাদ জানাল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'ব্যাটা, আবার রসিকতা জানে···'

'যাক,' মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল রবিন, 'জোয়ার আসাতক বেঁচে থাকতে পারবে।'

'জোয়ার তো সময়মত ঠিকই আসবে, আমাদেরও সময়মত যাওয়া দরকার,' বলল কিশোর। 'মনে নেই, আজ ইয়ার্ডে কাজ আছে? তাছাড়া নাস্তা···'

'যাহ্,' মুসা বলল, 'এক্কেবারে ভুলে গেছি! আপেলের বরফি আর মুরগীর রোস্ট খাওয়াবেন কথা দিয়েছেন মেরিচাচী! চলো, চলো।' তিমিটার দিকে ফিরল, 'হেই মিয়া, তুমি পানি খাও, আমরা যাই, মুরগী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

মুসার কথায় সায় জানাতেই যেন আরেকবার তাদের গায়ে পানি ছিটাল তিমি।

গর্তের কিনারে এসে দাঁড়াল রবিন। তিমিটার উদ্দেশ্যে বলল, 'থাক। কোন অসুবিধে হবে না। আবার আসব আমরা।'

তাড়াহুড়ো করে জুতোমোজা পরে নিল তিনজনে। পাম্প, বেলচা আর হোসপাইপ গুছিয়ে নিয়ে এসে উঠল পাড়ের ওপর। মাটিতে শুইয়ে রাখা সাইকেলগুলো তুলে মাল বোঝাই করল। রওনা হতে যাবে, এই সময় একটা শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর।

মাইল দুয়েক দূরে ছোট একটা জাহাজ—একটা কেবিন ক্রুজার, আউটবোর্ড মোটর—ধীরে ধীরে চলেছে। দুজন লোক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে চেহারা বোঝা গেল না।

হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখা গেল জাহাজ থেকে। পর পর তিনবার।

'আয়নার সাহায্যে সিগন্যাল দিচ্ছে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না। যেভাবে ঝলকাচ্ছে, কোন নিয়মিত প্যাটার্ন নেই। অন্য কোন জিনিস, বোধহয় বিনকিউলারের কাঁচে রোদ লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে।'

ব্যাপারটা অন্য দুজনের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না, কিন্তু কিশোর সাইকেলে চড়ল না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জাহাজটার দিকে। নাক ঘুরে গেছে ওটার, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'কি হলো, চলো,' অধৈর্য হয়ে তাড়া দিল মুসা। 'সব কিছুতেই রহস্য খোঁজার স্বভাব ছাড়ো। রোজ শয়ে শয়ে লোক এদিক দিয়ে যায় আসে, তাছাড়া ইদানীং অনেকেই আমাদের মত শখের তিমি গবেষক হয়েছে। তিমির যাওয়া দেখার শখও আমাদের একলার না।'

'জানি,' সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর, হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল সাইকেল—বাধ্য হয়ে রবিন আর মুসাকেও ঠেলেই এগোতে হলো। 'কিন্তু বোটের লোকটা তিমি দেখছে না। ওর বিনকিউলারের চোখ তীরের দিকে, এদিকে। আমাদেরকেই দেখছে না তো?'

'দেখলে দেখছে। কোন অসুবিধে আছে তাতে?' বলল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর।

মেরিচাচী অপেক্ষা করছেন। হাসিখুশি মানুষ, সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে মুখে। হাসেন না শুধু ছেলেদেরকে কাজ করানোর সময়, আর ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী—দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভারকে খাটানোর সময়। ও, আরও একটা সময় হাসেন না, যখন রাশেদচাচা একগাদা পুরানো বাতিল জঞ্জাল মাল নিয়ে আসেন, যেগুলো কোনভাবেই বিক্রি করা যাবে না, তখন।

মাল জোগাড়েই ব্যস্ত থাকেন রাশেদ পাশা, ইয়ার্ডের দেখাশোনা মেরিচাচীকেই করতে হয়। কোনটা সহজেই নেবে খদ্দের, কোনটা নেবে না, স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন তিনি।

তিন ছেলেকে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মেরিচাচী, 'এই, তোরা কি রে? সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, সব জুড়িয়ে গেল,' সাইকেল থেকে কিশোরকে পাম্প নামাতে দেখে অবাক হলেন তিনি। 'আরে এই কিশোর, পাম্প নিয়েছিলি কেন?' রবিন আর মুসা নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেননি তিনি, বোরিসের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা।

'সাগর সেঁচতে গিয়েছিলাম, চাচী,' হাসল কিশোর।

'তোর মাথা-টাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো, এই কিশোর।'

মুসার এখন পেট জ্বলছে, মজা করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি সব বুঝিয়ে বলল মেরিচাচীকে।

ভরপেট নাস্তা খেয়ে কাজে লেগে গেল তিন গোয়েন্দা। দুপুর পর্যন্ত গাধার মত খাটল। দুপুরের খাওয়া রেডি করে ডাকলেন মেরিচাচী। হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা।

খাওয়ার পর আবার রওনা হলো সাগর পারে, তিমিটাকে দেখতে।

দুই

'হয়তো গড়িয়ে-টড়িয়ে নেমে চলে গেছে সাগরে,' বলল বটে মুসা, কিন্তু কথাটা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'অসম্ভব,' রবিন বলল, 'যা শুকনো বালি···নাহ্, ইমপসিবল।'

কিশোর চুপ। গর্তের আশেপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছে বালিতে।

'একটা ট্রাক এসেছিল,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, 'ফোর হুইল ড্রাইভ। ওই ওদিকে কোথাও দিয়ে নেমেছিল, তারপর সৈকত ধরে এগিয়ে এসেছে। এই যে

এখানটায়, গর্তের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, কয়েক ইঞ্চি দেবে গিয়েছিল চাকা, পরে সামনের চাকার নিচে বোর্ড ফেলে তুলতে হয়েছে।'

কোনটা কিসের দাগ বুঝিয়ে দিল কিশোর।

'ট্রাক!' বিড়বিড় করল মুসা।

'কেন, কোন সন্দেহ আছে?'

'তারমানে তুলে নিয়ে গেছে তিমিটাকে?'

'তাই করেছে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'কিন্তু কারা? চরায় আটকা পড়ায় তিমি কারা নিতে পারে? কাদের দায়িত্ব?'

জবাবের অপেক্ষা করল সে। এগিয়ে গিয়ে গর্ত থেকে তারপুলিনটা ধরে টান দিল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রবিন আর মুসা।

'ওশন ওয়ারল্ড,' আধ ঘণ্টা পরে প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর নিজেই। 'সকালে আমরা চলে আসার পর কেউ গিয়েছিল সৈকতে, তিমিটাকে দেখে ওশন ওয়ারল্ডে খবর পাঠিয়েছিল। ওরাই এসে তুলে নিয়ে গেছে।'

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে গঠিত হয়েছে হেডকোয়ার্টার। অনেক আগে ওটা কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, বিক্রি হয়নি। নানা রকম লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে এখন পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে ট্রেলারটা। তার ভেতরে ঢোকার কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু তিন গোয়েন্দা। পথগুলো ওরাই বানিয়েছে।

অনেক যত্নে হেডকোয়ার্টার সাজিয়েছে ওরা। ভেতরে ছোটখাট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি বসিয়েছে, ফটোগ্রাফিক ডার্করুম করেছে, অফিস সাজিয়েছে— চেয়ার টেবিল ফাইলিং কেবিনেট সবই আছে। একটা টেলিফোনও আছে, বিল ওরাই দেয়। অবসর সময়ে ইয়ার্ডে কাজ করে, মুসা আর কিশোর, পারিশ্রমিক নেয়। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে বই সাজানো-গোছানোর পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন। তাছাড়া গোয়েন্দাগিরি করেও আজকাল বেশ ভাল আয় হচ্ছে।

টেলিফোন ডিরেক্টরিটা টেনে নিল কিশোর, ওশন ওয়ারল্ডের নাম্বার বের করে ডায়াল করল।

ফোনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করা আছে, ওপাশের কথা তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

রিঙ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর জবাব এল।

'ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ,' কেমন যেন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, সাজানো কথা। 'টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের উত্তরে, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ঠিক পাশেই মিলবে ওশন ওয়ারল্ড।' গড়গড় করে আরও অনেক কথা বলে গেল লোকটাঃ টিকেটের দাম কত, দেখার কি কি জিনিস আছে, কোন দিন কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে, ইত্যাদি। বলল, 'ওশন ওয়ারল্ড রোজই খোলা থাকে, সকাল দশটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত সোমবার ছাড়া···' রিসিভার নামিয়ে রাখল

কিশোর। এটাই জানতে চেয়েছিল।

'হায় হায়রে,' কপাল চাপড়াল মুসা, 'বদনসীব একেই বলে। হপ্তার যে দিনটায় বন্ধ সেদিনই ফোন করলাম আমরা।'

আনমনে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভাবছে কি যেন, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।

'তো এখন কি করব?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আগামীকাল আবার ফোন করব?'

'ফোন করে আর কি হবে?' বলল কিশোর। 'যা জানার তো জেনেছিই। মাত্র কয়েক মাইল এখান থেকে। সাইকেলেই যাওয়া যাবে। কাল একবার নিজেরাই গিয়ে দেখে আসি না কেন?'

পরদিন সকাল দশটায় ওশন ওয়ারল্ডের বাইরে সাইকেল-স্ট্যাণ্ডে সাইকেল রেখে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের আশেপাশে, কৃত্রিম ল্যাগুনে সী-লায়নের খেলা দেখল, তীরে পেঙ্গুইনের হুটোপুটি দেখল, তারপর চলল অফিস-বিল্ডিঙের দিকে। একটা দরজার ওপরে সাদা কালিতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে ঃ অ্যাডমিনিসট্রেশন।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

মোলায়েম মেয়েলী গলায় সাড়া এল ভেতর থেকে, 'কাম ইন।'

অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। পরনে টু-পীস সুইম স্যুট—সাঁতার কাটতে যাচ্ছিল বোধহয়। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, গাঢ় বাদামী। ছোট করে ছাটা কালো চুল, কোমল, রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। মুসার চেয়েও লম্বা, চওড়া কাঁধ, অস্বাভাবিক সরু কোমর, কেন যেন মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, ডাঙার চেয়ে পানিতেই তাকে মানাবে ভাল।

'আমি টিনহা শ্যাটানোগা,' বলল তরুণী। 'কিছু বলবে?'

'একটা তিমির খবর নিতে এসেছি,' বলল কিশোর। 'চরায় আটকা পড়েছিল...' খুলে বলল সে।

নীরবে সব শুনল টিনহা। কিশোরে কথা শেষ হলে বলল, 'কবের ঘটনা? গতকাল?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'গতকাল আমি ছিলাম না।' আলমারি খুলে একটা ডাইভিং মাস্ক বের করল টিনহা। 'সোমবারে দু-চারজন শুধু স্টাফ থাকে, আর সবার ছুটি।' মাস্কের ফিতে খুলে নিয়ে আবার ছেলেদের দিকে ফিরল সে, 'কিন্তু গতকাল কোন তিমি আনা হলে, আমি আজ আসার সঙ্গে সঙ্গে জানানো হত আমাকে।

'আনা হয়নি?' হতাশ শোনাল রবিনের কণ্ঠ।

মাথা নাড়ল টিনহা। মাস্কটা দেখতে দেখতে বলল, 'না, আনলে জানানো হতই। সরি, কিছু করতে পারলাম না তোমাদের জন্যে।'

'না না, দুঃখ পাওয়ার কি আছে...' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

'আমি দুঃখিত,' আবার বলল টিনহা। 'আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। একটা শো আছে।'

'যদি তিমিটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন,' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর, 'আমাদের জানালে খুব খুশি হব।'

কার্ডটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল টিনহা, একবার চোখ বুলিয়েও দেখল না।

ঘুরে সারি দিয়ে দরজার দিকে এগোল ছেলেরা। দরজা খোলার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে মুসা, পেছন থেকে ডেকে বলল টিনহা, 'তিমিটার জন্যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে তোমাদের, না? সাধারণ একটা পাইলট কিংবা গ্রে...'

'হ্যাঁ, হচ্ছে,' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'কারণ ওটাকে বাঁচাতে অনেক কষ্ট করেছি...'

'চিন্তা কোরো না,' হাসল টিনহা। 'ভালই আছে ওটা। কেউ ওটাকে নিশ্চয় উদ্ধার করে নিয়ে গেছে,' বলেই আরেক দিকে তাকাল সে।

স্ট্যাণ্ড থেকে সাইকেল নিয়ে ঠেলে এগোল কিশোর, চড়ল না। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে, বুঝতে পারল অন্য দুজন, তারাও ঠেলে নিয়ে এগোল।

ওশন ওয়ারল্ড থেকে একটা সরু পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে। সেখানে এসে সরু রাস্তার পাশের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল কিশোর। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। কিশোরের হাসি হাসি মুখ, কোন জটিল রহস্যের সন্ধান পেলে যেমন হয়, তেমনি।

রবিন বিষণ্ণ, মুসা হতাশ। তিমিটার খোঁজ মেলেনি।

'এত হাসির কি হলো,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা।

'কোন কাজই তো হলো না।'

'কে বলল?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'কে বলল মানে? তিমির খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'পুরোপুরি নয়, তবে নিরাপদে আছে বোঝা গেছে,' বলল কিশোর। 'বিশদ পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ওশন ওয়ারল্ডের কথাই ধরো, সোমবারে বন্ধ থাকে। সেদিন কেউ ওখানে ফোন করলে জ্যান্ত মানুষের সাড়া পাবে না, শুনতে পাবে কতগুলো টেপ করা কথা। ও হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, কাল ফোনে যে কথাগুলো আমরা শুনেছি, সব টেপ করা কথা। সোমবারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। কেউ রিঙ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন চালু হয়ে যায়, গড় গড় করে শ্রোতাকে শুনিয়ে দেয় একগাদা তথ্য। এর মানে কি? কোন মানুষ যদি ফোন না ধরে...'

'তাহলে তিমিটার কথা জানানো যাবে না,' কিশোরের কথা শেষ করে দিল মুসা।

'না। তবে টিনহা শ্যাটানোগাকে বাড়িতে ফোন করতে কোন বাধা নেই, যদি তার নম্বর জানা থাকে। এবং সেটাই কেউ করেছিল।'

'কে বলল তোমাকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কেউ বলেনি, অনুমান করে নিয়েছি, টিনহার কথা থেকেই। তিমিটার চরায় আটকা পড়ার কথা শুনে অবাক হয়নি, গায়েব হওয়ার কথা শুনে হয়নি। আমি বলে

গেছি, সে শুনেছে, যেন শোনা কথাই আরেকবার শুনছে। তাছাড়া সে জানল কি করে, গতকালের ঘটনা এটা? আমি তো একবারও বলিনি।'

'ওটা তো প্রশ্ন করেছে,' তর্ক করল মুসা।

'ওই প্রশ্নটাই জবাব। কবের ঘটনা, এটুকু বললেই তো পারত। আবার উল্লেখ করার কি দরকার ছিল। আসলে কথাটা ঘুরছিল তার মনে, ফলে বলে ফেলেছে। তারপর আরও একটা ব্যাপার, প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি তিমিটার কথা, গতকাল অফিসে আসেনি বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শেষে রবিনের উৎকণ্ঠা দেখে বলেই ফেলেছে নিরাপদ আছে। কিছুই যদি না জানে নিরাপদে আছে, জানল কি করে?'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল রবিন। 'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? বলল পাইলট কিংবা গ্রে হোয়েল। শুধু ওই দু-জাতের নাম কেন? আরও তো অনেক জাতের তিমি আছে। তাছাড়া পাইলটের নামই বা প্রথমে কেন...'

'তুমি জানো ওটা পাইলট?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'জানি,' বলল রবিন। 'গতকালই বুঝতে পেরেছি। বলার সুযোগ পাইনি, তারপর আর মনে ছিল না।'

'অ।...পাইলট আর গ্রে-র তফাতটা কি?'

'গ্রে-র ফোয়ারার ছিদ্র থাকে দুটো, নাকের ফুটোর মত পাশাপাশি। পাইলটের থাকে একটা। আকারেও পাইলটের চেয়ে অনেক বড় হয় গ্রে। কাল যেটাকে বাঁচিয়েছি আমরা, ওটা শিশু নয়, যুবক। পাইলট বলেই এত ছোট।' রবিনের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, তার আগেই কিশোর বলল, 'হুঁ, তা যা বলছিলাম। তিমিটার কথা ভালমতই জানে টিনহা। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওশন ওয়ারল্ডের একজন ট্রেনার সাধারণ একটা তিমি হাইজ্যাক করতে যাবে কেন? কেন মিছে...'

গাড়ির হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দে বাধা পড়ল কথায়।

ওশন ওয়ারল্ড থেকে বেরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে এল একটা সাদা পিকআপ, বড় রাস্তায় উঠে মোড় নিয়ে চলে গেল দ্রুত। চালাচ্ছে টিনহা শ্যাটানোগো।

'হুঁ, খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'মানে?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'কয় মিনিট আগে কি বলেছিল আমাদেরকে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'একটা জরুরী শো দেখাতে যাচ্ছে। শো হলে তো অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে হবে, বাইরে কি? আর এত তাড়াহুড়ো কেন?'

'শো দেখাতেই তৈরি হচ্ছিল,' মুসার কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর, 'কিন্তু বাধ সেধেছি আমরা। হয়তো কোন ভাবে চমকে দিয়েছি। তাই শো ফেলে রেখে আরও জরুরী কোন কাজ করতে চলে গেছে।'

তিন

'না হয় ধরলামই মিছে কথা বলেছে টিনহা,' বলল মুসা, 'কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়?'

শেষ বিকেল। সকালে ওশন ওয়ারল্ড থেকে রকি বীচে ফিরেই লাইব্রেরিতে কাজে চলে যায় রবিন। মুসা যায় বাড়ির লন পরিষ্কার করতে, মাকে কথা দিয়েছিল আজ সাফ করে দেবে। ইয়ার্ডে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করেছে কিশোর। কাজ সারতে সারতে বিকেল হয়ে গেছে তিনজনেরই। হেডকোয়ার্টারে জমায়েত হয়েছে এখন। এর আগে আর আলোচনার সুযোগ হয়নি।

'তাছাড়া মিথ্যে কথা বলা বড়দের স্বভাব,' বলেই গেল মুসা, 'কোন কারণ ছাড়াই মিছে কথা বলবে। গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো, দশটা প্রশ্ন করে আগে তোমার মেজাজ বিগড়ে দেবে। তারপর যে জবাবটা দেবে সেটা হয় ঘোরানো-প্যাঁচানো, নয় স্রেফ মিছে কথা...'

কথা শেষ করতে পারল না মুসা, টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল কিশোর।

'হালো,' স্পীকারে শোনা গেল পুরুষের গলা। 'কিশোর পাশার সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

'বলছি।'

'আজ সকালে ওশন ওয়ারল্ডে একটা হারানো তিমির খোঁজ নিতে গিয়েছিলে,' কথায় কেমন একটা অদ্ভুত টান, তাছাড়া কিছু কিছু শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে, যেমন ওয়ারল্ডকে বলছে 'ওয়া-রলড'।

হয়ত মিসিসিপির ওদিকের কোনখানের লোক, ভাবল রবিন, অ্যালবামার হতে পারে। ওই অঞ্চলের কারও সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি তার, তবে টেলিভিশনে দেখেছে, দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা ওরকম করেই টেনে টেনে কথা বলে, তবে এই লোকটা আরও এক কাটি বাড়া, শব্দও ভেঙে ফেলেছে।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'কেন?'

'আমি আরও জেনেছি তোমরা একধরনের শখের গোয়ে-নদা...'

'হ্যাঁ, আমরা গোয়ে-ন্দাই। নানা রকম সমস্যা...'

কিশোরকে বলতে দিল না লোকটা। 'তাহলে নিশ্চয় একটা কেস নিতে আগ্রহী হবে,' আগ্রহীকে বলল আগ-রহী, 'তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেব।'

'একশো ডলার!' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'ব্যাটার কি লাভ?'

কিশোর জবাব না দেয়ায় আবার বলল লোকটা, 'তাহলে কেসটা নিচ্ছ? কেসটা উচ্চারণ করল 'কেস-আস'।

'খুশি হয়ে নেব,' হাত বাড়িয়ে একটা প্যাড আর পেনসিল টেনে নিল কিশোর। 'আপনার নাম আর ফোন নম্বর...'

'ফাইন,' বাধা দিয়ে বলল লোকটা। 'তাহলে এখুনি কাজে নেমে পড়ো। দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার খোঁজ নেব।'

'কিন্তু আপনার নাম···' থেমে গেল কিশোর, লাইন কেটে দিয়েছে ওপাশ থেকে। এক মুহূর্ত হাতের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। 'কাজ দিল, পুরস্কার ঘোষণা করল,' আনমনে বলল কিশোর, 'কিন্তু নিজের নাম বলল না। আজ সকালে ওশন ওয়ারল্ডে গিয়েছি সেকথাও জানে···' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল সে।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'কেসটা নিচ্ছ তো? একশো ডলার, কম কি?'

'মোটেই কম নয়। টাকার চেয়েও বড় এখন এই রহস্যময় কল, এর রহস্য ভেদ করতেই হবে। তার ওপর যোগ হয়েছে একটা হারানো তিমি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তদন্ত শুরু করি কোনখান থেকে?' কয়েক সেকেণ্ড নীরব রইল কিশোর, তারপর টেনে নিল টেলিফোন বুক। 'টিনহা শ্যাটানোগা। এই একটাই সূত্র আছে আমাদের হাতে।'

দ্রুত ডিরেক্টরির পাতা উল্টে চলল কিশোর। প্রথমে নামটা বিদঘুটে মনে হয়েছে তার কাছে, কিন্তু একেবারে যে দুর্লভ নাম নয়, ফোন বুক ঘেঁটেই সেটা বোঝা গেল। এক শহরেই শ্যাটানোগা পাওয়া গেল আরও তিনজন। জিমবা শ্যাটানোগা, শিঁয়াওঁ শ্যাটানোগা আর ম্যারিবু শ্যাটানোগা। কিন্তু টিনহা শ্যাটানোগার নাম নেই।

মিস্টার জিমবাকে দিয়েই শুরু করল কিশোর। তিনটে রিঙের পর জবাব দিল অপারেটর, জিমবা শ্যাটানোগার লাইন কেটে দিয়েছে টেলিফোন বিভাগ।

অনেকক্ষণ ধরে শিঁয়াওঁ শ্যাটানোগার ফোন কেউ ধরল না, তারপর মোলায়েম একটা গলা প্রায় ফিসফিসিয়ে জবাব দিল। জানাল ব্রাদার শিঁয়াওঁ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। যদি তিনি এসে ফোন ধরেনও কিশোরের কথা শুধু শুনতেই পারবেন, জবাব দিতে পারবেন না, কারণ ছ-মাস ধরে কথা বন্ধ রেখেছেন তিনি, আরও অনেকদিন রাখবেন। শুধু ইশারায়ই নিজের প্রয়োজনের কথা জানান।

'হেত্তোরি!' লাইন কেটে দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আগে ভাবতাম পাগলের গোষ্ঠী খালি ভারত আর আমার দেশেই আছে, এখন দেখছি এখানে আরও বেশি। কথা বন্ধ রেখেছে না ছাই, হুঁহ্,' বলতে বলতেই তৃতীয় নম্বরটায় ডায়াল করল।

আগের দুজনের তো কোনভাবে জবাব পাওয়া গেছে, এটার কোন সাড়াই এল না। কেউ ধরল না ফোন।

ম্যারিবু শ্যাটানোগার নামের নিচে লেখা রয়েছে ঃ চার্টার বোট ফিশিং। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল কিশোর, কিন্তু এবারও সাড়া মিলল না।

'চার্টার-বোট-ফিশিং-শ্যাটানোগার খবরই নেই,' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'হলো না। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে।'

'টিনহাকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানি আমরা,' বলল রবিন। 'হপ্তায় ছ-দিন পাওয়া যাবে তাকে ওশন ওয়ারল্ডে।'

'আরও একটা ব্যাপার জানি,' কিশোর যোগ করল, 'মানে চিনি। তার পিকআপ

ট্রাক।' চোখ আধবোজা করল সে, ভাবনা আর কথা একই সঙ্গে চলছে। 'বিকেল ছ-টায় বন্ধ হয় ওশন ওয়ারল্ড। তারপরেও নিশ্চয় অনেকক্ষণ থাকতে হয় টিনহাকে, কারণ সে ট্রেনার। দর্শক চলে যাওয়ার পরও তার কাজ থাকে।' ঝট করে সোজা হলো সে। 'মুসা তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই। আজ হবে না, দেরি হয়ে গেছে। কাল যাবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কোথায়?'

'কাল বলব।'

পরদিন বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় বোরিসকে পাকড়াও করল কিশোর, তাদেরকে ওশন ওয়ারল্ডে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা বের করল বোরিস, তাতে দুটো সাইকেল তোলা হলো। তিন কিশোরের কাজেকর্মে আজকাল আর বিশেষ অবাক হয় না সে, তবু প্রশ্ন না করে পারল না, 'তোমরা মানুষ তিনজন, সাইকেল নিয়েছ দুটো। তৃতীয়জনকে কি দুই সাইকেলে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরবে?'

'মুসার সাইকেলের দরকার হবে না,' বোরিসকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'বিনে পয়সায় গাড়িতে চড়বে সে।'

'হোকে (ও-কে),' শ্রাগ করল বোরিস। আর কিছু না বলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল।

ওশন ওয়ারল্ডের পার্কিং লটে গাড়ি থামাল বোরিস। সাইকেল নিয়ে নেমে পড়ল তিন কিশোর।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল বোরিস, 'আমাকে দরকার হলে ফোন কোরো ইয়ার্ডে।' ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

টিনহার গাড়িটা খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, দড়ির বেড়া দেয়া, 'স্টাফ' লেখা সাইনবোর্ড লাগানো একটা জায়গায় দেখা গেল সাদা পিকআপটা। ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে গেল কিশোর আর মুসা, গেটে পাহারায় রইল রবিন। টিনহাকে আসতে দেখলে বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে দেবে।

ট্রাকের পেছনটা খালি নয়। নানারকম জিনিসপত্র—ফোম রবারের লম্বা লম্বা ফালি, এলোমেলো দড়ি, আর বেশ বড়সড় এক টুকরো ক্যানভাস, ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মেঝেতে শুয়ে পড়ল মুসা। ক্যানভাস দিয়ে তাকে ঢেকে দিল কিশোর। রবারের ফালিগুলো এমনভাবে চারপাশে আর ওপরে রেখে দিল, যাতে বোঝা না যায় কিছু। তাছাড়া আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, গাড়ির পেছনে কেউ খুঁজে দেখতে আসবে বলেও মনে হয় না।

'আমরা কেটে পড়ি,' মুসাকে বলল কিশোর। 'ঘোরাঘুরি করতে দেখলে সন্দেহ করে বসবে টিনহা। হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' ক্যানভাসের তলা থেকে জবাব দিল মুসা। 'যত শীঘ্রি পারি ফোন করব।'

কিশোরের নেমে যাওয়ার আওয়াজ শুনল মুসা। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন

শব্দ নেই, শুধু পার্কিং লটে মাঝে মাঝে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়া ছাড়া।

বেশ আরামেই আছে মুসা, সারাটা দিন পরিশ্রমও কম করেনি। ঘুম এসে গেল তার। হঠাৎ একটা শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল। ক্যানভাসের ওপর পানি ছিটকে পড়েছে, কয়েকটা ফোঁটা চুঁইয়ে এসে তার মুখ ভিজিয়ে দিল। ঠোঁটেও লাগল পানি। কি ভেবে জিভ দিয়ে চাটল। নোনা পানি।

ট্রাকটা স্টার্ট নিল। গতি বাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মুসা, তারপর সাবধানে মুখের ওপর থেকে ক্যানভাস সরিয়ে উঁকি দিল। তার মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে বড় একটা প্ল্যাসটিক কনটেইনার। চার পায়ের ওপর রয়েছে জিনিসটা। মুসা রয়েছে তলায়। পানি ছলাৎ-ছল করছে ভেতরে। জীবন্ত কিছু ঘষা মারছে কনটেইনারের গায়ে।

মাছ, অনুমান করল মুসা, মাছ জিয়ানো রয়েছে ভেতরে। আবার মুখের ওপরে ক্যানভাস টেনে দিল সে।

ছুটে চলেছে ট্রাক, ঝাঁকুনি প্রায় নেই। তারমানে সমতল মসৃণ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বোধহয় কোস্ট হাইওয়ে ধরেছে। কয়েক মিনিট পর গতি কমল ট্রাকের। ওপর দিকে উঠতে শুরু করল পাহাড়ী পথ বেয়ে। কোথায় এল? সান্তা মনিকা? কোন দিকে কবার মোড় নিচ্ছে গাড়ি খেয়াল রাখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। গোলমাল হয়ে গেল। আবার সমতলে নেমে এল গাড়ি।

অন্ধকার নামার পর আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল গাড়ি। বেশ ঘোরানো পথ। সান্তা মনিকার পাহাড়ী অঞ্চলেরই কোন জায়গা হবে, অনুমান করল মুসা।

অবশেষে থামল পিকআপ। টেইল গেট নামানোর শব্দ শোনা গেল। তারপর খালি পায়ের শব্দ। দম বন্ধ করে রইল মুসা।

পানির জোর ছলাৎ-ছল, নিশ্চয় কনটেইনারটা তোলা হচ্ছে। চলে গেল পায়ের শব্দ।

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করল মুসা, তারপর ওপর থেকে ক্যানভাস সরাল।

বেশ বড়সড় বিলাসবহুল একটা র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পিকআপ। সদর দরজার সামনে একটা ল্যাম্প ঝুলছে। কংক্রিটের সিঁড়ি উঠে গেছে দরজা পর্যন্ত। সিঁড়ির গোড়ায় একটা মেইলবক্স। নামটা পড়তে পারছে মুসা ঃ উলফ।

আরও এক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা, তারপর খুব সাবধানে নামল ট্রাক থেকে। ঘুরে চলে এল গাড়ির সামনের দিকে, বনেটের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িটার ওপর নজর রাখার ইচ্ছে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই এলাকায় ওরকম বাড়ি থাকতে পারে ভাবেনি সে। তবে অবাক হলো অন্য একটা কারণে। দরজার কাছে ওই একটি মাত্র আলো ছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। কোন জানালায় আলো নেই। টিনহা ওই বাড়ির ভেতরে গিয়েছে কিংবা আছে বলে মনে হয় না ভাবসাব দেখে।

এখানে সারারাত এভাবে ঘাপটি মেরে থাকার কোন মানে নেই, ভাবল মুসা।

দুটো কাজ করতে পারে সে এখন। গলির মাথায় গিয়ে রাস্তার নাম-নম্বর জেনে উলফের ঠিকানা জানিয়ে কোথাও থেকে ফোন করতে পারে কিশোরের কাছে। কিংবা খোঁজ করে দেখতে পারে, টিনহা কোথায় গেছে, কি অবস্থায় আছে, কি করছে প্ল্যাসটিক কনটেইনারের জ্যান্ত মাছ নিয়ে।

দুটোর মধ্যে প্রথমটাই মনঃপূত হলো মুসার। গলির মাথায় যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে, এই সময় মেয়েলী কণ্ঠে কথা শোনা গেল, কাকে জানি নাম ধরে ডাকছেঃ 'রোভার! রোভার!'

ডাকের জবাব শোনা গেল না।

মুসা শিওর, ঘরের ভেতর থেকে কথা বলেনি মেয়েটা, বাইরে কোথাও রয়েছে। হয়তো পেছনের আঙিনায়।

বাড়িতে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল মুসা। চোখে পড়ল, বাঁ দিকে কংক্রিটের একটা সরু পথ ধীরে ধীরে উঠে গেছে গ্যারেজে। গ্যারেজের পাশে একটা কাঠের ছোট গেট, তার ওপরে তারাজ্বলা কালো আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটা পাম গাছের মাথা।

নিঃশব্দে গেটের কাছে চলে এল মুসা। সাধারণ একটা খিল দিয়ে গেটের পাল্লা আটকানো রয়েছে। ভেতরে ঢুকে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা।

গ্যারেজের পেছনে সিমেন্ট বাঁধানো একটা পাকা পথ। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝুঁকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল পা পা করে।

আবার ডাক শোনা গেল ঃ 'রোভার! রোভার!'

খুব কাছেই রয়েছে মহিলা। মুসার মনে হলো, মাত্র কয়েক গজ দূরে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। সামনে আর বাঁয়ে এক চিলতে করে ঘাসে ঢাকা জমির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে পামের সারি, রাস্তা থেকেই দেখেছে ওগুলো। ডানের কিছু দেখতে পারছে না। বাগান বা যা-ই থাকুক ওখানে দেখা যাচ্ছে না এখনও গ্যারেজের দেয়ালের জন্যে। এক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সে, তারপর এক ছুটে ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে চলে এল পামের সারির কাছে। লম্বা দম নিয়ে ঘুরে তাকাল।

চোখে পড়ল বিশাল এক সুইমিং পুল, মূল বাড়িটার প্রায় সমান লম্বা। পানির নিচে আলো, ঝিকমিক করছে টলটলে পানি।

'রোভার। লক্ষ্মী ছেলে রোভার,' বলল টিনহা।

সুইমিং পুলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে, পরনে সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক, অফিসে যেটা পরে ছিল সকালে। তার পাশে কংক্রিটের চত্বরের ওপর রাখা আছে প্ল্যাসটিকের কনটেইনারটা।

ঝুঁকে কনটেইনার থেকে একটা মাছ তুলে নিল টিনহা, জ্যান্ত মাছ, ছটফট করছে, লেজ ধরে ওটাকে ছুঁড়ে মারল। বৈদ্যুতিক আলোয় ক্ষণিকের জন্যে রূপালী একটা ধনুক সৃষ্টি করে পুলের ওপর উড়ে গেল মাছটা।

সঙ্গে সঙ্গে পানি থেকে মাথা তুলল একটা ধূসর জীব। উঠছে, উঠছে, উঠছে, পানি থেকে বেরিয়ে এল পুরো সাত ফুট শরীর। একটা মুহূর্ত শূন্যেই স্থির হয়ে ঝুলে

রইল যেন। মুখ হাঁ করে রেখেছে। শূন্যে থেকেই মোচড় দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে ধরে ফেলল উড়ন্ত মাছটা, তারপর নিখুঁত ভাবে ডিগবাজি খেয়ে আবার পানিতে পড়ল মাছ মুখে নিয়ে।

'রোভার লক্ষ্মী ছেলে,' হাসি মুখে প্রশংসা করল টিনহা। ডুবুরীর ফ্লিপার পরাই আছে তার পায়ে, ডাইভিং গগলসটা ফিতেয় ঝুলছে গলা থেকে, ওটা পরে নিল চোখে। পুলে নামল।

বেশ ভাল সাঁতারু মুসা নিজে, অনেক ভাল ভাল সাঁতারুকে দেখেছে, কিন্তু টিনহার মত কাউকে আর দেখেনি। সাঁতার কাটার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে তার, ডাঙা নয়, পানির জীব যেন সে, এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে। হাত-পা প্রায় নড়ছেই না, বাতাসে ডানা মেলে যে ভাবে ভেসে উড়ে চলে সোয়ালো পাখি টিনহার সাঁতার কাটার ভঙ্গি অনেকটা সেরকম।

চোখের পলকে চলে এল পুলের মাঝখানে ছোট তিমিটার কাছে। এমন ভাবভঙ্গি যেন অনেক পুরানো বন্ধুত্ব। নাক দিয়ে আস্তে করে টিনহার গায়ে গুঁতো মারল তিমিটা। ওর গোল মাথাটা ডলে দিল টিনহা, ঠোঁটে টোকা দিয়ে আদর করল। এক সঙ্গে ডাইভ দিয়ে নেমে চলে গেল পুলের তলায়, হুঁশ করে ভেসে উঠল আবার। পাশাপাশি সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ, তারপর তিমির পিঠে সওয়ার হলো টিনহা।

কোথায় রয়েছে ভুলেই গেছে মুসা দেখতে দেখতে। নিজের অজান্তেই একটা গাছের গোড়ায় ঘাসের ওপর বসে পড়েছে, থুতনিতে হাত ঠেকানো। এরকম দৃশ্য সিনেমায়ও দেখা যায় না, পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গেছে সে।

নতুন খেলা শুরু করল টিনহা। তিমিটাকে নিয়ে চলে এল পুলের এক প্রান্তে, মুসা যেদিকে বসে আছে সেদিকে। তিমির মাথায় আস্তে করে চাপড় দিয়ে হঠাৎ পানিতে ডিগবাজি খেয়ে শরীর ঘুরিয়ে শাঁ করে চলে গেল দূরে। তিমিটা অনুসরণ করল তাকে।

আবার তিমির মাথায় চাপড় দিল টিনহা, মাথা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। আবার সরে গেল তিমির কাছ থেকে। এবার আর পিছু নিল না তিমি, যেখানে আছে সেখানেই রইল।

পুলের অন্য প্রান্তে গিয়ে কংক্রিটে বাঁধানো পাড়ের কিনারে উঠে পানিতে পা ঝুলিয়ে বসল টিনহা। অপেক্ষা করে আছে তিমি।

'রোভার! রোভার!' ডাকল টিনহা।

পানি থেকে মাথা তুলল তিমি। চোখ সতর্ক হয়ে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছে মুসা। ছুটতে শুরু করল তিমি। পানির মধ্যে দিয়ে শাঁ করে উড়ে গিয়ে পৌঁছল যেন টিনহার পায়ের কাছে।

'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার,' তিমির ঠোঁট ছুঁয়ে আদর করল টিনহা। কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে কনটেইনার থেকে একটা মাছ এনে গুঁজে দিল রোভারের খোলা মুখে।

'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার,' আবার তিমিটাকে আদর করল সে। তারপর পাশে ফেলে রাখা একটা কি যেন তুলে নিল।

জিনিসটা কি চিনতে পারছে না মুসা। পুলের নিচে আলো আছে, তাতে পুরোপুরি আলোকিত হয়েছে পানি। কিন্তু পুলের ওপরে চারধারে অন্ধকার।

নাম ধরে ডাকল তিমিটাকে টিনহা।

মাথা তুলেই রেখেছে রোভার, আস্তে আস্তে উঁচু করতে শুরু করল শরীর। লেজের ওপর খাড়া হয়ে উঠল আশ্চর্য কায়দায় পানিতে ভর রেখে। ওটাকে জড়িয়ে ধরল টিনহা। না না, জড়িয়ে তো ধরেনি, দুহাত তিমির মাথার পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন করছে।

ভাল করে দেখার জন্যে মাথা আরেকটু উঁচু করল মুসা। চিনে ফেলল জিনিসটা। ক্যানভাসের তৈরি একটা লাগাম পরাচ্ছে টিনহা। ঘাড় তো নেই তিমির চোখের পেছনে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে বেল্ট। শক্ত করে বাকলেস আটকে দিল। ঠিক লাগাম বলা যায় না ওটাকে, কুকুরের গলায় যে রকম কলার আটকানো হয় তেমন ধরনের একটা কিছু, কলারও ঠিক বলা চলে না।

হঠাৎ মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

গেট খোলার শব্দ। বন্ধ হওয়ার শব্দও শোনা গেল। এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। এত কাছে এসে গেল, মুসার ভয় হলো তাকে না দেখে ফেলে।

পুলের দিকে চলে গেল পদশব্দ, থামল।

'হাই টিনহা,' পুরুষের গলা।

'গুড ইভিনিং, মিস্টার উলফ।'

মাথা তুলে দেখার সাহস হলো না মুসার, শুধু থুতনিটা ঘাসের ছোঁয়া মুক্ত করে তাকাল পুলের দিকে।

টিনহার পাশে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বেঁটেই বলা চলে, মেয়েটার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক খাটো। অন্ধকারে রয়েছে মুখ। চেহারা বোঝার উপায় নেই। তবে একটা জিনিস দিনের আলোর মত স্পষ্ট। টাক। পুরো মাথা জুড়ে টাক, আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে। হাতের চামড়া আর শরীরের বাঁধন দেখে অনুমান করল মুসা, লোকটার বয়েস তিরিশের বেশি হবে না, বয়েসের ভারে চুল উঠে গেছে তা নয়।

'কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'কখন রেডি হবে?' টেনে টেনে কথা বলে।

'শুনুন, মিস্টার উলফ,' লোকটার দিকে তাকাল টিনহা, শীতল কণ্ঠস্বর। রেগে যাচ্ছে বোঝাই যায়। 'শুধু বাবার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। আমাকে আমার মত কাজ করতে দিন। সময় হলে বলব। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করেন, রোভার সাগরে ফিরে যাবে। আরেকটা তিমি এবং আরেকজন ট্রেনার খুঁজে বের করতে হবে তখন আপনাকে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'বুঝেছেন?'

'বুঝেছি, মিস শ্যাটআ-নোগা।'

চার

'ঠিক শুনেছ তুমি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'শিওর, ওই একই গলা?'

র‍্যাঞ্চ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ডবল মার্চ করে পাহাড়ী পথ ধরে একটা পেট্রল স্টেশনে নেমে আসতে বিশ মিনিট লেগেছে মুসার, হেডকোয়ার্টারে ফোন করেছে। আরও বিশ মিনিটের মাথায় বোরিস আর রবিনকে নিয়ে গাড়িসহ পৌঁছেছে কিশোর, তিনজনেই ফিরে যাচ্ছে এখন রকি বীচে।

যা যা ঘটেছে সব বলেছে মুসা। মাথার নিচে হাত রেখে ট্রাকের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে সে।

'শিওর মানে?' ঘুমজড়ানো গলায় বলল মুসা, 'একশোবার শিওর। মিস-টার উলফই তখন ফোন করেছিল। ওই একই কণ্ঠ টেনে টেনে কথা বলে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছে না। কেন একজন তার নিজের পুলেই একটা তিমি লুকিয়ে রেখে ওটাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ জানাবে, আবার তার জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবে?

অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারল না কিশোর। এখন আর পারবে না, বুঝতে পারল। প্রশ্নটা মনে নিয়ে ঘুমাতে হবে। হয়তো ঘুম ভাঙার পর পেয়ে যাবে জবাব।

প্রথমে মুসার বাড়িতে তাকে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর রবিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে এল বোরিস আর কিশোর। কথা হয়েছে, আগামী সকালে যত তাড়াতাড়ি পারে এসে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হবে তিন গোয়েন্দা।

পরদিন রবিন এল সবার পরে। মা আটকে দিয়েছিলেন। সবে বেরোতে যাচ্ছে রবিন, ডেকে বললেন, নাস্তার পরে অনেক কাপ-ডিশ জমে আছে, ওগুলো ধুয়ে দিয়ে গেলে তাঁর উপকার হয়।

ইয়ার্ডের এক কোণে তিন গোয়েন্দার ওয়ার্কশপের বাইরে সাইকেল রাখল রবিন। একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপাশে জঞ্জালের গায়ে কাত হয়ে যেন অবহেলায় পড়ে রয়েছে একটা লোহার পাত, ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে ওভাবে। সরাল ওটা রবিন। বেরিয়ে পড়ল মোটা একটা লোহার পাইপের মুখ। এর নাম রেখেছে ওরা দুই সুড়ঙ্গ। জঞ্জালের তলা দিয়ে গিয়ে পাইপের অন্য মুখটা যুক্ত হয়েছে মোবাইল হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে।

পাইপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, ট্রেলারের মেঝের গর্তের মুখে লাগানো পাল্লা তুলে অফিসে ঢুকল রবিন। অন্য দুজন অপেক্ষা করছে।

ডেস্কের ওপাশে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেছে কিশোর। পুরানো একটা রকিং চেয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে মুসা, পা রেখেছে ফাইলিং কেবিনেটের একটা আধখোলা ড্রয়ারের ওপর। কেউ কিছু বলল না।

এগিয়ে গিয়ে একটা টুলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রবিন।

সব সময়ই যা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। আলোচনার শুরুতে মুখ খুলল প্রথমে কিশোর, 'বড় রকম কোন সমস্যায় যদি পড়োও, ভাবতে ভাবতে তোমার মন গিয়ে ধাক্কা খায় কোন দেয়ালে, সামনে পথ রুদ্ধ থাকে,' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'দুটো উপায় খোলা থাকে তোমার জন্যে। হয় দেয়ালে মাথা কুটে মরা, কিংবা ওটা ঘুরে গিয়ে অন্য কোনখান দিয়ে কোন পথ বের করে নেয়া।'

'ব্যস, বোঝো এখন, মরোগে দেয়ালে মাথা কুটে!' রাবনের দিকে চেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিশোর, তোমার দোহাই লাগে, ল্যাটিন ছেড়ে ইংরেজি বলো। চাইলে বাংলাও বলতে পারো, তা-ও এত কঠিন লাগবে না।'

'ম্যারিবু শ্যাটানোগার কথা বলছি,' কঠিন কথার সহজ ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'ম্যারিবু শ্যাটানোগা, চার্টার বোট ফিশিং।'

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মুসা। কিছু বুঝল না।

'ডাকো তাকে,' কিশোরকে বলল রবিন। 'আমার মনে হয় না, সে এতে জড়িত। তবে জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?'

'নাস্তার পর থেকে কয়েকবার চেষ্টা করেছি,' বলল কিশোর। 'সাড়া নেই।'

'হয়ত মাছ ধরতে গেছে, জেলে তো,' মন্তব্য করল মুসা। 'বাড়িতে না থাকলে ফোন ধরবে কি করে? নাকি বাড়ি না থাকলেও ফোন ধরে লোকে?' বুঝতে না পেরে রেগে যাচ্ছে সে।

'আমার মনে হয় ও জড়িত,' মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। 'সোমবারে বাড়িতে টিনহা শ্যাটানোগাকে ফোন করেছিল কেউ। তাকে তিমিটার কথা বলেছে...'

'রোভার,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'নাম যখন একটা রাখা হয়েছে, তিমি তিমি না করে রোভার বলতে দোষ কি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে যাও, রোভারই,' মুসার কথা রাখল কিশোর। 'টিনহাকে ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করা হয়নি, কারণ যে করেছে তার জানা আছে সোমবারে ফোন ধরবে না কেউ। জিমবা শ্যাটানোগার বাড়িতে করতেই পারবে না, কারণ তার লাইন কাটা।'

'আর ব্রাদার শিরাওঁর মন্দিরেও করবে না,' রবিন যোগ করল, 'কারণ সে বোবা সেজেছে। কোন লাভ নেই ওখানে করে।'

'বাকি থাকল আর মাত্র একজন শ্যাটানোগা, যার বাড়িতে ফোন আছে,' বলল কিশোর। 'যে স্যান পেড্রোতে বাস করে, মাছ ধরার জন্যে বোট ভাড়া দেয়। হতে পারে, সে টিনহার আত্মীয়, তার ওখানেই ফোন করেছে লোকটা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'গতরাতে উলফকে বলেছে টিনহা, বাপের জন্যেই নাকি তার কথা শুনছে।'

'বেশ,' গোমড়া মুখে বলল মুসা, 'ম্যারিবু নাহয় বাবাই হলো টিনহার, তাতে কি? দেয়ালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'সহজ,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'টিনহা আর উলফ আমাদের কাছে মুখ খুলবে না। খুললেও মিছে কথা বলবে, আর উলফ কিছুই বলবে না। ওদের কাছ থেকে যেহেতু কিছু জানতে পারছি না আমরা, অন্যের কাছ থেকে ওদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সে জন্যেই স্যান পেড্রোতে গিয়ে ম্যারিবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই, সে কতখানি জড়িত বোঝার জন্যে।'

'যদি বাড়ি না থাকে?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'মাছ ধরতে গিয়ে থাকে?'

'তাহলে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে, কিংবা অন্য জেলেদের সঙ্গে কথা বলব।

জিজ্ঞেস করব টিনহার সম্বন্ধে কি জানে, ম্যারিবুর কোন বন্ধু বা পরিচিত লোক আছে কিনা উলফ নামে। বোঝার চেষ্টা করব, রোভারকে রেখে আমরা যখন ফিরে আসছিলাম সেদিন, ওরাই বোট থেকে চোখ রেখেছিল কিনা আমাদের ওপর।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল মুসা, 'চান্স খুবই কম, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। তা স্যান পেড্রোতে যাব কি করে? তিরিশ মাইলের কম না। বোরিস নিয়ে যাবে?'

'বললে তো যাবেই, কিন্তু উচিত হবে না। ইয়ার্ডে অনেক কাজ, বোরিস আর রোভার দুজনেই খুব ব্যস্ত।'

'তাহলে?'

'রোলস রয়েসটার কথা একেবারেই ভুলে গেছ? চাইলেই তো পেতে পারি আমরা ওটা।'

'ঠিকই তো। অনেকদিন চড়ি না তো, ভুলেই গেছি। ফোন করব রেন্ট আ রাইড কোম্পানিতে, হ্যানসনকে?'

'করে দিয়েছি আমি। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। চলো, বাইরে যাই।'

ওরা বেরোনোর কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের খোলা গেট দিয়ে ঢুকল বিশাল এক গাড়ি, রাজকীয় চেহারা। পুরানো মডেলের এক চকচকে কালো রোলস রয়েস, জায়গায় জায়গায় সোনালি কাজ করা। এক আরবী শেখের জন্যে তৈরি হয়েছিল, শেখের পছন্দ হয়নি, নেয়নি, তারপর রেন্ট আ রাইড কোম্পানি রেখে দিয়েছে গাড়িটা। বাজিতে জিতে তিরিশ দিন ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল একবার কিশোর, তিরিশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর জোরজার করে আরও দুদিন ব্যবহার করতে পেরেছিল। তারপর আর পারবে না, কঠোর ভাবে বলে দিয়েছিল কোম্পানির ম্যানেজার। সেই সময় অগাস্ট নামে এক ইংরেজ কিশোরকে রক্তচক্ষু খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল তিন গোয়েন্দা। যাওয়ার সময় অগাস্ট ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, তিন গোয়েন্দা যখনই চাইবে, তখনই তাদেরকে গাড়িটা দিয়ে সাহায্য করতে হবে কোম্পানির, খরচ-খরচা যা লাগে, সব তার।

অগাস্ট চলে যাওয়ার পর গাড়িটা ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন পড়েনি, আজ পড়েছে।

গাড়ি থেকে নামল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ইংরেজ শোফার হ্যানসন। বিনীত ভঙ্গিতে সালাম জানাল তিন কিশোরকে।

এই ব্যাপারটা কিশোরের পছন্দ নয়, কিন্তু হ্যানসনকে বললে শোনে না। কর্তব্য পালন থেকে বিরত করা যায় না 'খাঁটি ইংরেজ বলে অহঙ্কারী' লোকটাকে।

প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে রোলস রয়েস। তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দেয়া কিছুই না ওটার শক্তিশালী ইঞ্জিনের জন্যে। স্যান পেড্রোতে পৌঁছল গাড়ি। ফোন বুক লেখা ঠিকানা টুকে নিয়েছে কিশোর। সেইন্ট পিটার স্ট্রীট খুঁজে বের করল হ্যানসন।

ডকের ধারে পথ। দু-ধারে পুরানো ভাঙাচোরা মলিন বাড়িঘর, বেশিরভাগই কাঠের। কয়েকটা স্টোর আছে, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বড়শিতে গাঁথার জ্যান্ত টোপ আর চকোলেট-লজেন্স থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায় ওগুলোতে।

একটা স্টোরে খোঁজ নিতেই ম্যারিবুর বাড়ি চিনিয়ে দিল। আশপাশের অন্যান্য বাড়ির চেয়ে সুরক্ষিত মনে হলো এটা, তিন তলা বিল্ডিঙ, মাটির নিচেও একটা তলা রয়েছে, তাতে অফিস। জানালায় লেখা রয়েছে ঃ চার্টার বোট ফিশিং।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর, একটা ডেস্কের ওপর একটা ফোন, আর আশেপাশে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। একটা র‍্যাকে ঝুলছে কিছু সাঁতারের পোশাক আর ডুবুরীর সরঞ্জাম।

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। আবার লাগিয়ে দিয়ে তালা আটকে দিল। ফিরে কিশোরকে দেখেই চমকে গেল। পকেটে চাবি রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

লম্বা-পাতলা লোক, ঢালু কাঁধ, মুখে বয়েসের রেখা। পরনে মলিন নীল স্যুট, সাদা শার্ট, খয়েরি টাই।

লোকের চেহারা, পোশাক, আচার-ব্যবহার খুব খুঁটিয়ে দেখা কিশোরের স্বভাব। এসব থেকে লোকটা কেমন স্বভাব-চরিত্রের, কি করে না করে, বোঝার চেষ্টা করে। তার অনুমান খুব কমই ভুল হয়। এই লোকটাকে দেখে তার মনে হলো, কোন ছোট দোকানে কেরানী কিংবা হিসাব রক্ষকের কাজ করে, কিংবা হয়তো ঘড়ির কারিগর। শেষ কথাটা মনে হলো লোকটার ডান চোখের দিকে চেয়ে।

ডান চোখের নিচেটায় অদ্ভুত ভাবে কুঁচকে গেছে চামড়া, অনেকটা কাটা দাগের মত মনে হয়। হয় মনোকল পরে লোকটা, নয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে আটকে রাখে, ঘড়ির কারিগররা যে জিনিস ব্যবহার করে।

'মিস্টার ম্যারিবু শ্যাটানোগাকে খুঁজছি,' ভদ্রভাবে বলল কিশোর।

'বলো।'

'আপনি মিস্টার শ্যাটানোগা?'

'হ্যাঁ। ক্যাপটেন শ্যাটানোগা।'

অফিসে ফোন বাজল। দরজার দিকে ঘুরে তাকাল ম্যারিবু, খুলবে কিনা দ্বিধা করল, শেষে না খোলারই সিদ্ধান্ত নিল।

'আমাকে দিয়ে আর কি হবে?' ম্যারিবুর কণ্ঠে হতাশা। 'গত হপ্তায় ঝড়ে আমার বোট ডুবে গেছে। লোকে মাছ ধরার জন্যে ভাড়া নিতে আসে, বোট দিতে পারি না।'

'সরি,' বলল রবিন। 'আমরা জানতাম না।'

'তোমরা কি মাছ ধরতে যেতে চাও?'

শুদ্ধ ইংরেজি বলে ম্যারিবু। কথায় তেমন কোন টান নেই, তবে বলার ধরনে বোঝা যায়, ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়। হয়তো মেকসিকো থেকে এসেছে, ভাবল রবিন, অনেকদিন আমেরিকায় আছে।

'না না, মাছ নয়,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার মেয়ের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছি।'

'আমার মেয়ে?' একটু যেন অবাক হলো ম্যারিবু। 'ও, টিনহার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা খবরটা কি?' জিজ্ঞেস করল ম্যারিবু।

'না, তেমন জরুরী কিছু নয়। ওশন ওয়ারল্ডে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এদিকে আসব বলেছিলাম। আপনাকে জানাতে বলল, আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবে সে।'

'অ,' একে একে কিশোর, রবিন আর মুসার ওপর নজর বোলাল ম্যারিবু। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। অবাক হয়েছে, কি করে ক্যাপটেন শ্যাটানোগা তাদের কথা জানল? তারপর মনে পড়ল, টিনহাকে একটা কার্ড দিয়েছিল কিশোর। তাদের কথা নিশ্চয় বাবাকে বলেছে টিনহা।

'তোমরা এসেছ, খুশি হলাম,' হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যারিবু। 'খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো না কিছু খেয়ে নিই। কাছেই দোকান।'

ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। খাওয়ার আমন্ত্রণে কোন সময় না করে না সে।

খেতে খেতেই প্রচণ্ড ঝড় আর বোট হারানোর গল্প শোনাল ম্যারিবু।

বিংগো উলফ নামের এক লোককে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। উপকূলের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই কোন রকম জানান না দিয়ে আঘাত হানে ঝড়। বোট বাঁচানোর অপ্রাণ চেষ্টা করেছে ম্যারিবু, কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে কুলাতে পারেনি। কাত হয়ে ডুবে যায় বোট। কোন রকমে টিকে ছিল দুজনে, ভেসে ছিল, পরনে লাইফ-জ্যাকেট ছিল তাই রক্ষা। অবশেষে কোস্ট গার্ডের জাহাজ ওদেরকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে।

শুনে খুব দুঃখ পেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। রবিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, বোটটা বীমা করানো আছে কিনা, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল কিশোর, 'আপনার মেয়ে খুব ভাল সাঁতারু, ক্যাপ্টেন। তিমির সঙ্গে যা সাঁতারায় না। ভাল ট্রেনার।'

'উঁ!...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওশন ওয়ারল্ডে।'

'অনেকদিন ধরেই একাজ করছে, না?' জিজ্ঞেস করল রবিন। বুঝতে পেরেছে, টিনহার আলোচনা চালাতে চায় কিশোর।

'বেশ কয়েক বছর।'

'অনেক দূরে যেতে হয় রোজ, ওশন ওয়ারল্ড তো কম দূরে না,' কিশোর বলল। 'এখান থেকেই যায় বুঝি?'

আনমনা হয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যারিবু। অন্য কিছু ভাবছে, বোঝা যায়। কফি শেষ করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে হয়েছে কি,' তিন গোয়েন্দাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে যেন সে, 'তিমিকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে মিস্টার উলফের খুব আগ্রহ। সান্তা মনিকায় পাহাড়ের ওপর তার একটা বাড়ি আছে।' বাড়িটার ঠিকানা দিল সে, যেটা আগের রাতেই চিনে এসেছে মুসা। 'একটা সুইমিং পুল আছে তার বাড়িতে। অনেক বড় পুল।'

রাস্তায় বেরোনোর আগে আর কিছু বলল না ম্যারিবু। আবার তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হবে, এই ইচ্ছে প্রকাশ করে, হাত মিলিয়ে বিদায় নিল।

ছেলেরা বার বার ধন্যবাদ দিল তাকে আতিথেয়তার জন্যে।

চলে যাচ্ছে লম্বা লোকটা। সেদিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'হুঁম্‌ম্‌!' মুসার কথার জবাবে, না এমনি বলল কিশোর, বোঝা গেল না। হাঁটতে শুরু করল। মোড়ের কাছে গাড়ি রেখে এসেছে।

গাড়ি ছাড়ল হ্যানসন। গলি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'খুব ভাল লোক। আমাদেরকে খাওয়াল।'

'তাই নাকি?' ফিরে তাকাল একবার হ্যানসন, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আবার পথের ওপর। 'ভুল হয়েছে আপনাদের। গাড়ি যেখানে রেখেছিলাম, তার পাশেই একটা গ্যারেজ আছে, দেখেছিলেন? চাকার হাওয়া দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখি পুরানো এক দোস্ত, মেকসিকান। সে বলল, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে গেছে।'

'হ্যাঁ, বলেছে আমাদেরকে,' বলল রবিন।

'যে বলেছে, সে অন্য লোক, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়।'

'কেন নয়?' লম্বা লোকটা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম কথা বলল কিশোর। ভাবে মনে হলো না অবাক হয়েছে, এটাই যেন আশা করছিল সে।

'কারণ, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা এখন হাসপাতালে। খুব অসুস্থ। কড়া নিউমোনিয়া বাধিয়েছে। এতক্ষণ পানিতে থাকা, হবেই তো। কারও সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা নেই বেচারার।'

পাঁচ

'লোকটা ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সাজতে গেল কেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

রকি বীচে ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা, হেডকোয়ার্টারে বসেছে।

'লম্বা লোকটা আসলে কে?' রবিনের প্রশ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কিশোর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে, চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। হাতের তালুর দিকে চেয়ে বলল, 'আমি একটা আস্ত গাধা, বোকার সম্রাট, মাথামোটা বলদ।'

কেন, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রবিন, কিশোরের এই ধরনের কথার সঙ্গে সে পরিচিত। মুসাও চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

'কেন জানো?' নিজেই ব্যাখ্যা করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করিনি। অফিসের বাইরে তখন লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, ও ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়, হতে পারে না। নাবিকের মত পোশাক পরেনি, হাত আর কাঁধের গঠন নাবিকের মত নয়। ওর ডান চোখের নিচে লক্ষ করেছ?'

'কুঁচকানো চামড়া?' রবিন বলল। 'করেছি। আমি দেখে ভেবেছিলাম স্বর্ণকার

বা ঘড়ির কারিগর। কিন্তু এমন আন্তরিক হয়ে গেল লোকটা, হ্যামবারগার কিনে খাওয়াল, ভুলেই গেলাম সব কিছু। হুতোম পেঁচার মত জমিয়ে বসে শুনে যাচ্ছিলাম ওর কথা...' কি বোকামিই না করে ফেলেছে ভেবে লাল হয়ে উঠল তার গাল।

'তখন আমিও বিশ্বাস করেছি তার কথা,' কিশোর বলল। 'শানকিতে ফেন দিয়ে চু-চু করে ডাক দিল আর অমনি খেতে চলে গেলাম। ছিহ্...'

'তুমি একা না, আমরাও গেছি,' কিশোর নিজেকে এত বেশি দোষারোপ করছে দেখে কষ্ট হলো রবিনের। 'একটা কথা কিন্তু ঠিক, নিজের পরিচয় ছাড়া আর কোন মিথ্যে বলেনি লোকটা...'

'হ্যাঁ, কয়েকটা সত্যি কথা বলেছে অবশ্য। ঝড়ে ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে যাওয়ার কথা বলেছে। কিংগো উলফের র‍্যাঞ্চের ঠিকানা দিয়েছে, সত্যিকার ঠিকানা। তারপর...'

কিশোরের মত সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা নেই রবিনের, তবে স্মরণ শক্তি খুব ভাল। 'তারপর, বলেছে, তিমি ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহ উলফের—তার বাড়িতে যে মস্ত বড় একটা সুইমিং পুল আছে সেকথাও বলল।'

'বলেছে,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'কিন্তু এতে রহস্য কোথায়?'

'যেভাবে বলেছে সেটাই রহস্য,' বলল কিশোর। 'ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেছে। আমাদের জানিয়েছে আসলে। কিন্তু টিনহার বাবা সাজতে গেল কেন? লোকটা কিভাবে বেরিয়ে এসেছিল, দেখেছ। দরজা বন্ধ করে তালা আটকাল, আমাদের দেখেই চমকে গেল, কেন? একটাই কারণ হতে পারে, চুরি করে ক্যাপটেনের অফিসে ঢুকেছিল সে, কিছু খুঁজছিল। শুধু অফিস না, হয়তো পুরো বাড়িই খুঁজেছে।'

'কি?' রবিন প্রশ্ন করল। 'লোকটাকে দেখে তো চোর মনে হলো না। কি খুঁজেছে?'

'তথ্য,' ভাবনার জগত থেকে ফিরে এল কিশোর। 'আমরা যে কারণে স্যান পেড্রো গিয়েছি, হয়তো একই কারণে সে-ও গিয়েছে—টিনহা আর ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সম্পর্কে জানতে চায়। তারপর বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে চমকে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলেছে, নিজেকে ক্যাপটেন বলে চালিয়েছে, নইলে যদি প্রশ্ন করি ও কি করছিল ওখানে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর? 'হয়েছে, চলো। ঘোড়া ছোটাইগে।' মুসাও উঠে দাঁড়াল, হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে, বুঝতে পারছে না।

রবিন বলল, 'উলফের বাড়ি যাচ্ছি?'

'আরি সব্বোনাশ, এখন?' আঁতকে উঠল মুসা। কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে মত পরিবর্তন করে বলল, 'ঠিক আছে, যেতে আপত্তি নেই, তবে আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। কিংবা আরেক কাজ করতে পারি, মেরিচাচীর কাছ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চেয়ে আনতে পারি, সাইকেল চালাতে চালাতে খাব। কয়েক টুকরো ভাজা মাংসও দেবেন চাচী যদি চাই, আর সকালে দেখলাম সুইস পনির বানাচ্ছেন...'

ওশন ওয়ারল্ড বন্ধ হতে দেরি আছে। তাড়াহুড়ো করল না ছেলেরা, শান্ত ভাবেই সাইকেল চালাল। পার্কিং লটে এসে সাদা পিকআপটার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে আসতে দেখা গেল টিনহা শ্যাটানোগাকে।

শীতটা যেতে চাইছে না, এই বিকেলেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তবে টিনহার পোশাক দেখে মনে হলো না তার শীত লাগছে। হাতে একটা টেরিক্লথের তৈরি আলখেল্লা ধরনের পোশাক অবহেলায় ঝুলছে। মনে মনে তাকে পেঙ্গুইনের সঙ্গে তুলনা করল কিশোর। সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক পরনে, পায়ে সাধারণ স্যাণ্ডাল।

'আরে, তোমরা,' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠল সে, 'আমাকে খুঁজছ?'

'মিস শ্যাটানোগা,' সামনে এগোল কিশোর, 'বুঝতে পারছি, অসময়ে এসে পড়েছি। সারাদিন কাজ করে নিশ্চয় ক্লান্ত এখন আপনি। তবু যদি কয়েক মিনিট সময় দেন...'

'আমি ক্লান্ত নই,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল টিনহা, 'তবে খুব ব্যস্ত। তোমরা কাল এসো।'

'আসলে, এখুনি বলা দরকার,' আরেক পা সামনে বাড়ল কিশোর। 'ব্যাপারটা...'

'কাল,' আবার বলল টিনহা। 'এই দুপুর নাগাদ,' সামনে পা বাড়াল, আশা করছে কিশোর পথ ছেড়ে দেবে।

কিন্তু কিশোর সরল না, আগের জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। টিনহার মুখের দিকে চেয়ে লম্বা দম নিল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'রোভার।'

থমকে গেল টিনহা। আলখেল্লাটা কাঁধে ফেলে কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়াল, বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'রোভারের পেছনে লেগেছ কেন?'

'পেছনে লাগিনি,' হাসার চেষ্টা করল কিশোর। 'মিস্টার উলফের পুলে ও আছে জেনে খুশি হয়েছি। এ-ও জানি, ওর যত্ন নিচ্ছেন আপনি। কয়েকটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।'

'আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমরা, মিস শ্যাটানোগা,' নরম গলায় বলল রবিন। 'বিশ্বাস করুন।'

'কিভাবে?' রবিনের দিকে ঘুরে চাইল টিনহা, কোমর থেকে হাত সরায়নি। 'কিভাবে সাহায্য করবে?'

'আমাদের সন্দেহ, কেউ আপনার ওপর গুপ্তচরগিরি করছে,' মুসা বলল। 'আজ স্যান পেড্রোতে গিয়েছিলাম। ক্যাপটেন শ্যাটানোগার অফিস থেকে একটা লোককে বেরোতে দেখলাম। আমাদের দেখে চমকে গেল। আপনার বাবা বলে নিজেকে চালানোর চেষ্টা করল।'

'ও আপনার বাবা হতেই পারে না, তাই না?' মুসার কথার পিঠে বলল কিশোর। 'আপনার বাবা জাহাজডুবিতে অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে।'

দ্বিধা করছে টিনহা, চোখের কড়া দৃষ্টি দূর হয়ে গেছে। ভাবছে কি করবে।

হাসল সে। 'বুঝতে পারছি তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা।'

'একেবারে,' মুসাও হেসে জবাব দিল। 'আমাদের কার্ডেই তো লেখা রয়েছে।'

'ও-কে,' আলখেল্লার পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি বের করল টিনহা। 'চলো না, গাড়িতে বসেই কথা হবে।'

'থ্যাংক ইউ, মিস শ্যাটানোগা,' রাজি হলো কিশোর। 'ভালই হয় তাহলে।'

'পাশা,' গাড়ির দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল টিনহা, 'তোমাকে শুধু পাশা বলেই ডাকব।'

'কিশোর।'

'ও-কে, কিশোর।...তোমাকে শুধু মুসা, আর তোমাকে রবিন। আপত্তি নেই তো?'

'না না, আপত্তি কিসের?' তাড়াতাড়ি বলল রবিন।

ওদের দিকে চেয়ে হাসল টিনহা। 'এসো, ওঠো।'

ড্রাইভারের পাশে দুজনের জায়গা হয়। নিজে থেকেই বলল মুসা, 'তোমরা বসো, আমি পেছনে গিয়ে বসছি। কিশোর, যা যা কথা হয়, পরে আমাকে সব বোলো।'

টিনহার পাশে বসেছে কিশোর, তার পাশে রবিন। হাইওয়ের দিকে চেয়ে কি ভাবছে টিনহা। সামনের একটা ট্রাফিক পোস্টে লাল আলো। গাড়ি থামিয়ে সবুজের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বলল, 'ওই যে লোকটা, যে বাবার অফিসে ঢুকেছিল, চেহারা কেমন তার?'

নিখুঁত বর্ণনা দিল কিশোর।

মাথা নাড়ল টিনহা। 'চিনলাম না'। হতে পারে বাবার কোন বন্ধু...কিংবা তার বিরুদ্ধে গোলমাল পাকাতে চায় এমন কেউ।'

সবুজ আলো জ্বলছে।

'ও-কে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা, 'তো বলো কি বলবে। কি জানতে চাও?'

'গোড়া থেকে সব,' বলল কিশোর। 'সোমবার সকালে স্যান পেড্রোতে উলফ আপনাকে টেলিফোন করার পর যা যা ঘটেছে সব। চরায় আটকা পড়া তিমিটা বিনকিউলার দিয়ে ও-ই তো দেখেছে, নাকি?'

ছয়

'সেদিন সকালে হাসপাতালে বাবাকে দেখে সবে ফিরে এসেছি,' শুরু করল টিনহা, 'ওর অফিসে ফোন বাজল। ধরলাম। বিংগো উলফ। দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, বাড়ি খুব সম্ভব অ্যালাবামায়। এর আগেও দু-তিনবার দেখেছি ওকে, বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে। ফোনে উলফ বলল, সৈকতে আটকে পড়া একটা তিমি দেখেছে সে।'

বলে গেল টিনহা, কিভাবে উদ্ধার করেছে ওরা তিমিটাকে। তার দুজন

মেকসিকান বন্ধুকে নিয়ে গেছে ট্রাকসহ। ক্রেনের সাহায্যে তিমিটাকে ট্রাকে তুলেছে, ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে সারা গা, যাতে ডিহাইড্রেটেড না হয়। তারপর তাড়াতাড়ি এনে ছেড়ে দিয়েছে উলফের সুইমিং পুলে, তারই অনুরোধে। টিনহা তিমিটার নাম রেখেছে রোভার, ওটার সঙ্গে সাঁতরেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ওটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।

একটা স্টোর থেকে জ্যান্ত মাছ জোগাড় করে দিয়েছে উলফ, তিমিটার খাবার জন্যে। ভালই চলছিল সব কিছু। খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছিল রোভার, বুদ্ধিমান জীব তো।

'সব তিমিই বুদ্ধিমান,' সান্তা মনিকার দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা। 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দেয়, হাজার হোক, এতবড় একটা মগজ। কিন্তু রোভারের বুদ্ধি যেন আর সব তিমিকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক বছর ধরে তিমিকে ট্রেনিং দিচ্ছি, কিন্তু ওর মত এত দ্রুত কেউ শিখতে পারেনি। বয়েস আর কত হবে, বড়জোর দুই—মানুষের তুলনায় অবশ্য পাঁচ কিংবা ছয়, বাঁচে তো মানুষের তিন ভাগের এক ভাগ সময়—কিন্তু দশ বছরের বুদ্ধিমান ছেলেকে ছাড়িয়ে গেছে ওর বুদ্ধি।'

তারপর উলফের বাড়িতে সেদিন কি হয়েছে, বলল টিনহা।

রোভারকে মাছ খাওয়ানো শেষ হলো। টিনহা ঠিক করল, স্যান পেড্রোতে যাওয়ার পথে হাসপাতালে নেমে বাবাকে আরেকবার দেখে যাবে। গাড়িতে করে তাকে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করল উলফকে। পুলের ধারে দাঁড়িয়েছিল উলফ, রোদে চকচক করছিল তার টাক।

হিসেবী ভঙ্গিতে টিনহার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ উলফ।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টিনহা। বলল, 'আগামীকাল ওশন ওয়ারল্ডে লোক পাঠাব, ওরা তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিয়ে আসবে,' বলেই গাড়িপথের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

থামাল তাকে উলফ। 'এক মিনিট, টিনহা। একটা কথা তোমার জানা দরকার, তোমার বাবা সম্পর্কে।'

'তোমার বাবা চোরাচালানী। টেপ রেকর্ডার, পকেট রেডিও, আরও নানারকম ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র মেকসিকোতে নিয়ে গিয়ে তিন-চার গুণ দামে বিক্রি করে। কয়েক বছর ধরে করছে একাজ।'

চুপ করে রইল টিনহা। উলফের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। তবে অবিশ্বাসও করতে পারল না। কি জানি, হতেও পারে। মাঝে মধ্যেই মুখ ফসকে বেশি কথা বলে ফেলে বাবা, উলফের কাছেও হয়তো বলেছিল। বাবাকে ভালবাসে টিনহা, আর দশটা মেয়ের চেয়ে বেশিই বাসে। ছোটবেলায় টিনহার মা মারা গেছে, তারপর আর বিয়ে করেনি বাবা, মা-বাবা দুজনের আদর দিয়েই মানুষ করেছে। এটাও অবশ্য অস্বীকার করে না টিনহা, তার বাবা পুরোপুরি সৎ নাগরিক নয়।

'গত ট্রিপে বেশ কিছু মাল নিয়ে চলেছিল,' আবার বলল উলফ। 'বেশিরভাগই পকেট ক্যালকুলেটর, মেকসিকোয় খুব চাহিদা। ঝড়ে পড়ে বোট ডুবল, সেই সঙ্গে

মালগুলোও।'

তবুও কিছু বলল না টিনহা।

'বিশ তিরিশ হাজার ডলারের কম দাম হবে না, আমেরিকাতেই,' বলে চলল উলফ। 'তার অর্ধেক আমার। দুজনে শেয়ারে ব্যবসা করতাম আমরা। ওয়াটারপ্রুফ কনটেইনারে রয়েছে ক্যালকুলেটরগুলো, পানি ঢুকতে পারবে না, নষ্ট হবে না। আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি হারাতে রাজি নই। বোটটা খুঁজে বের করে জিনিসগুলো তুলে আনা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে,' শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলল সে। ভয় দেখানোর একটা ভঙ্গিও রয়েছে। টিনহার মুখের দিকে তাকাল উলফ। 'তুমি আর তোমার এই তিমি। করছ তো সাহায্য?'

জবাব দেয়ার আগে ভালমত ভেবে দেখেছে টিনহা। ও জানে, আমেরিকান সরকার ধরতে পারবে না তার বাবাকে, বেআইনী কাজ বলতে পারবে না। পকেট ক্যালকুলেটর কিনে আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মাঝেও বেআইনী কিছু নেই। আর যাই করুক, আমেরিকান পুলিশের ভয় দেখিয়ে টিনহাকে ব্লেকমেল করতে পারবে না উলফ। মেকসিকান পুলিশের ভয় দেখিয়েও লাভ নেই। কারণ হাতে-নাতে ধরতে না পারলে কোন চোরাচালানীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে না ওরাও।

তবে সমস্যা হলো তার বাবাকে নিয়ে। বোটের বীমা করায়নি, কাজেই গেছে ওটা। নিজেরও চিকিৎসা-বীমা নেই। অথচ হাসপাতালে রোজ শ'য়ে শ'য়ে ডলার খরচ, আসবে কোথা থেকে? যদি উলফকে সাহায্য করে টিনহা, বোটটা খুঁজে পায়, ক্যালকুলেটরগুলো তুলতে পারে, শেয়ারের অর্ধেক টাকা মিলবে। দশ পনেরো হাজার দিয়ে হাসপাতালের বিল তো মেটাতে পারবে।

ভেবে দেখেছে টিনহা, সে-ও কোন বেআইনী কাজ করছে না। বোটটা তাদের। সেটা খোঁজার মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক।

'কাজেই রাজি হয়ে গেলাম,' পাহাড়ী পথের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল টিনহা। ওপরের দিকে উঠছে এখন গাড়ি। 'বোটটা খুঁজে বের করার জন্যেই রোভারকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

চুপচাপ সব শুনেছে এতক্ষণ কিশোর, একটি কথাও বলেনি। আরও এক মিনিট চুপ থেকে বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার। রোভারকে কলার পরিয়েছেন এ-কারণেই। গলায় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা ঝুলিয়ে দেবেন, গভীর পানিতে ডুব দিয়ে ছবি তুলে আনবে। ভাল বুদ্ধি। দুনিয়ার যে কোন ভাল ডুবুরীর চেয়ে ভাল পারবে রোভার, ওর মত এত নিচে কোন ডুবুরীই নামতে পারবে না। অনেক কম সময়ে অনেক বেশি জায়গা ঘুরে দেখতে পারবে।

'ঠিক বুঝেছে,' হেসে প্রশংসা করল টিনহা। 'তুমি আসলেই বুদ্ধিমান, তোমার বয়েসী অনেক কিশোরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।'

হাসি ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'রোভারের চেয়েও বেশি?'

তার রসিকতায় আবার হাসল টিনহা। 'ও-কে। এবার তোমার কথা বলো। রোভারের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? কি তদন্ত করছ তোমরা?'

ভাবল কিশোর। একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণার কথা বলবে? সত্যি বলাই স্থির করল সে, টিনহা যখন তার সঙ্গে মিথ্যে বলেনি, সে-ও বলবে না। 'আমাদের এক মক্কেল—নাম বলতে পারব না, বলেনি সে—তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে ফিরিয়ে দিতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে।'

'সাগরে ফিরিয়ে দিতে পারলে! কেন? কি লাভ তার?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'হুঁ? তো অর্ধেক কাজ তো তোমরা সেরে ফেলেছ,' উলফের বিরাট র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এনে গাড়ি রাখল টিনহা। 'বাকি কাজটা আমাকেই করতে দাও। পারলে সাহায্য কোরো আমাকে।'

'নিশ্চয় করব,' এতক্ষণে মুখ খুলল রবিন। 'কিন্তু কিভাবে?'

'ডাইভিং জানো?'

কিশোর জানাল, জানে তিনজনেই। তবে এ-ব্যাপারে মুসা ওস্তাদ, দক্ষ সাঁতারু, একথাও বলল।

'দারুণ,' বলল টিনহা, 'তোমাদের ওপর ভক্তি বাড়ছে আমার। তাহলে এক সঙ্গে কাজ করছি আমরা? যত তাড়াতাড়ি পারি রোভারকে সাগরে ছেড়ে দেব। তবে ছাড়লে চলে যাবে না এ-ব্যাপারে শিওর হয়ে নিতে হবে। তারপর বাবার বোটটা খুঁজতে সাহায্য করবে তোমরা আমাকে। কি বলো?'

'রাজি,' একই সঙ্গে জবাব দিল রবিন আর কিশোর। ওরা তো এইই চায়, রহস্য, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা। খুশি হয়ে উঠেছে। ছুটিটা ভালই কাটবে। সাগরে ডুবন্ত একটা বোট উদ্ধার, তিমির সাহায্যে, চমৎকার!

'এসো আমার সঙ্গে,' ধাক্কা দিয়ে এক পাশের দরজা খুলে ফেলল টিনহা, 'রোভারের সঙ্গে দেখা করবে।'

চোখ বুজে পানিতে চুপচাপ ভেসে রয়েছে রোভার, শরীরের অর্ধেক পানির নিচে। পুলের আলো জ্বেলে দিল টিনহা, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল তিমিটা। নড়ে উঠল। সাঁতরে চলে এল কিনারে, প্রভু বাড়ি ফিরলে কুকুর যে চোখে তাকায়, সেই দৃষ্টি। পাখনা আর লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল টিনহাকে।

মনে হলো, তিন গোয়েন্দাকেও চিনতে পেরেছে সে। ওরা পুলের কিনারে বসে পানিতে হাত রাখল। সবার হাতেই ঠোঁট ছুঁইয়ে আনন্দ প্রকাশ করল রোভার।

'খাইছে,' দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'ও আমাদের চিনতে পেরেছে।'

'চিনবে না মানে?' টিনহা বলল। 'ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমরা। ও কি মানুষের মত অকৃতজ্ঞ যে ভুলে যাবে?'

'কিন্তু একটা...'

কনুয়ের গুঁতো মেরে তাকে থামিয়ে দিল রবিন তাড়াতাড়ি, নইলে মুসা বলেই ফেলছিল 'একটা সাধারণ তিমি', তাতে মনঃক্ষুণ্ন হত টিনহা। মুসাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে যা যা কথা হয়েছে, সংক্ষেপে সব জানাল রবিন।

রোভারকে আগে খাওয়াল টিনহা। তারপর ফ্লিপার পরে নিল পায়ে। পানিতে পা নামাতে যাচ্ছিল, থেমে গেল একটা শব্দে। ঘুরে তাকাল। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে

বেরিয়ে এদিকেই আসছে দুজন লোক।

মুসার কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে, দেখেই উলফকে চিনতে পারল কিশোর। অন্য লোকটাকে চিনল তিনজনেই। সেই লম্বা লোকটা, যে নিজেকে টিনহার বাবা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

'আপনি এখানে আসবেন না বলেছিলেন,' উলফকে দেখে রেগে গেছে টিনহা। 'খবরদার আর আসবেন না। রোভারের ট্রেনিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসতে পারবেন না।'

জবাব দিল না উলফ। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওরা কারা?' কারা উচ্চারণ করল ও 'কা-আরা'।

'আমার বন্ধু,' বলল টিনহা। 'স্কুবা ডাইভার। আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল উলফ, যদিও বোঝা গেল, এসব পছন্দ করছে না সে। কিন্তু টিনহা বলেছে তার বন্ধু, তাই আর প্রতিবাদও করতে পারল না।

উলফের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখছে টিনহা। 'বন্ধুটি কে?'

'আমার নাম বনেট,' নিজেই পরিচয় দিল লম্বা লোকটা। 'নীল বনেট। উলফের পুরানো বন্ধু। আপনার বাবারও বন্ধু মিস।' হেসে বলল, 'মেকসিকো থেকে এসেছি।'

'অ। ও-কে।'

কিশোর বুঝতে পারছে, নামটা টিনহার অপরিচিত, আগে কখনও দেখেনি লোকটাকে। কিন্তু তার 'মেকসিকো থেকে এসেছি' কথাটা বলার পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বনেটের হাসি বিস্তৃত হলো। 'তাহলে তোমরা স্কুবা ডাইভার। ওশন ওয়ারল্ডে মিস শ্যাটানোগার সঙ্গে কাজ করো?'

'মাঝে মাঝে,' চট করে জবাব দিল টিনহা, 'স্থায়ী কিছু না। ও, সরি, পরিচয় করিয়ে দিই। কিশোর, মুসা, রবিন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' আগে থেকেই যে চেনে এটা সামান্যতম প্রকাশ পেল না লোকটার দৃষ্টিতে, হাসিমুখে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

হয় স্মরণশক্তি সাংঘাতিক খারাপ, নয়তো দিনের বেলায়ও ঘুমের ঘোরে হাঁটে ব্যাটা, লোকের সঙ্গে কথা বলে, ভাবল কিশোর। কিন্তু এর কোনটাই বিশ্বাস করতে পারল না সে। আসলে লোকটা একটা মস্ত ধড়িবাজ, তাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে, এটা জানাতে চায় না টিনহাকে।

কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। কি লুকাতে চায় নীল বনেট?

সাত

'নীল বনেটের,' বলল কিশোর, 'এই রহস্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

প্রশ্নটা করেছে সে নিজেকেই। মুখ ফুটে ভাবনা বলা যেতে পারে একে।

টিনহার সঙ্গে উলফের বাড়ি গেছে, তার পরের দিনের ঘটনা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে অপেক্ষা করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তিন গোয়েন্দা, বার বার তাকাচ্ছে পথের দিকে। বিকেলে ওশন ওয়ারল্ড থেকে ছুটি নিয়ে লাঞ্চ খেয়ে সোজা এখানে চলে আসার কথা টিনহার, তিন গোয়েন্দাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা।

'এই কাহিনীর একটা অংশ বনেট,' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। 'টিনহা ওকে চেনে না। কিন্তু লোকটা সব জানে বলে মনে হলো, 'টিনহার বাবার মেকসিকোতে ট্রিপ দেয়ার কথাও নিশ্চয় অজানা নয়।'

'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বাড়িতেও সার্চ করতে গিয়েছিল,' রবিন বলল।

'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার নাকি আবার বন্ধু,' বলল রবিন। 'তাহলে চুরি করে তার বাড়িতে ঢোকে কেন?'

'উলফেরও বন্ধু,' কিশোর বলল। 'সেদিন বোটে যে দুজনকে দেখেছিলাম, একজন বনেট হতে পারে।'

'কারও ভাল বন্ধু নয় সে। উলফকেও তো জানাতে চাইল না, আমাদের সঙ্গে স্যান পেড্রোতে তার পরিচয় হয়েছে।'

'একটা কথা ঠিক,' মুসা মুখ খুলল, 'আগে থেকেই ও আমাদের নাম জানে, নইলে স্যান পেড্রোতে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনল কিভাবে?'

'আমিও তাই বলি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'ব্যাটা সবই জানে। স্মাগলিঙের কথা জানে, ঝড়ে বোট ডুবে যাওয়ার কথা জানে, তিমির সাহায্যে পকেট ক্যালকুলেটর উদ্ধারের কথাও জানে। শুধু বুঝতে পারছি না, ও এর মাঝে আসছে কি...' চুপ হয়ে গেল সে। পথের মোড়ে দেখা দিয়েছে সাদা পিকআপ।

ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ছোট একটা ধাতব বাক্স নিয়ে এল কিশোর।

পিকআপে উঠল তিন গোয়েন্দা, আগের দিনের মতই কিশোর আর রবিন সামনে, মুসা পেছনে।

বাক্সটা টিনহাকে দেখিয়ে বলল কিশোর, 'এই জিনিসই চেয়েছিলেন আপনি।'

'বানিয়ে ফেলেছ?' খুশি হলো টিনহা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ভোর পাঁচটায় উঠে কাজে লেগেছিল, আগের রাতে নির্দেশ পেয়েছে টিনহার কাছ থেকে, সারাটা সকাল ব্যয় করে বানিয়েছে জিনিসটা। বাক্সটা কি করে খোলে দেখাল সে।

ভেতরে একটা টেপ রেকর্ডার—ব্যাটারিতে চলে, একটা মাইক্রোফোন আর স্পীকারও আছে। এমনভাবে সাজিয়েছে জিনিসগুলো, বাক্সটা বন্ধ করে রাখলেও রেকর্ড কিংবা ব্রডকাস্ট করতে পারবে। বাথটাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। পানির নিচে নিখুঁত কাজ করে যন্ত্রটা, এক বিন্দু পানি ঢোকে না বাক্সের ভেতরে।

'ইলেকট্রনিক্সের যাদুকর তুমি,' প্রশংসা করল টিনহা।

'আরে না না, কি যে বলেন। সাধারণ একটা হবি,' মুখে বিনয় প্রকাশ করছে বটে কিশোর, কিন্তু রবিন জানে নিজেকে টমাস এডিসন মনে করে সে। তবে

ইলেকট্রনিক্সের টুকটাক কাজে যে তার বন্ধু ওস্তাদ এটা স্বীকার করতেই হয়। ওই তো, চোখের সামনেই তো রয়েছে কিশোরের অ্যাসেমবল করা একটা জিনিস।

সঙ্গে স্কুবা মাস্ক আর ফ্লিপার নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে পোশাক বদলে সুইম স্যুট পরে নিল। পুলের কাছে জড় হয়েছে সবাই।

উলফ কিংবা তার বন্ধু নীল বনেটকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'আমাদের কাজে নাক গলাতে নিষেধ করে দিয়েছি ওদের,' বলল টিনহা। 'যদি না শোনে...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

'না শুনলেও না করে পারবেন না, তাই না?' নরম গলায় বলল রবিন।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা। 'ঠিকই বলেছ, পারব না। বাবার খুব টাকার দরকার। ওই মালগুলো খুঁজে আনতেই হবে।'

'আপনার বাবা কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাল না। তবে জান খুব শক্ত, খাঁটি মেকসিকান বুড়ো তো,' বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল টিনহা। 'ডাক্তাররা বলছে, ভাল হয়ে যাবে। রোজ কয়েক মিনিট দেখা করার সময় দেয়, বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। একটা কথাই বার বার বলে...' থামল সে, টেনেটুনে পায়ে জায়গামত লাগিয়ে নিল ফ্লিপার, তারপর বলল, 'তোমরা গোয়েন্দা। হয়তো কিছু বুঝতে পারবে। বাবা বলে ঃ দুটো পোলের দিকে নজর রাখবে। একই লাইনে রাখবে।'

পুলে নামল টিনহা। পানির তলা দিয়ে উড়ে এসে তাকে স্বাগত জানাল রোভার।

'দুটো পোল,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো কিশোরের, 'একই লাইনে রাখবে।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'পোল; পোলিশকে বুঝিয়েছে হয়তো,' বলল রবিন। 'নীল বনেট পোল্যাণ্ডের লোক হতে পারে। নামটা ওরকম, কথায় টান নেই বটে, কিন্তু বলার ভঙ্গি...'

'লক্ষ করেছ তাহলে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'বলার ভঙ্গির মধ্যে পোলিশ একটা গন্ধ রয়েছে। আচ্ছা, একজন যদি বনেট হয়, আরেকজন কে?' মুসার দিকে চেয়ে বলল সে।

'আমাকে মাপ করো, বলতে পারব না।' পুলের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আরে দেখো, দেখো!'

পুলের মধ্যে চক্কর দিচ্ছে রোভার, তার পিঠে সওয়ার টিনহা, জড়িয়ে ধরে রেখেছে দুই বাহু দিয়ে।

পরের আধ ঘণ্টা রোভার আর টিনহার খেলা দেখল তিন গোয়েন্দা। আনাড়ি যে কেউ দেখলে বলবে খেলা, কিন্তু টিনহা জানে, এটা খেলা নয়, কঠিন ট্রেনিং। ওর বাধ্য করে নিচ্ছে তিমিটাকে। কোন ইঙ্গিতে কি করতে হবে বোঝাচ্ছে।

মানুষ আর তিমিতে আজব বন্ধুত্ব। ভাবল মুসা। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, একে অন্যের মনের কথা পড়তে পারছে টিনহা আর রোভার। টিনহার মুখের সামান্যতম ভাব পরিবর্তনেরও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটছে তিমিটার মাঝে।

রোভারকে খাওয়াল টিনহা। তিন গোয়েন্দাকে পুলে নেমে তিমিটার সঙ্গে

খেলতে বলল।

রোভারের পাশে সাঁতরাতে প্রথম একটু ভয় ভয় করল মুসার, রোভার তার গায়ে ঠোঁট ঘষতে এলেই ভয় পেয়ে সরে গেল, আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল সে। রবিন আর কিশোরের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব হয়ে গেল বিশাল, বুদ্ধিমান জীবটার। টিটকারি মারতেও ছাড়ল না একবার রবিন। 'গায়েগতরে এক রকম তো, কাজেই দোস্ত।'

কিছু মনে করল না মুসা, হাসল শুধু।

'দেখাচ্ছে ভালই,' মুসাকে বলল টিনহা। 'কিশোর, তোমার যন্ত্রটা কাজে লাগাও।'

পুলের অন্য প্রান্তে ভাসছে রোভার। ওখানেই থাকতে শিখিয়েছে টিনহা, না ডাকলে আর কাছে আসবে না।

'দেখি, দাও আমার কাছে,' কিশোরের হাত থেকে রেকর্ডারটা নিল টিনহা। রেকর্ডিং সুইচ টিপে দিল। কোমরে একটা ওয়েটবেল্ট পরে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পুলে। ইঙ্গিত পেয়ে রোভারও ডাইভ দিয়ে চলে গেল পুলের তলায়।

তাজ্জব হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। টিনহা ডুব দিয়েছে তো দিয়েছেই, ওঠার নাম নেই। এতক্ষণ দম রাখছে কি করে! পরিষ্কার পানিতে দেখা যাচ্ছে তিমির মুখের কাছে যন্ত্রটা ধরে রেখেছে টিনহা, আরেক হাতের আঙুল নাড়ছে, মাঝেমধ্যে মটকাচ্ছে—দেখেই অনুমান করা যায়।

প্রায় দুই মিনিট পর ভেসে উঠল টিনহা। আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে, ছাড়ছে, তাড়াহুড়ো করছে না। ফুসফুসকে শান্ত করে হাসল। ডেকে বলল, 'রেকর্ড করেছি। শোনা যাক, কেমন উঠেছে।'

টেপটা শুরুতে গুটিয়ে নিল কিশোর, তারপর প্লে করল। প্রথমে ঢেউয়ের মৃদু ছলাতছল ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপর কয়েকটা মটমট, টিনহার আঙুল ফুটানোর আওয়াজ।

তারপর স্পীকারে স্পষ্ট ভেসে এল পাখির কাকলীর মত শব্দ, একবার উঁচু পর্দায় উঠেছে, আবার নামছে, সঙ্গে করতালি দিয়ে সঙ্গত করা হচ্ছে যেন।

হাততালি বাদ দিলে একেবারে পাখি, ভাবল কিশোর। তবে অনেক বেশি জোরাল, গম্ভীর, কম্পন সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। এ-জাতীয় শব্দ আগে কখনও শোনেনি সে, ডাঙার কোন কিছুর সঙ্গেই পুরোপুরি তুলনা করা যায় না।

'রোভার?' ফিসফিস করে বলল রবিন, জোরে বললে যেন আবেশ নষ্ট হবে। 'রোভারের গান?'

'গান বলো, কথা বলো, যা খুশি বলতে পারো,' বলল টিনহা। 'এরকম শব্দ করেই ভাব প্রকাশ করে তিমি। তিমির ভাষা বোঝা সম্ভব হয়নি। হলে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের কথার মতই অর্থবহ, জটিল ওদের কথাও।'

ক্লিপার খুলে নিল টিনহা। 'তবে মানুষের মত ঝগড়া করে না ওরা, লড়াই করে না। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য। মিথ্যেও বলে না নিশ্চয়। কথা বলেই বা কি লাভ, যদি সেটাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে খালি খারাপের দিকে নিয়ে যাই?'

'আবার শুনি?' মুসা অনুরোধ করল।

'দাঁড়াও, আগে রোভারকে শুনিয়ে নিই।'

টেপটা আবার শুরুতে এনে প্লে টিপে যন্ত্রটা টিনহার হাতে দিল কিশোর। পুলের কিনারে ঝুঁকে বাক্সটা পানির তলায় নিয়ে গেল টিনহা। রোভারকে লক্ষ করছে তিন গোয়েন্দা।

আরাম করে শুয়ে আছে পুলের তলায় রোভার। হঠাৎ শিহরণ খেলে গেল বিশাল শরীরটায়। শরীরের দুপাশে টান টান হয়ে গেল পাখনাগুলো। শাঁ করে এক ছুটে চলে এল পুলের এপাশে। রবিনের মনে হলো হাসছে তিমিটা, প্রথমদিন যেমন করে হেসেছিল, তেমনি।

কাছে এসে থামল রোভার। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঠোঁট ছোঁয়াল বাক্সের গায়ে।

'ও-কে, গুড,' বাক্সটা পানি থেকে তুলল টিনহা। 'লক্ষ্মী রোভার, লক্ষ্মী ছেলে।' সন্তুষ্ট হয়েছে। একটা মাছ উপহার দিল

পানি থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যেই খপ করে মাছটা ধরল রোভার, ঝপাত করে পড়ল আবার পানিতে।

'এটাই দেখতে চেয়েছিলাম,' বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করে বলল টিনহা। 'মনে হচ্ছে কাজ হবে। সাগরে ছাড়লে দূরে চলে গেলেও এর সাহায্যে ডেকে আনতে পারব। ওর ডাকই ওকে ফিরিয়ে আনবে।'

'আরেকটা ক্যাসেটে রি-রেকর্ড করে দিতে পারি,' কিশোর পরামর্শ দিল। 'এটাকে বার বার প্লে করে অন্য ক্যাসেটে রেকর্ড করতে থাকব, এখানে আছে দেড়-দুই মিনিট, আধ ঘণ্টা বানিয়ে ফেলতে পারব এটাকে।'

'মন্দ বুদ্ধি না,' বাক্সটা বাড়িয়ে দিল টিনহা। 'হাসপাতালে যাওয়া দরকার। চলো, তোমাদেরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে পথের পাশে পার্ক করা আছে সাদা পিকআপ। আগের মতই এবারেও মুসা উঠল পেছনে, অন্য তিনজন সামনে।

খুব সতর্ক, দক্ষ ড্রাইভার টিনহা। কিন্তু এখন তার চালানো দেখে মনে হচ্ছে, কেমন যেন বেসামাল। মোড়ের কাছেও গতি কমাচ্ছে না, বেপরোয়া, গতির রেকর্ড ভঙ্গ করতে চলেছে যেন।

সামনে ডান দিকে তীক্ষ্ণ একটা মোড়। লাগামছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে যাচ্ছে গাড়ি।

হ্যাণ্ডব্রেক টানল টিনহা। কিছুই হলো না। গতি কমল না গাড়ির। ইমারজেন্সী ব্রেকটা পুরো চাপল। কিন্তু স্পীডোমিটারের কাঁটা তোয়াক্কাই করল না, দ্রুত সরে যাচ্ছে ডানে, চল্লিশ···পঁয়তাল্লিশ···পঞ্চাশ।

'কি হয়েছে···,' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। 'ব্রেকে গোলমাল?'

মাথা ঝাঁকাল টিনহা। 'কিছুতেই কাজ করাতে পারছি না।' গীয়ারের হাতল চেপে ধরে টান দিল, ইঞ্জিন নিচু গীয়ারে এনে গতি কমাতে চাইছে। থরথর করে কাঁপছে গাড়ি। মিটারের কাঁটা অস্থির।

আট

পথের মাঝখানে গাড়ি নিয়ে এসেছে টিনহা। উল্টো দিক থেকে যদি কোন গাড়ি আসে এখন, মুখোমুখি সংঘর্ষে চুরমার হয়ে যাবে দুটোই।

সামনে গাড়ি দেখা গেল না। ভীষণ দৈত্য মনে হচ্ছে এখন সামনের মোড়ের পাথুরে পাহাড়ী দেয়ালটাকে।

ড্যাশবোর্ডে পা, আর সীটের পেছনে পিঠের চাপ দিয়ে শরীরটাকে কঠিন করে তুলেছে কিশোর আর রবিন। ধাক্কা প্রতিরোধের জন্যে তৈরি। কতখানি ঠেকাতে পারবে, আদৌ পারবে কিনা, জানে না।

শাঁই করে ডানে স্টিয়ারিং কাটল টিনহা, একই সঙ্গে রিভার্স করে দিল গীয়ার।

এখনও দেয়ালটা ছুটে আসছে মনে হচ্ছে।

চোখের পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা, একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটতে যতখানি সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যে। হঠাৎ যেন এক পাশে সরে গেল দেয়াল, পরক্ষণেই পাশের জানালার কয়েক ইঞ্চি তফাতে চলে এল। গোঁ গোঁ চিৎকারে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ইঞ্জিন। সীট খামচে ধরেছে কিশোর আর রবিন। কাজগুলো করছে অনেকটা অবচেতন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে। আসলে তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে তাদের মগজ।

স্টিয়ারিং এখনও ডানেই চেপে রেখেছে টিনহা। ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে টায়ার। জোর ঘষা লাগছে জানালার সঙ্গে দেয়ালের। খামচে টেনে জানালার চামড়া ছিঁড়ে রাখতে চাইছে রুক্ষ পাথরের দেয়াল।

স্টিয়ারিং সোজা করল টিনহা। দেয়ালের সঙ্গে একপাশের পুরো বডির ঘষা লাগছে এখন। চাকা জ্যাম হয়ে গেল। পিছলে আরও দশ গজ মত সামনে বাড়ল গাড়ি, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

পুরো এক মিনিট কেউ কোন কথা বলতে পারল না। স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে টিনহা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

'ও-কে,' মাথা তুলল টিনহা। কণ্ঠস্বর খসখসে, কিন্তু সামলে নিয়েছে অসাধারণ স্নায়ুর জোর। 'চলো, নামি। দেখি, ক্ষতি কতখানি হয়েছে। রবিন, তোমার ওদিক দিয়ে বেরোতে হবে, এদিকে দরজা আটকে গেছে।'

নামল তিনজনে। রবিনের গায়ের কাঁপুনি থামেনি। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। মনে পড়ল মুসার কথা।

ঝট করে সোজা হলো রবিন, তাড়াতাড়ি গিয়ে পেছনের টেইলগেট নামিয়ে উঁকি দিল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'কিশোর, দেখে যাও।'

ছুটে এল কিশোর। দুজনে উঠে পড়ল ট্রাকের পেছনে।

হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুসা। নিথর। তাড়াতাড়ি তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল রবিন।

নড়েচড়ে উঠল মুসা। চোখ মেলল। ফিসফিস করে বলল, 'আল্লাহ্‌রে।...বেঁচে

আছি না মরে গেছি…'

'বেঁচেই আছ,' এত উত্তেজনার মাঝেও মুসার কথার ধরনে না হেসে পারল না রবিন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বন্ধুকে নিরাপদ দেখে। 'পালস ঠিক আছে, কথার ভঙ্গিও আগের মতই।'

'কে বলল আগের মত?' উঠে বসে হাত-পা ভেঙেছে কিনা টিপেটুপে দেখল মুসা। 'গলার ভেতরে কোলাব্যাঙ ঢুকেছে বুঝতে পারছ না?…কিন্তু হয়েছিল কি? ঠাটা পড়েছিল? নাকি দৌড়ের বাজি লাগিয়েছিল।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার মনে হয় ব্রেকের সংযোগ কেটে দিয়েছে কেউ।'

'ইচ্ছে করে?' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'চলো, গিয়ে দেখি,' বলল রবিন।

কিশোরের অনুমান ঠিক, বোঝা গেল। ওরা ট্রাকের পেছন থেকে নেমে এসে দেখল, বনেট তুলে ভেতরে দেখছে টিনহা। ব্রেক প্যাডালের কানেকশন রডটা কাটা, হ্যাণ্ডব্রেকের সংযোগও বিচ্ছিন্ন। করাত দিয়ে নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে।

'উলফের বাড়ির বাইরে যখন ছিল, তখন কেটেছে,' কিশোর বলল। 'অনেকক্ষণ সময় পেয়েছে কাটার।'

'কে কাটল?' ভুরু কোঁচকাল টিনহা। 'কেন?'

কিশোরও জানে না এই প্রশ্নের জবাব। এ-নিয়ে ভাবতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।

পরের দু-ঘণ্টায় অনেক কাজ করতে হলো। একটা টেলিফোন বুদে গিয়ে ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করল টিনহা। ক্রেন নিয়ে এল তার দুই মেকসিকান বন্ধু। সাদা পিকআপটাকে টেনে নিয়ে চলল ওরা। তিন গোয়েন্দাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ইয়ার্ডে।

সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। পুরোপুরি চালু করে দিল মগজ।

'কেউ,' শব্দ করে ভাবছে কিশোর, যাতে তার ভাবনায় সাহায্য করতে পারে রবিন আর মুসা, 'কেউ একজন চাইছে না, আমরা ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোটটা খুঁজে বের করি। আজ আমাদের খুন করতে চেয়েছিল সে-ই, কিংবা মারাত্মক আহত, টিনহাকে ঠেকাতে চেয়েছিল। ঠেকাতে চেয়েছিল আমাদের সবাইকেই, যাতে রোভারকে ট্রেনিং দিয়ে বোটটা খুঁজতে না পারি।' থামল সে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর বলল, 'তিনজন এখন আমাদের সন্দেহভাজন, চিনি, এমন তিনজন। এক,' এক আঙুল তুলল সে, 'বিংগো উলফ। কিন্তু বোটটা খুঁজে পেলেই তার লাভ বেশি। সে-ই তো সব করেছে, টিনহাকে ফোন করেছে, তিমিটাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে, তার বাড়িতে পুলে জায়গা দিয়েছে, ওটাকে ট্রেনিং দেয়াতে বাধ্য করেছে টিনহাকে। এ সবই প্রমাণ করে, আমাদের সাফল্য চায় সে।'

আবার থামল কিশোর। দুই আঙুল তুলল। 'দুই নম্বর, নীল বনেট। ওর সম্পর্কে কি জানি আমরা? বলতে গেলে কিছুই না। আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে সে। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার আগে থেকেই জানে আমাদের নাম, আমরা কে? কি করে জানল?'

কেউ জবাব দিল না।

'অনেক মিছে কথা বলেছে সে আমাদের সঙ্গে, টিনহার বাবা সেজেছে,' আবার বলে চলল কিশোর। 'তবে কিছু সত্যি কথাও বলেছে। বলেছে, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল উলফ, সে-সময় ঝড়ে ক্যাপটেনের বোট ডুবেছে মেকসিকোতে যাওয়ার সময়, না না, দাঁড়াও,' হাত তুলল সে, 'ভুল বলেছি। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফেরার সময়।'

চুপ করে রইল দুই সহকারী।

নিথর হয়ে বসে রইল কিশোর কয়েক মুহূর্ত, তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টেলিফোন। ডায়াল করল।

'হ্যালো,' স্পীকারে বেজে উঠল টিনহার কণ্ঠ।

'আমি কিশোর।'

'ও, কিশোর। ভাল আছো? উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

'না, উদ্বিগ্ন নই,' জবাব দিল কিশোর। 'বিস্মিত।'

'বিস্মিত! কেন?'

'কয়েকটা কথা জানা দরকার। হয়ত সাহায্য করতে পারবেন।'

'বলো।'

'ওশন ওয়ারল্ডে আপনাকে আমাদের একটা কার্ড দিয়েছিলাম মনে আছে? কাউকে দেখিয়েছেন?'

'না।'

'কার্ডটা কি করেছেন?'

'ডেস্কের ওপরই ফেলে রেখেছিলাম।'

'অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে?'

'পারে। আরও কয়েকজন ট্রেনার বসে ওঘরে। দারজার তালা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। তোমরা সেদিন চলে যাওয়ার পর কার্ডটা রেখে তাড়াতাড়ি...'

'...চলে গিয়েছিলেন রোভারের কাছে, ও ভাল আছে কিনা দেখতে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'মোড়ের কাছেই ছিলাম আমরা। আপনাকে পিকআপ নিয়ে যেতে দেখেছি।'

'অ। তোমাদের নাকের ডগা দিয়েই গেছি তাহলে,' থামল টিনহা। 'আর কিছু বলবে?'

'আপনার বাবার সম্পর্কে। উলফকে শেষ কবে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার বাবা যেবার তাঁর বোট ডুবেছে?'

দীর্ঘ নীরবতা। মনে করার চেষ্টা করছে বোধহয় টিনহা। 'বলতে পারব না। মাঝেমধ্যেই কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আর স্যান পেড্রোতে যাওয়া সম্ভব হয় না। সান্তা মনিকায় আমার এক বান্ধবীর ঘর শেয়ার করি। প্রতি সোমবারে বাবাকে দেখতে যেতাম স্যান পেড্রোতে। কিন্তু সেবার স্যান ডিয়েগোতে গিয়েছিলাম, বাড়ি যাইনি। দু-হপ্তা বাবার খোঁজ নিতে পারিনি, তারপর হাসপাতাল থেকে ফোন

এল…' কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তার। মর্মান্তিক সেই মুহূর্তটা মনে পড়েছে হয়তো।

সহানুভূতি দেখিয়ে চুপ করে রইল কিশোর, টিনহাকে সামলে নেয়ার সময় দিল। 'কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি। পুরো চোদ্দ-পনেরো দিনই হয়তো বাবা আর উলফ সাগরে ছিল, এবং সেটা জানার উপায় ছিল না, এই তো?'

'তাই নয় কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'ব্যাপারটা খুব জরুরী?'

জরুরী, জানাল কিশোর।

টিনহা লাইন কেটে দেয়ার পরও অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল গোয়েন্দাপ্রধান, গভীর ভাবনায় ডুবে রইল। সত্যিই কি বাজায় গিয়েছিল ক্যাপটেন আর উলফ? ফেরার পথেই ঝড়ে পড়েছিল? জানতে হবে।

কিন্তু কিভাবে? মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাবে?'

'নিশ্চই?' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'যাব না মানে।'

'রবিন?'

'যাব,' বিখ্যাত চিত্রপরিচালককে সাহায্যের অনুরোধ করবে, বুঝতে পারছে রবিন, কিন্তু একটা কথা ভুলে যায়নি। তিনজন সন্দেহভাজনের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করেছে কিশোর, আরেকজন কে?

'কিশোর, এক সেকেণ্ড,' বলল রবিন। 'আরেকজন কাকে সন্দেহ করছ?'

দুই সুড়ঙ্গের পাল্লা তুলে ফেলেছে কিশোর, রবিনের কথার জবাব দিল না। অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

'হুঁ, বেশ জটিলই মনে হচ্ছে,' সব শুনে বললেন ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'বসো, দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

পর পর কয়েকটা ফোন করলেন তিনি বিভিন্ন জায়গায়। তারপর বেয়ারাকে ডেকে আইসক্রীম আনতে বললেন। বিশাল টেবিলে তার সামনে পড়ে থাকা খোলা ফাইলটা আবার টেনে নিতে নিতে বললেন, 'তোমরা খাও, আমি কাজটা সেরে নিই, খুব জরুরী। চিন্তা নেই, খবর এসে যাবে।'

ধীরে ধীরে খেলো ছেলেরা। কাজ করেই চলেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। চুপচাপ বসে থেকে তাদের সময় আর কাটতে চাইছে না। কথাও বলতে পারছে না, চিত্রপরিচালকের কাজের অসুবিধে হবে। অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিশোর প্রায় বলেই ফেলেছিল, আমরা এখন যাই, বাড়ি গিয়ে ফোন করে খবর জেনে নেব, ঠিক এই সময় বাজল ফোন।

রিসিভার তুলে নিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। নীরবে শুনতে লাগলেন ওপাশের কথা। শুনছেন, মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ করছেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা, মুসা কাত হয়ে গেছে একপাশে, যেন ওভাবে ঝুঁকে কান খাড়া করলেই রিসিভারের কথা শোনা যাবে।

অবশেষে রিসিভার নামিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,

'খবর কিছু পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের কেসে এটা কি করে ফিট হবে বুঝতে পারছি না।'

'কি খবর, স্যার?' উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল কিশোর, আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

'মেকসিকান ইমিগ্রেশন অথরিটির কাছে ফোন করেছিলাম। খোঁজ নিয়েছে ওরা। ফেব্রুয়ারির দশ তারিখে ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোটে উঠেছিল বিংগো উলফ। লা পাজে, বন্দরে ছিল দুদিন, বারোই ফেব্রুয়ারি রওনা হয়েছে।'

মাথা নোয়াল কিশোর, ভ্রূকুটি করল। 'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলল সে। 'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবেছে সতেরো তারিখে, নিঃসন্দেহে বাজা থেকে ফেরার পথে। স্যান পেড্রোতে ফিরছিল, এই সময় ঝড়ে পড়ে বোট।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। 'আমার যা মনে হয়, মেকসিকো উপকূলের কাছেই কোথাও মাল চালান দেয়। তবে,' আবার চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরল সে, 'সেবার বোধহয় কোন কারণে মাল নামাতে পারেনি। ওগুলো নিয়েই আবার ফেরত আসছিল। কিংবা মিছে কথা বলেছে উলফ, ক্যালকুলেটরগুলো আদৌ নেই জাহাজে। আপনার কি মনে হয়, স্যার?'

'বুঝতে পারছি না,' হাসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'প্রথমেই তো বললাম, এবারের কেসটা বেশ জটিল।'

'আমার কাছেও পরিষ্কার হয়নি এখনও,' উঠল কিশোর। 'তো আমরা আজ যাই, স্যার।'

'এসো।'

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পেছন থেকে চেয়ে আছেন চিত্রপরিচালক। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। বিড় বিড় করলেন, 'ছেলে একখান। ওর পেট থেকে কথা আদায় করা…' ফাইলটা টেনে নিলেন আবার।

নয়

'কি বুঝলি, কিশোর?' মেরিচাচী বললেন। 'পারবি?'

ওয়ার্কশপের কোণে রাখা পুরানো ওয়াশিং মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আগের দিন কিনে এনেছেন ওটা রাশেদ চাচা। এককালে বোধহয় সাদা রঙ ছিল, এখন হলদে হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় চলটা ওঠা। জায়গায় জায়গায় বাঁকাচোরা, টেপ খাওয়া। কিশোরের মনে হলো, দোমড়ানো কাগজ হাত দিয়ে চেপেচুপে আবার সোজা করা হয়েছে। মোটরটার অবস্থা কি হবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে। বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। সারা দিন লাগবে।'

চাচী হাসলেন। দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হলো। কিশোরের চেষ্টা করা মানেই তিনি ধরে নিলেন, হয়ে গেছে। নগদ পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কিনে এনে বিক্রি হবে না, এ-দুঃখ কি সওয়া যায়? অন্তত মেরিচাচীর জন্যে এটা রীতিমত মনঃকষ্টের ব্যাপার।

'কর বাবা, কাজে লেগে যা, ঠিক করে ফেল,' খুশি হয়ে বললেন তিনি। 'তোকে আজ স্পেশাল লাঞ্চ খাওয়াব।'

'বেশি করে রেঁধো, চাচী। নইলে মুসা এসে শুনলে হার্টফেল করবে।'

হেসে চলে গেলেন চাচী।

এসব কাজে সারাদিন কেন সারা বছর ব্যয় করতেও কোন আপত্তি নেই কিশোরের, অকেজো যন্ত্রপাতি মেরামত করে আবার চালু করার মধ্যে দারুণ আনন্দ আছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জংধরা সমস্ত স্ক্রু খুলে মেশিনটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল কিশোর, মোটরটা আলগা করে ফেলল। বেজায় ভারি, ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর তুলতে বেশ কসরত করতে হলো। যতখানি আশঙ্কা করছিল, তত খারাপ অবস্থায় নেই। অনেক পুরানো মডেল, তিরিশ বছরের কম হবে না। তবে জিনিস বানাত বটে তখন, যত্ন করে ব্যবহার করলে একজনের সারা জীবন চলে যাবে একটাতেই। এখনকার মত এত কমার্শিয়াল ছিল না প্রস্তুতকারকরা।

একটা ড্রাইভিং বেল্ট দরকার, ভাবল কিশোর, বানিয়ে নিতে হবে। ওয়ার্কশপের জঞ্জালের স্তূপ খুঁজতে শুরু করল সে, শক্ত রবার দরকার। একই সঙ্গে ভাবনা চলছে, মেশিনটার কথা নয়, ভাবছে তাদের নতুন কেসের কথা। আগামীকাল সকালে টিনহার সঙ্গে দেখা করার কথা তিন গোয়েন্দার, সৈকতের এক জায়গায় একটা খাঁড়ির কাছে, টিনহার মেকসিকান বন্ধুদের সাহায্যে রোভারকে নিয়ে যাওয়া হবে ওখানে। তিন গোয়েন্দা আর রোভারকে নিয়ে ডুবন্ত বোটটা খুঁজতে যাবে টিনহা।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল কিশোর। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে ঝোলানো লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে, তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা কিশোরই করেছে।

রবার খোঁজা বাদ দিয়ে এক টানে সরিয়ে ফেলল দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত। হামাগুড়ি দিয়ে আধ মিনিটেই পৌঁছে গেল অফিসে। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।

'হাল্লো,' হাঁপাচ্ছে, 'কিশোর পাশা।'

'হালো, কিশোর,' পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'তিমিটার খোঁজ পেয়েছ?' খোঁজকে বলল খোঁ-ওজ।

'ফোন করছেন, ভালই হয়েছে, স্যার,' কিশোর বলল। 'অনেক এগিয়েছি আমরা। আশা করি, কাল সকাল সাতটা নাগাদ রোভারকে ছেড়ে দিতে পারব সাগরে!'

দীর্ঘ নীরবতা।

'হালো?' জোরে বলল কিশোর। 'হালো?'

'হালো, ভাল সংবাদ,' জবাব এল। 'খুব ভাল।'

'থ্যাংক ইউ।'

'ও হ্যাঁ, একশো ডলার পুরস্কার দেব বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ,বলেছিলেন। নাম-ঠিকানা যদি দেন, বিল পাঠিয়ে দেব। তিমিটা যে সাগরে ছাড়ছি, তার একটা ফটোগ্রাফও দেব। কাজ করেছি, তার প্রমাণ।'

'আরে না না, তার দরকার নেই। তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আসলে, আগামী কিছু দিন শহরের বাইরে থাকব আমি, আজ বিকেলেই যদি দেখা করো, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি। কারও পাওনা আটকে রাখা পছন্দ না আমার।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' বলল বটে, কিন্তু সন্দেহ জাগল কিশোরের, টাকা দেয়ার জন্যে এত আগ্রহ কেন? নাম ঠিকানাই বা জানাতে চায় না কেন? আর তিন গোয়েন্দাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের, মুখের কথায়ই টাকা দিয়ে দেয়? 'কোথায় দেখা করব আপনার সঙ্গে, স্যার?'

'বারব্যাংক পার্ক চেনো?'

চেনে কিশোর। অনেক বছর আগে একটা জনপ্রিয় জায়গা ছিল। পার্কের মাঝখানে পুরানো একটা ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড আছে, এককালে নামকরা বাজিয়েরা বাজনা বাজাত সেই মঞ্চে উঠে, চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকে শুনত। আস্তে আস্তে সরে চলে এল রকি বীচ শহর, এলাকা ছেড়ে চলে এল লোকে। পার্কটা এখনও আছে ওখানে কিন্তু কদর নেই, অযত্নে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ঢেকে দিয়েছে ফুলের বাগান, পথ। আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল এখন ওখানে। রাতের বেলা আর ওদিক মাড়ায় না এখন কেউ।

'সন্ধ্যা আটটায় আসবে ওখানে,' বলল লোকটা। 'তোমার বন্ধুদের আনার দরকার নেই। তুমি একলা। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে অপেক্ষা করব আমি।' ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড উচ্চারণ করল বেই-অ্যাণ্ড স্টেই-অ্যাণ্ড।

'স্যার...' আর কোন ভাল জায়গায় দেখা করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে দিয়ে ডেস্কের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। একা যেতে বলল কেন লোকটা? আর এমন বাজে একটা জায়গায় কেন? সন্দেহ গাঢ় হলো তার। আবার রিসিভার তুলে মুসা আর রবিনকে ফোন করল, জানাল সব। তারপর ফিরে এল ওয়ার্কশপে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ মোটর ঠিক হয়ে গেল। নতুন স্ক্রু দিয়ে জায়গামত জুড়ে দিল সেটা। মেরিচাচীকে ডেকে এনে উদ্বোধন করল মেরামত করা যন্ত্রের। সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'সুইচ টেপো, চাচী।'

গোঁ-ওঁওঁ করে স্টার্ট নিল মোটর, আস্তে আস্তে শব্দ বাড়তে লাগল, শেষে গর্জে উঠল ভীষণ ভাবে। এত জোরে কাঁপতে লাগল, মনে হচ্ছে ভূমিকম্পে কাঁপছে। যা-ই হোক, চালু তো হয়েছে, মেরিচাচী এতেই খুশি। তাঁর মতে 'এই ভয়ঙ্কর' জিনিস নেয়ার মত হাড়কিপটে লোকও পাওয়া যাবে এ শহরে।

'তুই সত্যি একটা ভাল ছেলে, কিশোর,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মেরিচাচী। 'তোর মত ছেলে আর একটাও নেই দুনিয়ায় (সব সময়ই মেরিচাচীর এই ধারণা, কিন্তু বলেন না। আজ এতই খুশি হয়েছেন, চেপে রাখতে পারলেন না আর)। কাজ অনেক হয়েছে। চল, হাতমুখ ধুয়ে খাবি।' হাত ধরে কিশোরকে নিয়ে চললেন

চাচী।

প্রায় ডিনারের সময় লাঞ্চ খেতে বসল কিশোর। ভরপেট খাওয়ার পর বেশ বড় সাইজের একটা আইসক্রীম শেষ করল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল ইয়ার্ড থেকে।

পড়ন্ত আলোয় বেশ বড় জঙ্গল মনে হচ্ছে বারব্যাংক পার্ককে। কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল কিশোর। পকেট থেকে সাদা চক বের করে পথের ওপর বড় একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।

তিন গোয়েন্দার তিনজনেই পকেটে চক রাখে, একেকজন একেক রঙের। কিশোর রাখে সাদা, রবিন সবুজ, মুসা নীল। কোন কেসের তদন্তের সময় কেউ কোন বিপদে পড়লে অনেক কাজে লাগে এই চক আর আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।

পার্কে ঢোকার পথের সন্ধান পাওয়া গেল। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না, তবে দু-ধারে স্ট্রীট লাইট দেখে অনুমান করে নিল, পথটা কোথায় থাকতে পারে। কাছে এসে দেখল, দুপাশ থেকে এসে পথের প্রায় পুরোটাই ঢেকে দিয়েছে আগাছা আর লতা ঝোপ, মাঝখানের সরু একটুখানি শুধু বাকি। এগিয়ে চলল সে। খানিক পর পরই একটা করে আশ্চর্যবোধক এঁকে দিচ্ছে গাছের গায়ে, কিংবা ভাঙা কোন বেঞ্চিতে।

কল্পনা-বিলাসী নয় কিশোর। বাস্তবতার বাইরে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। ঝোপকে ঝোপই মনে করে, লুকানোর খুব ভাল জায়গা, বিষাক্ত সাপখোপ থাকতে পারে ভেতরে, তবে ভূত থাকে না।

কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন, হোক না সেটা কিশোর পাশার। নির্জন জংলা পার্কের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অকারণেই গা ছম ছম করে উঠল তার। মনে হলো, আশেপাশের সব কিছুই যেন জীবন্ত, নড়ছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। গাছের বাঁকা ডালগুলো যেন কোন জীবের পঙ্গু হাত-পা। ছোট ছোট শাখাগুলো আঙুল, তাকে আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে, ধরতে পারলেই টেনে নিয়ে গিয়ে ভরবে অন্ধকার জঠরে।

অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সামনে মঞ্চটা দেখতে পেল কিশোর। ছাউনি ধসে পড়েছে, চারপাশে আগাছার জঙ্গল, আর কিছুদিন পর একেবারে ঢেকে যাবে। তখন মনে হবে ঘাসের একটা উঁচু ঢিপি।

মঞ্চের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ভাঙা একটা কাঠের বোর্ডে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।

'কিশোর পাশা।'

এতই চমকে উঠল কিশোর, ঘুরতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ফেলে দিয়েছিল সাইকেলটা। চারপাশের বিষণ্ন অন্ধকারে লোকটাকে খুঁজল তার চোখ, কিন্তু দেখা গেল না।

'কে?' কোনমতে বলল।

খসখস শব্দ শোনা গেল। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। গজখানেকের মধ্যে আসার পর একটা মানুষের অবয়ব চোখে পড়ল কিশোরের।

খুব লম্বা, মাথায় হ্যাটের কিনারা নিচু হয়ে নেমে এসেছে কানের ওপর। চোখ দেখা যাচ্ছে না, চেহারাও বোঝা যাচ্ছে না, নাক মুখ কিছুই যেন নেই, লেপটানো।

অদ্ভুত।

লোকটা বিশালদেহী। গায়ে উইণ্ডব্রেকার, কাঁধ এত চওড়া, আর এত মোটা বাহু, কিশোরের মনে হলো একটা গরিলা, মানুষ নয়।

'এগোও, কিশোর,' বলল লোকটা। 'যা নিতে এসেছ নিয়ে যাও।' কথাবার্তাও জানি কেমন।

আগে বাড়ল কিশোর।

চোখের পলকে তার কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে লাটুর মত ঘুরিয়ে ফেলল লোকটা। ঘাড় চেপে ধরল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে লোকটার বাহু খামচে ধরে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। নরম পাঁউরুটির ভেতরে দেবে গেল যেন তার আঙুল।

ছটফট শুরু করল কিশোর, ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাল। লোকটার আরেক হাত গলা চেপে ধরল তার। হাতের আঙুলগুলো হাড্ডিসর্বস্ব। অবাক কাণ্ড! এত মোটা লোকের এই আঙুল!

পুরো অসহায় হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

'যা করতে বলব, ঠিক তাই করবে,' বলল আগন্তুক।

মাথা নুইয়ে 'আচ্ছা' বলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। হ্যামারলকে আটকে ফেলা হয়েছে তাকে।

'যদি না করো,' কানের কাছে গোঙাল লোকটা, 'যা বলব যদি না করো, ঘাড় মটকে দেব।' ঘাড় মটকের উচ্চারণ মনে হলো অনেকটা ঘাড়ম-টকে।

দশ

যা যা করতে বলা হলো, ঠিক তাই করল কিশোর।

মঞ্চের কাছ থেকে হেঁটে চলল, যে পথে এসেছে, সেটা নয়, অন্য পথে। আরেকটা গাছের গায়ে আশ্চর্যবোধক আঁকার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু পকেট থেকে চক বের করার সুযোগ নেই। অন্য কায়দায় ধরেছে এখন তাকে লোকটা, ডান হাত মুচড়ে নিয়ে এসেছে পিঠের ওপর, একেবারে শোল্ডার ব্লেডের কাছাকাছি। ব্যথা পাচ্ছে কিশোর।

পার্কের বাইরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো ঝরঝরে লিমোসিন। কিশোরকে গাড়িটার কাছে নিয়ে এল লোকটা। হাত মুচড়ে ধরে রেখেই আরেক হাতে পকেট থেকে চাবি বের করে বুটের তালা খুলল।

'ঢোকো,' আদেশ দিল লোকটা।

পথের শেষ মাথার দিকে তাকাল কিশোর। কেউ নেই। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে লাভ হবে না।

হাতে সামান্য ঢিল পড়ল। টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর, লোকটাও অবশ্য ছেড়ে দিল। বিশাল, তুলতুলে নরম বুকের চাপ রেখেছে কিশোরের পিঠে, হাত মুক্ত হলেও পালাতে পারবে না কিশোর। পেট আর বুক দিয়ে ঠেলছে লোকটা,

তাকে বুটে ঢোকার জন্যে। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে ভেতরে পড়বে কিশোর।

'আঁউ,' করে হাত-পা ছেড়ে দিল কিশোর, যেন সহসা জ্ঞান হারিয়েছে। পড়ে গেল পথের ওপর, মুখ গুঁজে রইল। পড়ার সময়ই চক বের করে ফেলেছে, ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে গাড়ির তলায়। পথের ওপর একটা আশ্চর্যবোধক এঁকে ফেলল।

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল লোকটা, ভাবছে কি করবে। ছেলেটা হঠাৎ এভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়বে, আশা করেনি।

কিশোরের ঝাঁকড়া চুল ধরে টেনে তুলল সে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল বুটের মধ্যে। দড়াম করে নামিয়ে দিল ডালা।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

বুটের ভেতরে ঘন অন্ধকার, অপরিসর জায়গা, তার ওপর পোড়া মোটর অয়েল আর পেট্রলের তীব্র গন্ধ, পাক দিয়ে ওঠে নাড়ীভুঁড়ি। পোড়া গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে, তেল খাওয়ার রাক্ষস গাড়িটা। গ্যালনে দশ মাইল যায় কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত গাড়িতে আলাদা পেট্রল ক্যান রাখে লোকে।

অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। কোমরের বেল্ট থেকে আট-ফলার প্রিয় ছুরিটা খুলে একটা বাঁকা ফলা দিয়ে খোঁচাতে লাগল ক্যানের গায়ে। ছোট একটা ছিদ্র করে ফেলল।

পুরানো গাড়ি, বুটের ভেতরটা আরও পুরানো। মেঝেতে মরচে, রঙ করার তাগিদ নেই মালিকের। কিশোরের জন্যে সহজই হয়ে গেল। ছুরির আরেকটা ফলা ব্যবহার করে মেঝেতেও আরেকটা গর্ত করে ফেলল সে।

ক্যানের ছিদ্রটা অনুমানে রাখল মেঝের গর্তের ওপর। অল্প অল্প করে তেল ঝরতে লাগল রাস্তার ওপর, ক্যানের মুখ দিয়ে ঢাললে হড়হড় করে অনেক বেশি পড়ে যেত, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত তেল, তাই ছিদ্র করে নিয়েছে। যাক, একটা চিহ্ন রেখে যেতে পারছে। রাস্তায় পড়ে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু আবছা একটা চিহ্ন থেকে যাবেই।

আস্তে চলছে গাড়ি, জোরে চলার ক্ষমতাই নেই বোধহয় এঞ্জিনের। খুব বেশি দূর গেল না। ক্যানটা মাত্র অর্ধেক খালি হয়েছে। বেশ জোরেশোরে একটা দোল দিয়ে থেমে দাঁড়াল আদ্যিকালের লিমোসিন।

বুটের ডালা উঠল আবার। চুল খামচে ধরে টান দিল লোকটা। 'বেরোও।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কিশোর। কেউ তার চুল টানুক, মোটেও পছন্দ করে না সে।

টলমল পায়ে খাড়া হলো কিশোর। যেন এই মাত্র হুঁশ ফিরেছে। ভাঙাচোরা একটা কাঠের বাড়ির ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। চুল ছাড়েনি লোকটা, আবার যদি বেহুঁশ হয়ে যায় কিশোর, এই আশঙ্কায় বোধহয়। টেনে, ঠেলে-ধাক্কিয়ে তাকে নিয়ে এসে তোলা হলো বাড়ির বারান্দায়। ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাল জীর্ণ বারান্দা। কিশোরের ভয় হলো, ভেঙে না পড়ে।

চাবি বের করে দরজা খুলল লোকটা। 'ঢোকো।' চুল ধরে জোরে ঠেলে দিল কিশোরকে ঘরের ভেতর।

অন্ধকারে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। সুইচ টেপার খুট শব্দ, আলো জ্বলল।

প্রথমেই লোকটার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। কেন তার চেহারা লেপটানো মনে হয়েছে বোঝা গেল। কাল একটা মোজা টেনে দিয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। গোটা তিনেক ফুটো, দুটো চোখের কাছে, একটা নাকের কাছে।

আলোয় আরও বিশাল মনে হচ্ছে লোকটাকে। কিন্তু এত নরম কেন শরীর? চামড়ার নিচে খালি চর্বি, মাংস নেই?

ঘরের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর, কি আছে না আছে দেখে নিল। কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটা পুরানো টেবিল—ঠেলা দিলেই হয়তো বুড়ো মানুষের দাঁতের মত নড়ে উঠবে, তাতে একটা টেলিফোন, জানালায় মলিন পর্দা। নোংরা দেয়াল। লোকটা বোধহয় থাকে না এখানে।

'ওদিকে,' হাত তুলে আরেকটা দরজা দেখাল দৈত্য।

কিশোরকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে এল সে, এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল পাল্লা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

আবার অন্ধকারে এসে পড়েছে কিশোর। হাতড়ে হাতড়ে আবিষ্কার করল, ছোট্ট একটা ঘরে ঢোকানো হয়েছে তাকে, চিলেকোঠার চেয়ে ছোট।

'হাল্লো,' বাইরের ঘরে দৈত্যটার গলা শোনা গেল, টেলিফোনে কথা বলছে। 'মিস টিনহা শ্যাটানোগা আছে?'

দরজায় কান পেতে দাঁড়াল কিশোর।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল, 'মিস শ্যাটানোগা, আপনার বন্ধু কিশোর পাশা এখন আমার এখানে বন্দি।' বন্দিকে বলল 'বঅন্দি'।

নীরবতা।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন , 'মিস, কিডন্যাপ করেছি আমি।'

কিডন্যাপকে বলল কিডনে-আপ।

আবার নীরবতা।

'না, টাকা চাই না। শর্ত একটাই, তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিতে হবে, এখুনি। আর আপনার বাবার বোট খোঁজা চলবে না।'

দীর্ঘ নীরবতা।

'তাহলে আপনার কিশোর বন্ধুকে আর দেখবেন না, মানে জ্যান্ত দেখবেন না।'

রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ হলো।

রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছে তিন গোয়েন্দা। বিপদে পড়েছে। উদ্ধারও পেয়েছে কোন না কোনভাবে। এবারে কি ঘটবে জানে না কিশোর। তবে টিনহা দৈত্যটার কথা না শুনলে সে যে কিশোরকে খুন করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মিথ্যে হুমকি দেয়নি লোকটা, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেছে।

আলোচনার সময় সেদিন মুসা আর রবিনকে বলেছিল কিশোর, তিনটে লোককে সন্দেহ করে সে। দুজনের নাম বলেছে, আরেকজনের বলেনি। তৃতীয় লোকটা সেই রহস্যময় ব্যক্তি, যে ফোন করে তিমিটাকে ছেড়ে দিতে বলেছে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই দৈত্যটাই সেই লোক।

লোকটা চায় না ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট উদ্ধার হোক। সেজন্য দরকার হলে মানুষ খুন করতেও পিছপা হবে না। এক বার তো করেই ফেলেছিল প্রায়, টিনহার পিকআপের ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে।

আট ফলার ছুরি খুলে নিল আবার কিশোর। তালা খোলার চেষ্টা করবে।

লোকটা দৈত্য, কিন্তু সেই তুলনায় স্বাস্থ্য ভাল না, পেশী বহুলনয়। হয়তো···হয়তো আচমকা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া যাবে আশা করল কিশোর, তারপর দেবে ঝেড়ে দৌড়। কিন্তু আগে তালা খুলতে হবে।

ছুরির একটা সরু ফলা তালার ভেতরে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে চাড় দিল কিশোর, খুঁচিয়ে চলল নীরবে।

বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মচমচ করছে কাঠের মেঝে। ফলে তালা খোলার চেষ্টায় অতি সামান্য শব্দ যা হচ্ছে, সেটা ঢেকে যাচ্ছে।

হঠাৎ, আর সাবধানতার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। মড়াৎ করে ভাঙল কি যেন পাশের ঘরে। কাঠের কিছু ভেঙেছে। কি ব্যাপার? লোকটা মেঝে ভেঙে নিচে পড়ে গেল নাকি?

তালা খুলে গেল। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল কিশোর। সে-ও ঢুকল বড় ঘরে, আর অমনি ঝটকা দিয়ে প্রায় ভেঙে খুলে ছিটকে পড়ল বাইরের দরজা।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ মিটমিট করছে কিশোর। আবছা দেখল, খোলা দরজা দিয়ে উড়ে এসে পড়ল একজন মানুষ।

ডাইভ দিয়ে মোটা লোকটার গায়ে এসে পড়ল মুসা, তাকে নিয়ে ধড়াম করে পড়ল কাঠের মেঝেতে। সারা বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। মুসার পেছনে ছুটে ঢুকল রবিন।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও অনেকবার পড়েছে, জানা আছে কি করতে হয়। এক সঙ্গে রইল না ওরা। তিনজন তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছুটল। ধরা পড়লে একজন পড়বে। পেছনে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোঁচ শুনে একবার ফিরে তাকাল কিশোর। নড়বড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে দৈত্যটা। এলোমেলো পদক্ষেপ। টলছে। পেটে মুসার আফ্রিকান খুলির জুতসই একখান গুঁতো খেয়েছে, সুস্থির হতে সময় লাগবে।

'ওই যে তোমার সাইকেল,' ছুটতে ছুটতেই হাত তুলে কিশোরের সাইকেল দেখাল রবিন। তার আর মুসারটাও রয়েছে ওখানেই।

টান দিয়ে যার যার সাইকেল তুলে নিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসল ওরা। শাঁই শাঁই করে প্যাডাল ঘোরাল। দৈত্যটা আসছে কিনা দেখারও সময় নেই, প্রাণপণে ছুটে চলল অন্ধকার পথ ধরে।

এগারো

'প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম,' বলল রবিন। 'তোমার সাইকেলটা দেখলাম মঞ্চের গায়ে ঠেকা দেয়া। চকের চিহ্ন দেখে ঢুকেছি, কিন্তু কোন পথে বেরিয়েছ, তার কোন চিহ্ন নেই।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'যাওয়ার আগে বুদ্ধি করে তোমাদের জানিয়ে ভালই করেছি, বেঁচে গেছি, নইলে যা বিপদে পড়েছিলাম।'

কথা হচ্ছে পরদিন সকালে। ছোট খাঁড়িটার কাছে এসে বসে আছে ওরা। পরনে সাঁতারের পোশাক।

আগের দিন রাতে বাড়ি ফিরেই টিনহাকে ফোন করেছে কিশোর, জানিয়েছে সে ভাল আছে। বোট খুঁজতে যাওয়ায় আর কোন অসুবিধে নেই।

'রবিন বুঝতে পেরেছে আগে,' কিশোরকে জানাল মুসা। 'পথে তেলের দাগ দেখতে পেলাম। কাছেই চকের দাগ। রবিন অনুমান করল, পুরানো একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ওখানে, এঞ্জিন থেকে তেল ঝরে।'

'তা বুঝেছি,' রবিন বলল, 'কিন্তু একশো গজ দূরে আরেকটা তেলের দাগ আবিষ্কার করেছে মুসাই। ওটা না দেখলে তোমাকে খুঁজে পেতাম না। দাগ ধরে এগিয়ে গেলাম। দেখি, ভাঙা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ঝরঝরে একটা লিমোসিন।'

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। একটা ট্রাক, কাঁচা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে, এদিকেই। ট্রাকের পেছনে ফোম-রবারে আবৃত রোভার। ওর চোখ বন্ধ, ভাব দেখে মনে হচ্ছে বেশ আরামেই আছে।

সৈকতের সরু চিলতেটুকু পেরিয়ে পানির কিনারে নেমে গেল ট্রাক। পেছনের চাকার অ্যাকসেল এখন পানির নিচে। খাঁড়ির এই ধারটা বেছে নিয়েছে টিনহা, তার কারণ জায়গাটা খুব ঢালু। কিনার থেকে কয়েক গজ দূরেই পানি এত বেশি গভীর, সহজেই সাঁতরাতে পারবে রোভার।

ট্রাক থেকে নামল টিনহা আর তার মেকসিকান বন্ধু। টিনহার পরনে সাঁতারের পোশাক, গলায় ঝুলছে স্কুবা গগলস। ঘুরে ট্রাকের পেছনে চলে এল সে, পানিতে দাঁড়িয়ে আলতো চাপড় মেরে আদর করল রোভারকে।

মস্ত বড় ট্রাক, ক্রেনও আছে। হাত তুলে মুসাকে ডাকল টিনহা। কাছে গিয়ে দেখল মুসা, বেশ চওড়া একটা ক্যানভাসের বেল্ট আটকে দেয়া হয়েছে রোভারের শরীরের মাঝামাঝি এমন জায়গায়, যাতে ওটা ধরে ঝোলালে দুদিকের ভারসাম্য বজায় থাকে।

মুসাকে সাহায্য করতে বলল টিনহা।

মুসা আর মেকসিকান লোকটা মিলে ক্রেনের হুক ঢুকিয়ে দিল ক্যানভাসের বেল্টের মধ্যে, রোভারের পিঠের কাছে। এঞ্জিন চালু করে টান দিতেই শূন্যে উঠে গেল রোভার। তার মাথায় আরেকবার চাপড় দিয়ে ভয় পেতে নিষেধ করল টিনহা।

সামান্যতম উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না তিমিটাকে। চোখ মেলে দেখছে লেজ নাড়ছে। কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। তিন কিশোর মিলে ঠেলে ঝুলন্ত তিমিটাকে নিয়ে গেল বেশি পানির ওপর। চেঁচিয়ে নামানোর নির্দেশ দিল টিনহা ক্রেন ড্রাইভারকে।

আস্তে করে পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো রোভারকে। বেল্ট খুলে দিল মুসা। সাঁতরাতে শুরু করল তিমি, আবার নিজের জগতে, স্বাধীন খোলা দুনিয়ার ফিরে এসেছে। এক ছুটে চলে গেল কয়েক গজ দূরে।

'রোভার, রোভার, দাঁড়াও,' ডাকল টিনহা।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রোভার। শরীর বাঁকিয়ে ঘুরে গেল মুহূর্তে, ছুটে এল, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা টিনহার গায়ে মুখ ঘষল। মাথায় চাপড় মেরে ওকে আদর করল টিনহা।

'ও-কে,' মেকসিকান বন্ধুকে বলল টিনহা, 'মুচাস গ্রেশাস।'

হেসে গিয়ে ট্রাকে উঠল মেকসিকান। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'বুয়েনা সুয়েরটি,' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল সে।

'রেডি?' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল টিনহা। সাগরের দিকে চেয়ে দেখল, একশো গজ দূরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে উলফের কেবিন ক্রুজার। 'কিশোর, টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে নাও। রোভার আমার কাছছাড়া হবে না, জানি, তবু যন্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল। বলা তো যায় না।'

'আমি বলি কি,' পানিতে টিনহার পাশে চলে এল কিশোর।

'কি?'

ভেবে দেখলাম, রেকর্ডারটা নিয়ে রবিনের এখানে থাকা উচিত।'

'কেন?'

কেন, সেটা বলল কিশোর। 'উলফকে বিশ্বাস কি? একাই হয়তো মেকসিকো উপকূলে গিয়ে ক্যালকুলেটরের চালান দিয়ে আসতে পারবে, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার দরকার পড়বে না। সেক্ষেত্রে আপনার শেয়ার মারা যেতে পারে। রবিন থাকুক এখানে।'

'তাতে কি লাভ?'

খুলে বলল কিশোর।

মন দিয়ে শুনল টিনহা। তারপর বলল, 'তারিখের ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'শিওর। মেকসিকান ইমিগ্রেশন অফিসে খোঁজ নিয়েছি। লাপাজ থেকেই বোট ছেড়েছিল।'

চুপচাপ ভাবল কিছুক্ষণ টিনহা। 'ওকে,' গগলসটা পরে নিল চোখে। 'রবিনকে ছাড়াই পারব আমরা। রোভার, এসো যাই।'

দ্রুত সাঁতরে চলল টিনহা। পাশে রোভার। পেছনে কিশোর, টিনহা আর তিমিটার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

সৈকতে এসে উঠল মুসা। একটা প্লাসটিকের ব্যাগে করে ছোট একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে কিশোর, খাঁড়ির কাছে ফেলে রেখে গেছে, ওটা ঝুলিয়ে নিল

কোমরে।

'এটা নিয়ে সাঁতরাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পারব,' বলল মুসা। 'যথেষ্ট ভারি, কিন্তু পানিতে নামলে ভার কমে যাবে।'

মুসাকে নেমে যেতে দেখল রবিন। গলা পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করেছে। পানি নিরোধক ব্যাগে রয়েছে ওয়াকি টকি, পানি ঢুকবে না। ভেতরে বাতাস রয়ে গেছে, ভেসে উঠেছে ব্যাগটা। সাঁতরাতে অসুবিধে হচ্ছে না মুসার, অল্পক্ষণেই ধরে ফেলল কিশোরকে।

পানির কিনার থেকে উঠে এল রবিন। আগের বাক্সটাতেই রয়েছে টেপরেকর্ডার, ওটা তুলে নিয়ে চলে এল তার সাইকেলের কাছে। পেছনের ক্যারিয়ারে পুটুলি করে রেখেছে তার সোয়েটার, ওটার ভেতর থেকে বের করল আরেকটা ওয়াকিটকি। অ্যানটেনা তুলে দিয়ে সুইচ টিপে অন করল যন্ত্রটা। শব্দ গ্রহণের জন্যে তৈরি।

শুকনো একটা জুতসই পাথর খুঁজে নিল রবিন, সোয়েটারটা তার ওপর বিছিয়ে আরাম করে বসল, ওয়াকি টকিটা রাখল কোলে। পাশে রাখল রেকর্ডারের বাক্স। উলফের বোটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে টিনহা আর রোভার, দেখা যাচ্ছে।

স্বাগত জানাল উলফ। টিনহাকে টেনে তোলার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

চাইলও না টিনহা। 'রোভার, থাকো এখানে,' বলে কাঠের নিচু রেলিঙ ধরে এক ঝটকায় উঠে পড়ল, স্বচ্ছন্দে।

টিনহার মত এত সহজে উঠতে পারল না কিশোর, বেগ পেতে হলো। পেছনে কয়েক গজ দূরে চুপ করে ভেসে রয়েছে মুসা।

'যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করব, মিস্টার উলফ?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো,' কিশোরকে ককপিটে নিয়ে এল উলফ। ছোট্ট ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখাল।

পরীক্ষা করে দেখল ওটা কিশোর, হুইলের ওপরে বাল্‌ক্ হেডের সঙ্গে আটকানো মনিটর স্ক্রীনটাও দেখল।

'পানির নিচে কাজ করবে ক্যামেরাটা? শিওর?' জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়। ওশন ওয়ারল্ড থেকে ধার নিয়েছে টিনহা। ওখানে প্রায় সারাক্ষণই কাজ চলে এটা দিয়ে,' সারাক্ষণকে উচ্চারণ করল সারা-কখ্খণ। 'আর কোন প্রশ্ন আছে?'

আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছে কিশোর, করেই যাবে একের পর এক, যতক্ষণ না মুসা কাজ সারে। জাহাজে উঠে কোমর থেকে প্লাসটিকের ব্যাগ খুলে জাহাজের পেছনের অংশে লুকাতে হবে, উলফকে না দেখিয়ে।

কিশোর ভাল অভিনেতা, তবে বোকার ভান করার মত এত ভাল কোন অভিনয় করতে পারে না। বোকা বোকা ভাব দেখিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি, পানির নিচ থেকে রেঞ্জ কতখানি দেবে? বোটের কত কাছে থাকা লাগবে রোভারের?'

'পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও স্পষ্ট ছবি আসবে,' চকচক করে বিরক্ত প্রকাশ

করছে যেন উলফের টাক। 'টিনহা তোমাকে এসব বলেনি?'

'হ্যাঁ, মনে হয় বলেছে। কিন্তু রোভারের মাথায় সার্চলাইট বেঁধে···' আর বলার দরকার নেই, থেমে গেল কিশোর। মুসা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনের ডেকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই ভেজা চুলে আঙুল চালাল—সংকেত ঃ নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাগটা।

'ও, হ্যাঁ, খুব শক্তিশালী লাইট তো, হবে মনে হয়,' আগের কথাটা শেষ করল কিশোর. হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে সব কিছু।

'চলো তাহলে, কাজ সারা যাক।' ডেকে বেরিয়ে এল উলফ।

রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রোভারের সঙ্গে কথা বলেছে টিনহা, তাকে বলল উলফ, 'আরেকটা ছেলে কোথায়? তিনজন ছিল না?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে,' পেছন থেকে চট করে জবাব দিল মুসা। 'খাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি। ভাবলাম···'

'থাকুক,' আউটবোর্ড মোটরের থ্রটলে গিয়ে হাত রেখে টিনহার দিকে ফিরল উলফ, 'কত জোরে সাঁতরাতে পারবে মাছটা?'

'ও মাছ নয়,' রেগে উঠল টিনহা। 'অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, বুদ্ধিমান, স্তন্যপায়ী প্রাণী।···হ্যাঁ, চাইলে ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে ছুটতে পারবে। কিন্তু আপনি বেশি জোরে চালাবেন না বোট। আট নটের নিচে রাখবেন। নইলে ও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাবে।'

'জো হুকুম,' থ্রটল ঠেলে দিয়ে হুইল ধরল উলফ। খোলা সাগরের দিকে বোটের নাক ঘোরাল।

টিনহা আগের জায়গায়ই রইল। খেলতে খেলতে বোটের সঙ্গে এগোচ্ছে রোভার, ওটার সঙ্গে কথা বলছে। তিমিটা কখনও শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে দূরে, পরক্ষণেই ডাইভ দিয়ে চলে আসছে আবার, ভুস্স করে মাথা তুলছে বোটের পাশে।

জরুরী একটা কথা জানার জন্যে উসখুস করছে কিশোর, কিন্তু সে বোকা সেজে রয়েছে, তার জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে না। আপাতত বোকা থাকারই ইচ্ছে। মুসার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল সে-কথা, কি জিজ্ঞেস করতে হবে শিখিয়ে দিল।

উলফের কাছে গিয়ে বলল মুসা, 'তীর থেকে কতদূরে পাওয়া গিয়েছিল আপনাদেরকে?'

'মাইল পাঁচেক,' সামনে সাগরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল উলফ। 'কোস্টগার্ডরা তাই বলেছে।'

মুসার দিকে চেয়ে নীরবে ঠোঁট নাড়ল কিশোর।

বুঝল মুসা। উলফকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ ছিলেন পানিতে?'

'এই ঘণ্টা দুয়েক।'

আবার ঠোঁট নাড়ল কিশোর।

মুসা বলল, 'জোয়ার ছিল, না ভাটা?'

'অন্ধকার হয়ে এসেছিল,' মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে উলফ। 'আর যা বড় বড় ঢেউ, ভালমত কিছু দেখারই উপায় ছিল না। তবে ঢেউয়ের মাথায় যখন উঠে যাচ্ছিলাম, তখন তীর চোখে পড়ছিল। চেষ্টা করেও তীরের কাছে যেতে পারছিলাম না। বোধহয় ভাটাই ছিল তখন।'

মনে মনে দ্রুত হিসেব শুরু করল কিশোর। ঝড়ের সময় উত্তর-পশ্চিম থেকে বইছিল হাওয়া, তীর বরাবর ঠেলে নেয়ার কথা দুজনকে। লাইফ-জ্যাকেট পরা ছিল, ওই অবস্থায় হাত পা নড়ানোই মুশকিল, নিশ্চয় সাঁতরে বিশেষ এগোতে পারেনি। তাছাড়া ঢেউয়ের জন্যে এগোচ্ছে না পিছাচ্ছে সেটাও ভাল মত দেখার উপায় ছিল না। বলছে, দু-ঘণ্টা ছিল পানিতে, ভাটা হলে ওই সময়ে অন্তত দু-মাইল সরে গেছে সাগরের দিকে। কোস্ট গার্ডরা পেয়েছে ওদেরকে পাঁচ মাইল দূরে, তারমানে তীর থেকে তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট।

মুসাকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল কিশোর। ফিসফিস করে জানাল।

ডেকে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করল মুসা, হিসেব করার ভান করল, তারপর আবার উলফের কাছে গিয়ে বলল, 'তীর থেকে মাইল তিনেক দূরে ডুবেছিল বোট, না?'

'জানলে কি করে?' মুসার দিকে তাকাল উলফ।

'আপনার কথা থেকে।'

'হুঁ, আমারও তাই ধারণা,' ঘড়ির দিকে চেয়ে কি হিসেব করল উলফ। এঞ্জিন নিউট্রাল করে নিল, মিনিটখানেক আপন গতিতে চলল বোট। 'এসে গেছি,' টিনহার দিকে ফিরে বলল সে। 'মাছটাকে লাগাম···' টিনহাকে কড়া চোখে চাইতে দেখে থেমে গেল। 'না, মানে স্তন্যপায়ী জীবটাকে পাঠানো যায় এবার। আমরা পৌঁছে গেছি।'

এক জায়গায় ভাসছে এখন বোট, মৃদু ঢেউয়ে দুলছে।

'রোভার, কাছে এসো, রোভার,' টিনহা ডাকল। ডেকে ফেলে রেখেছে ক্যানভাসের কলারটা, টেলিভিশন-ক্যামেরা আর সার্চলাইট ওতে বেঁধে রেখেছে আগেই। ওগুলো তুলে নিয়ে পানিতে নামল সে। তিমির মাথা গলিয়ে পরিয়ে দেবে ক্যানভাসের কলার, সামনের দুই পাখনার ঠিক পেছনে রেখে শক্ত করে বাকলেস আটকে দিলে হাজার ঝাঁকুনিতেও আর খুলে আসবে না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট, কিন্তু কোন জায়গা থেকে তিন মাইল? উলফের স্পষ্ট ধারণা নেই। এখানে দু-পাশের দশ মাইলের মধ্যে যে কোন জায়গায় ডুবে থাকতে পারে। এতবড় এলাকায় ছোট্ট একটা বোট খোঁজা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল, সেটা তিমিকে দিয়ে খোঁজালেও।

কলার পরিয়ে ডেকে ফিরে এল টিনহা। তার পাশে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার বাবা আর কিছু বলতে পেরেছেন? ঝড়ের সময়কার কথা?'

মাথা নাড়ল টিনহা। 'নাহ্ আর কিছু না। যা বলেছে, বলেছি তোমাকে।'

কি বলেছে, মনে আছে কিশোরের। দুটো পোলের ওপর নজর রাখতে বলেছে। কিছু একটা নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে। কি?

তিন মাইল দূরের তীরের দিকে তাকাল কিশোর।

তেমন কিছুই দেখার নেই। পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া, ওপাশে কি আছে কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু আরও উঁচু পর্বতের চূড়া ছাড়া। পাহাড়ের ওপর মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একআধটা নিঃসঙ্গ বাড়িঘর। টেলিভিশনের একটা রিলে টাওয়ার আছে, আরেক পাহাড়ের মাথায় একটা ফ্যাকটরি, অনেক উঁচু চিমনি।

'ওয়েট স্যুট পরে নাও, মুসা,' কানে এল টিনহার কথা। 'এয়ার ট্যাংকগুলো চেক করে নেয়া দরকার।'

পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার সময় এত জোরে টান মারছে, প্রায় থুঁতনির কাছে চলে আসছে ঠোঁট।

ক্যাপটেন শ্যাটানোগা অভিজ্ঞ নাবিক, ভাবছে কিশোর। বোট ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিশ্চয় কোন না কোন নিশানা রেখেছে। যদি খালি ভালমত কথা বলতে পারত···

টেলিভিশন টাওয়ার আর ফ্যাকটরির চিমনির ওপর দ্রুত বার দুই আসা যাওয়া করল কিশোরের দৃষ্টি। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

'দুই পোল!'

প্রায় ছুটে এসে উলফের বাহু খামচে ধরল কিশোর। বোকা সেজে থাকার সময় এখন নয়। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই পোল দুটো এক লাইনে আনুন।'

'কি? বোকার মত কি ড্যাড়ড্যাড় করছ?'

'বোট ডুবে যাওয়ার সময় লক্ষ রেখেছিলেন ক্যাপটেন শ্যাটানোগা। চিহ্ন রেখেছিলেন। ওই যে টেলিভিশন টাওয়ার, আর ওই যে চিমনি।'

'কী।'

'দেখতে পাচ্ছেন না?' কিশোরের মনে হলো এখন উলফই বোকার অভিনয় করছে। 'বোটটা পেতে চান? জাহাজ সরিয়ে নিন। ওই পোল দুটোর দিকে লক্ষ রেখে পিছান, এদিক ওদিক সরান, যতক্ষণ না জাহাজের সঙ্গে এক লাইনে আসে ও দুটো।'

বারো

বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। তিন মাইল দূরে তীরের দিকে নজর। জাহাজটা নড়ছে, টাওয়ার দুটোও সরছে। আরও একশো গজ—হিসেব করল সে, তারপরই এক লাইনে এসে যাবে দুটো।

হুইল ধরে রয়েছে উলফ।

'গতি কমান,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, এই গতি স্থির রাখুন।'

একে অন্যের দিকে সরছে টাওয়ার দুটো। সরছে···সরছে···হ্যাঁ মিশে গেছে। চিমনিটার ঠিক সামনাসামনি হয়েছে টেলিভিশন টাওয়ার। জাহাজের সঙ্গে এক লাইন।

'রাখুন,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'রাখুন এখানেই, নড়াবেন না।' চোখ থেকে

রাইনোকুলার সরাল সে।

পানি খুব গভীর, নোঙ্গর ফেলা গেল না। এঞ্জিন চালু রেখে স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক জায়গায় রাখতে হবে জাহাজটাকে, হুইল ধরে রাখতে হবে সারাক্ষণ।

তীরের দিকে জাহাজের নাক ঘোরাল উলফ। চকচকে টাকটা কয়েক মিনিট আগে ভোঁতা ভোঁতা লাগছিল, এখন মনে হলো কিশোরের, বেশ জ্বলজ্বল করছে। মুখের ভাব টাকের চামড়ায় প্রকাশ পায় নাকি? ফিরে গিয়ে এ-ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক করল সে। আর যা-ই হোক, সারেঙ হিসেবে উলফের জুড়ি কম, স্বীকার করতেই হলো তাকে। সেটা নিশ্চয় টাকের জন্যে নয়।

'ও-কে, মুসা, হয়েছে,' মুসার পিঠে এয়ার ট্যাংক বেঁধে দিয়ে বলল টিনহা।

মাস্ক পরে নিল মুসা, ব্রীদিং হোস আর এয়ার-প্রেশার গজ চেক করে দিল টিনহা। বাতাসের ট্যাংক 'ফুল' শো করছে গজের কাঁটা।

পায়ে ফ্লিপার, বিচিত্র একটা জন্তুর মত থপাস থপাস করে ডেক দিয়ে হেঁটে গেল মুসা টিনহার পেছনে। রেলিঙে উঠে বসল টিনহা, সাগরের দিকে পেছন করে, রেলিঙ ধরে আস্তে করে উল্টে গিয়ে আলগোছে ছেড়ে দিল হাত, ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

মুসা পড়ল টিনহার পর পর।

কয়েক ফুট নেমে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে শরীর সোজা করল মুসা, মাথা নিচু করে ভেসে রইল। মনে করার চেষ্টা করল ওস্তাদ কি কি শিখিয়েছেন। কি করতে হবে এখন।

মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, তাতে তোমার মাস্ক ধোঁয়াটে হবে না, পরিষ্কার দেখতে পাবে। এয়ার হোস চেক করা, হোসে গিঁটটিট লেগেছে কিনা, বাতাস রুদ্ধ হয়েছে কিনা শিওর হয়ে নাও। তোমার সুইম স্যুটের ভেতরটা নিশ্চয় ভেজা-ভেজা লাগছে, অপেক্ষা করো, সাগরের পানি আর তোমার দেহের তাপমাত্রা এক হয়ে নিক। এবার নামতে শুরু করো, মনে রাখবে, যত নিচে নামবে পানির তাপ ততই কমবে, চাপ বাড়বে। মাথা গুলিয়ে উঠছে টের পেলেই আর নামবে না, সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করবে, তবে আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করবে না।

তিন ফুট পানির নিচে অলস ভঙ্গিতে কয়েক মিনিট সাঁতরে বেড়াল মুসা, শরীরকে ঢিল হওয়ার সময় দিল, সইয়ে নিল এখানকার পানির সঙ্গে।

ডাইভিং খুব পছন্দ মুসার। দারুণ একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে, বাতাসে ভাসছে সে, পাখি যেভাবে ভাসে। আশ্চর্য এক স্বাধীনতাবোধ। দেখতে পাচ্ছে, কয়েক গজ দূরে তারই মত ভেসে রয়েছে টিনহা আর রোভার। হাত তুলে ইঙ্গিত করল মুসা, বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা লাগিয়ে গোল করে দেখাল, তারমানে ডাইভ দেয়ার জন্যে তৈরি।

রোভারের পিঠ চাপড়াল টিনহা। নিচের দিকে মুখ করে ডাইভ দিল রোভার, তার আগে আগে পানি ফুঁড়ে নেমে যাচ্ছে শক্তিশালী সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। নামছে···নামছে···নামছে···ওকে অনুসরণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে মুসার, এমনকি টিনহারও।

ককপিটে বসে দেখছে কিশোর, টেলিভিশন মনিটরের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। হুইলে হাত রেখে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে রয়েছে উলফও।

দেখতে দেখতে মনে হলো কিশোরের, পানির তলার দৃশ্য নয়, মহাকাশের বিচিত্র দৃশ্য দেখছে। তীব্র সাদা গোল একটা আলোর চক্র যেন মহাকাশের কালো অন্ধকারে ফুটে উঠেছে, তার মাঝে ফুটছে নানা রকম রঙ, আকৃতি। একবার মনে হলো, মেঘলা আকাশ দেখছে, তারপর এলোমেলো হয়ে ঝাপসা হয়ে গেল মেঘ, সরে গেল, লাফ দিয়ে এসে যেন সে জায়গা দখল করল এক ঝাঁক রঙিন মাছ। সরে গেল ওগুলোও।

রোভার বোট থেকে পাশে বেশি সরলে আবছা হয়ে আসে ছবি, তাড়াতাড়ি সেটুকু দূরত্ব আবার পূরণ করে নেয় উলফ বোট সরিয়ে নিয়ে। চিমনি আর টাওয়ারের সঙ্গে অদৃশ্য লাইন একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটছে এটা। ছবি আর আলো আবার স্পষ্ট হলেই জাহাজ স্থির করে ফেলছে সে. দক্ষ হাত, সন্দেহ নেই। কাজটা যথেষ্ট কঠিন।

রোভারের অনেক ওপরে থাকতেই থেমে গেল মুসা। আর নামার সাহস হলো না। তার জানা আছে, মানুষের দেহের ওপর পানির চাপ অসহ্য হয়ে উঠলে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জাগে, অনেকটা মাতলামির মত, তাল পায় না যেন শরীর। অতি-আত্মবিশ্বাসী হয়ে তখন উল্টোপাল্টা অনেক কিছু করে বসতে পারে সাঁতারু, নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের অজান্তেই।

সেই পর্যায়ে যেতে চাইল না মুসা। অনেক নিচে রোভারের সার্চলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছে। রোভারের ক্ষমতায় ঈর্ষা হলো তার। আফসোস করল, আহা তিমির মতই যদি মানুষের শরীরের গঠন হত, গভীর পানিতে সহজে নামতে পারত। তিমি ডাইভ দিয়ে এক মাইল গভীরেও নেমে যেতে পারে, ঘণ্টাখানেক সহজেই কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে ওই ভয়ঙ্কর গভীরতায় অকল্পনীয় পানির চাপের মধ্যে।

ব্রীদিং টিউবটা সোজা করার চেষ্টা করল মুসা। বাঁকা পাইপটার পুরোটায় আঙুল বোলাল, একেবারে এয়ার ট্যাংকের গোড়া পর্যন্ত।

অদ্ভুত তো! ভাবল সে। পাইপে কোনরকম গিঁট নেই, জট নেই, তার পরেও...

উদ্বিগ্ন হয়ে আবার হাত বোলাল পাইপে, কোথাও একটা জট আছেই আছে, থাকতেই হবে, নইলে বাতাস পাচ্ছে না কেন ফুসফুস? শ্বাস নিতে পারছে না।

কোমরের ওয়েট বেল্টের বাকলসে হাত দিল সে। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাল, দম বন্ধ রাখো। ভারি বেল্টটা খুলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাও ওপরে। আতঙ্কিত হয়ো না, গর্দভ কোথাকার! খোলো, খুলে ফেলো বেল্ট।

কিন্তু কথা শুনছে না আঙুল, অসাড় হয়ে গেছে। চোখেও কি গোলমাল হয়েছে। নইলে চারপাশের পানির রঙ বদলে যাচ্ছে কেন? হালকা গোলাপী থেকে লাল...তারপর গাঢ় লাল...গাঢ় হতে হতে এমন অবস্থা হলো, কালো মনে হচ্ছে

লকে…

বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে সে। লাথি দিয়ে পা থেকে খুলে ফেলতে চাইছে ফ্লিপার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে ওপরে…

উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের সামনে। বুকে চাপ দিতে শুরু করেছে ভারি শক্ত কিছু। বুলডোজারের মত শক্তিশালী কিছু একটা ঠেলে তুলছে যেন তাকে ওপরে।

বাধা দিল না মুসা, দেয়ার সামর্থ্যও নেই। শরীরের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ভারি জিনিসটাকে।

পানির ওপরে ভেসে উঠল মুসার মাথা। পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে একটানে তার মাস্ক খুলে নিল কেউ। হাঁ করে দম নিল সে, ফুসফুস পূর্ণ করে টানল বিশুদ্ধ বাতাস।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সরে গেল লাল অন্ধকার। নিচে তাকিয়ে আবছা একটা ঝিলিমিলি দেখতে পেল। ছবিটা স্পষ্ট হতে সময় নিল।

ক্যানভাসের কলারটা চিনতে পারল সে। একটা সার্চলাইট। একটা ক্যামেরা।

রোভারের পিঠে শুয়ে আছে মুসা।

পাশে ভাসছে টিনহা। সে-ই খুলে নিয়েছে মুসার মাস্ক। 'চুপ, কথা নয়। লম্বা লম্বা দম নাও। এক মিনিটেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তা-ই করল মুসা। রোভারের পিঠে গাল রেখে চুপচাপ শুয়ে রইল। সহজ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। হাঁপাচ্ছে না আর। সেই ভয়ঙ্কর লাল অন্ধকারের ছায়াও নেই, সরে গেছে পুরোপুরি। কথা বলার ক্ষমতা ফিরে এল।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করার আগে, কি হয়েছিল টিনহাকে জিজ্ঞেস করার আগে, আপনা-আপনিই একটা কথা বেরিয়ে এল অন্তর থেকে, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, রোভার।'

'তুমিও একদিন ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, মনে নেই?' রোভারের মাথায় হাত রাখল টিনহা। 'ও কিছু ভোলে না…'

পাশে চলে এসেছে বোট। হুইল ধরেছে কিশোর। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে উলফ।

'দেখেছি,' চেঁচিয়ে বলল সে, উত্তেজনায় জ্বলছে যেন টাক। 'মনিটরে দেখলাম, এক ঝলক। কিন্তু দেখেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্যাটানোগার বোট।' কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'ধরে রাখো, নড়বে না। ঠিক আমাদের নিচেই রয়েছে। রোভার ওপরে ওঠার সময় আলো পড়ল, তখনই দেখলাম বোটটা। তাহলে…'

'এখন পারব না,' কড়া গলায় বাধা দিল টিনহা। 'মুসাকে আগে ডেকের ওপর তুলি, দেখি কি হয়েছে, কি গোলমাল।'

'কিন্তু…' রেলিঙে থাবা মারল উলফ।

'পরে,' কণ্ঠস্বর বদলাল না টিনহা। 'যান, গিয়ে হুইল ধরুন, কিশোরকে পাঠিয়ে দিন, সাহায্য দরকার।'

দ্বিধা করল উলফ। কিন্তু জানে, এখন সব কিছু টিনহার হাতে। এ-মুহূর্তে ওকে

চটানো উচিত হবে না। ওর সাহায্য ছাড়া বোট থেকে মালগুলো উদ্ধার করতে পারবে না। গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকাল সে, গিয়ে কিশোরের হাত মুক্ত করল।

মুসাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর টিনহা। এখনও দুর্বল লাগছে, ডেকেই বসে পড়ল মুসা। এক মগ গরম কফি এনে দিল টিনহা। ইতিমধ্যে বেল্ট খুলে এয়ার ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির বোঝা মুসার পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়েছে কিশোর।

'ও-কে,' জিজ্ঞেস করল টিনহা, 'এবার বলো, কি হয়েছিল। গোলমালটা কি ছিল? পানির চাপ না, এত গভীরে নামোনি। কি?'

'দম নিতে পারছিলাম না,' মগে চুমুক দিল মুসা, কফি খুব ভাল বানানো হয়েছে। 'টিউব দিয়ে বাতাস আসছিল না। ভাবলাম জট লেগেছে। কিন্তু লাগেনি।'

তার কি কি অসুবিধে হয়েছিল, জানাল মুসা। কি ভাবে চোখের সামনে রঙ বদলে গিয়েছিল, লাল হতে হতে কালো হয়ে গিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল গলা।

'কারবন-ডাই-অকসাইড,' বলল টিনহা। 'কারবন-ডাই-অকসাইড টানছিলে।'

এয়ার ট্যাংকটা টেনে নিয়ে ভালভ খুলল সে, হিসহিসিয়ে চাপ চাপ বাতাস বেরোল না।

'এজন্যেই শ্বাস নিতে পারোনি, বাতাসই নেই ট্যাংকে।'

'কিন্তু নামার আগে চেক করেছি,' বলল মুসা।

প্রেসার গজটা পরীক্ষা করল কিশোর। কাঁটা এখনও 'ফুল' নির্দেশ করছে। দেখাল টিনহাকে। 'কেউ গজ জ্যাম করে দিয়েছে। তারপর ট্যাংক থেকে বাতাস বের করে দিয়েছে।

একমত হলো টিনহা। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

'যন্ত্রপাতিগুলো কোত্থেকে এনেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওশন ওয়ারল্ড। আমি নিজে এনে রেখেছি গতরাতে। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল তখন।' উলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিনহা। 'মুসার ট্যাংকে গোলমাল কে করেছে? আমি জানতে চাই...'

'আমি কি জানি?' রেগে গেল উলফ। যন্ত্রপাতি আমি নষ্ট করতে যাব কেন? আমি কি গাধা, জানি না, গণ্ডগোল করে দিলে বোটের মাল তুলতে অসুবিধে হবে? এই যে দেরিটা হচ্ছে, ক্ষতি কি আমার হচ্ছে না? আমি শুধু চাই...' কি চায়, উত্তেজিতভাবে দ্রুত বলে গেল সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেক শব্দ ভেঙে ফেলল, হাস্যকর করে তুলল কথাগুলো।

উলফের কথা বিশ্বাস করল কিশোর, সত্যি কথাই বলছে। মুসার ট্যাংক নষ্ট করে দিয়ে তাকে মেরে ফেললে উলফের কোন লাভ হবে না। জিজ্ঞেস করল, গতরাতে এই বোটে কেউ উঠেছিল? কিংবা আজ ভোরে?'

'না,' মাথা নাড়ল উলফ। 'ঘাটে বাঁধা ছিল। গতরাতে আমি বোটে ঘুমিয়েছি। টিনহা যাওয়ার পর একবারও নামিনি।'

'কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'না। শুধু আমার বন্ধু নীল বনেট। আমার সঙ্গে বসে হুইসকি খেয়েছে, কিন্তু

নীলকে আমি অবিশ্বাস করি না…'

'ওকে কতদিন থেকে চেনেন?' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ও কে? ওর সম্পর্কে কি কি জানেন?'

'প্রশ্ন। বোকার মত খালি প্রশ্ন,' বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল উলফ, টাকে খামচি মারল। 'এত কথা বলতে পারব না। যাও, গিয়ে বাক্সটা তোলো…'

'জবাব দিন,' কঠিন শোনাল টিনহার গলা, কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। 'যা যা জিজ্ঞেস করে, সব কথার জবাব দেবেন। নইলে ওই বোটের ধারেকাছে যাব না আমি।'

'ঠিক আছেহ্!' হাত নাড়ল উলফ, রাগ দমন করে বলল, 'কি জানতে চাও? নীলের সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?'

মাথা নোয়াল কিশোর।

'কয়েক বছর। ইউরোপে দেখা হয়েছিল। ওখানে দুজনে…' দ্বিধা করল উলফ। 'কিছু ব্যবসা করেছি একসঙ্গে। তারপর আবার দেখা হয়েছে মেকসিকোতে।'

'কবে?'

'কয়েকবারই হয়েছে…'

'শেষবার যখন গিয়েছিলেন, হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। লা পাজে ছোটখাট ছাপাখানার ব্যবসা করছে। পুরানো দোস্ত, মেকসিকো গেলেই ওর সঙ্গে দেখা না করে ফিরি না। তাতে দোষের কি?'

নীরব রইল কিশোর, ভাবছে।

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিশোর?' বলল টিনহা।

'না। আর কিছু না।'

'গুড,' টিনহার দিকে ফিরল উলফ। 'আবার কাজ শুরু করা যেতে পারে?'

'পারে। তবে আগে ভালমত আবার ট্যাংক-ফ্যাংকগুলো চেক করে নিই। মরতে চাই না।'

ডেকের ওপর নিজের যন্ত্রপাতিগুলো ফেলে রেখেছে টিনহা। গিয়ে ট্যাংকের ভালভ খুলল। এখান থেকেই বাতাসের হিসহিস শুনতে পেল কিশোর।

যে শয়তানী করেছে, সবগুলো যন্ত্র নষ্ট করার সময় পায়নি। কিংবা ইচ্ছে করেই করেনি। হয়তো ভেবেছে, মারাত্মক একটা দুর্ঘটনাই পুরো উদ্ধার কাজটা পর্যুদস্ত করে দেবে, ব্যর্থ করে দেবে।

টিনহার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'বাক্সটা উলফকে দেয়ার আগে ভেতরে কি আছে দেখতে চাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল টিনহা। 'ও-কে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'তাই হবে।'

'থ্যাংকস।' তার ওপর টিনহার বিশ্বাস দেখে খুশি হলো কিশোর। তবে বিশ্বাস না করলে ভুল করত, কারণ এখন প্রায় সব প্রশ্নের জবাবই কিশোরের জানা।

জাম হওয়া প্রেসার গজ। উলফের পুরানো বন্ধু, নীল বনেট। লা পাজে ট্রিপ। বনেটের চোখের নিচের দাগ, কুঁচকানো চামড়া। ছড়ানো ছিটানো প্রতিটি টুকরো প্রশ্নের উত্তরই খাপে খাপে জোড়া লেগে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মনে।

তেরো

'এত নিচে নামা সম্ভব না,' ককপিটে উলফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে টিনহা। 'ওই বোট পর্যন্ত যেতে পারব না।'

'তাহলে···?'

'যা বলছি, শুনুন। রোভারকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ফালতু একটা কথা বলবেন না। যা যা জিজ্ঞেস করব, বলবেন। সব ইনফরমেশন চাই। ও-কে?'

টিনহার চোখে চোখে চেয়ে রইল উলফ, লোকটার দৃষ্টিতে আগুন দেখতে পাচ্ছে কিশোর। 'আরও প্রশ্ন?···বেশ, কি জানতে চাও?'

'ঠিক কোন জায়গায়? ক্যালকুলেটর ভরা বাক্সটা আছে কোথায়?'

'হুঁ···' চোখ সরিয়ে নিল উলফ, টিনহার দিকে তাকাতে পারছে না। 'কেবিন। বাংকের তলায়!।'

'বাঁধা? আই মিন, কোন কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে?'

'না,' উসখুস করছে উলফ। 'ভেলা ভাসাতে চেয়েছিল তোমার বাবা। তাহলে বাক্সটা সঙ্গে নিতে পারতাম। কিন্তু সময়ই পেলাম না। তার আগেই তলিয়ে গেল বোট,' তিক্ত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'বাক্স আর নিতে পারলাম না, জান বাঁচানোই মুশকিল হয়ে উঠল।'

'কেবিনের দরজায় তালা আছে?'

'নাহ্। তুমি তো জানোই···'

মাথা ঝাঁকাল টিনহা। বোটটার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। দশ বছর বয়েস থেকেই ওই বোটে করে মাছ ধরতে গিয়েছে বাবার সঙ্গে। 'জানি দরজা খোলা রাখত বাবা, যাতে ইচ্ছে হলেই চট করে গিয়ে ঢুকতে পারে। বীয়ারের প্রচণ্ড নেশা তো, দেরি সইতে পারে না।

'হ্যাঁ,' টিনহার দিকে তাকাতে পারল আবার উলফ।

'বাক্সটা দেখতে কেমন?'

'সবুজ রঙের। ইস্পাতে তৈরি। দু-ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া, আর নয় ইঞ্চি পুরু।'

'হ্যানডেল আছে?'

'আছে।···বাক্সটা···ইয়ে, মানে, ক্যাশবক্সের মত দেখতে। ডালায় লাগানো হ্যাণ্ডেল।'

'হুঁ,' বাক্সটা কি করে বের করে আনবে ভাবছে টিনহা। 'দড়ি লাগবে। সরু, শক্ত দড়ি। আর একটা তারের কাপড় ঝোলানোর হ্যাঙ্গার।'

'যাচ্ছি,' বলল উলফ। 'কিশোর, হুইলটা ধরো তো।'

দড়ি আর হ্যাঙ্গার আনতে দেরি হলো না।

হ্যাঙ্গারটাকে বাঁকা করে চৌকোনা করে নিল টিনহা। বাঁকা হুকটা দাঁড়ানো রয়েছে একটা বাহুর ওপর। শক্ত নাইলনের দড়ির এক মাথা বাঁধল হ্যাঙ্গারের সঙ্গে।

'ও-কে, এবার যাওয়া যায়।'

মুসা এগিয়ে এল। 'আমি...' আর যেতে চায় না সে, যা ঘটে গেছে খানিক আগে, এরপর আজ আর পানিতে ডুব দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু একেবারেই কিছু না বললে ভাল দেখায় না, কিছু যদি মনে করে বসে টিনহা, তাই বলছে। 'আমিও যাব...'

হেসে তাকাল টিনহা। 'তুমি থাকো। দরকার হলে আসতে বলব।'

মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা, হাসল। সরাসরি না বলে দিতে পারত টিনহা, তা না বলে ঘুরিয়ে বলেছে। এতে ভার অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে মুসার। অঘটনটা ঘটার পর থেকেই নিজেকে দোষী ভাবছে, যদিও দোষটা মোটেই তার নয়।

দড়ির বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলাল টিনহা, মাস্ক ঠিক করল, তারপর নেমে গেল আবার সাগরে।

কয়েক গজ দূরে ঝিমোচ্ছিল রোভার, শব্দ শুনে চোখ মেলল। এগিয়ে এল টিনহার দিকে।

রোভারের পিঠে চাপড় দিল টিনহা, পুরো এক মিনিট তার গায়ে গাল ঠেকিয়ে রইল।

মুসা দেখছে। বুঝতে পারছে, তিমিটার সঙ্গে কথা বলছে টিনহা। কিন্তু কি বলছে, শোনা যাচ্ছে না।

পরে অনেক ভেবেছে মুসা। কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় আসেনি, কিভাবে কি করতে হবে, তিমিটাকে কি করে বুঝিয়েছে টিনহা। মানুষের মনের ঘোরপ্যাঁচ কি করে বুঝল একটা জন্তু!

মনিটরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

সাদা আলোর চক্র ফুটল পর্দায়, রোভারের মাথার লাইট জ্বেলে দিয়েছে টিনহা। তীব্র আলোয় পানিকে দেখাচ্ছে ধোঁয়াটে সাদা মেঘের মত। ফুটে উঠল এক ঝাঁক রঙিন মাছ চোখে ভয়, দ্রুত সরে গেল ওগুলো।

আবার দেখা গেল সাগরের তলদেশ। নুড়ি আর বালিময় গোল একটুকরো জায়গার পাশে একটা পাথর, শামুক ছেয়ে আছে।

কিশোরের পেছনে হুইলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে উলফ, তার চোখও পর্দার দিকে। উত্তেজনায় সোজা হয়ে গেছে সে, না চেয়েও টের পেল কিশোর।

বোটের সামনের দিকটা খুঁজে পেয়েছে ক্যামেরার চোখ।

'ওই যে,' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, বলে উঠল উত্তেজিত কণ্ঠে।

বড় হচ্ছে বোটের গলুই, ভরে দিচ্ছে আলোর চক্র। হঠাৎ সরে গেল, গাড়ির পাশ দিয়ে যেভাবে সরে যায় থাম কিংবা গাছ, সেভাবে। ডেক দেখা গেল, এক ঝলকের জন্যে হুইলটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, মেঘে ঢাকা পড়েছে সাদা চক্র। সরে গেল মেঘ, আগের চেয়ে উজ্জ্বল হলো আলো, স্পষ্ট হলো ছবি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ার, একটা পোর্টহোল।

সোজা কেবিনে ঢুকে পড়েছে রোভার।

কয়েক সেকেণ্ড পর্দায় এত তাড়াতাড়ি নানারকম আকৃতি ফুটল, ঝাঁকুনি খেলো

ছবি, কিছুই বোঝা গেল না। টানটান হয়ে গেছে উলফের স্নায়ু, উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে পেশী।

ছবির উন্মাদ নাচ ঝিমিয়ে এল এক সময়, স্থির হলো, স্পষ্ট হলো আবার। চেনা যাচ্ছে এখন। ধাতব বাক্সটা দেখা যাচ্ছে।

'ওটাই,' হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে উলফ, মনিটরের পর্দা থেকে ছোঁ মেরে তুলে আনবে যেন।

বড় হচ্ছে বাক্সটা···আরও···আরও বড়, ভরে দিল আলোর চক্র, বাক্সের খুব কাছে চলে গেছে ক্যামেরার চোখ।

ভীষণভাবে দুলে উঠল বাক্সটা আচমকা, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল। আর কিচ্ছু নেই পর্দায়, শুধু শূন্য গোল সাদা আলো।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। ক্যামেরায় কোন গণ্ডগোল হলো? তারপর বুঝল, না ক্যামেরা ঠিকই আছে, নইলে আলো আসত না, আসলে সাদা দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে যন্ত্রটার চোখ। নিশ্চয় বাংকের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে রোভার।

কিছুক্ষণ প্রায় অনড় হয়ে রইল সাদা আলো, তারপর আবার দুলে উঠল। নানারকম অস্পষ্ট ছবি ঝড় তুলল আবার পর্দায়। কিশোরের মনে হলো, আবছাভাবে দেখতে পেয়েছে বোটের তামার রেলিঙ।

আবার আলোর সামনে ফুটল পরিচিত ধোঁয়াটে মেঘ। উঠে আসছে রোভার।

'আস্ত একটা গর্দভ জানোয়ার!' গলা কাঁপছে উলফের, হুইল এত জোরে চেপে ধরেছে সাদা হয়ে গেছে আঙুল। 'বাক্সটা তোলার চেষ্টাই করল না।' রাগে ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল তীরের দিকে।

উলফের কথায় কান দিল না কিশোর। পলকের জন্যে পর্দায় একটা ব্যাপার দেখেছে, যা মিস করেছে লোকটা। ক্যামেরার চোখের সামনে অনেক বড় হয়ে ফুটেছিল একটা মানুষের হাত, নিশ্চয় টিনহার, সরে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। তার কয়েক মুহূর্ত পরই নিবে গেল গোল আলো। ক্যামেরা অফ করে দিয়েছে টিনহা।

'এই, হুইল ধরো,' মুসার বাহু ধরে টান দিল উলফ। 'সোজা রাখবে বোট, নড়ে না যেন।'

ছুটে ডেকে বেরোল উলফ, রেলিঙে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। তার পিছু নিল কিশোর, কিন্তু দাঁড়াল না, পাশ কাটিয়ে চলে এল বোটের পেছনে, লকারের কাছে। সাগরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বিশ গজ দূরে ভেসে উঠল টিনহার মাথা। কাঁধে দড়ির বাণ্ডিলটা নেই, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

টিনহার পাশে ভেসে উঠেছে রোভার। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল কিশোর, ক্যামেরা আর সার্চলাইট নেই, তার জায়গায় বাঁধা রয়েছে সবুজ ধাতব বাক্সটা।

লকার খুলে মুসার লুকিয়ে রাখা প্লাসটিকের ব্যাগটা বের করল কিশোর। এক টানে ব্যাগের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে বের করল একটা ওয়াকি-টকি। টেনে অ্যান্টেনা পুরো তুলে দিয়ে সুইচ অন করল।

যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে জরুরী কণ্ঠে বলল, 'রবিন, প্লে করো! রবিন, প্লে করো!'

ফিরে তাকাল উলফের দিকে। রেলিঙে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, আর সামান্য ঝুঁকলেই উল্টে পড়ে যাবে পানিতে, এদিকে নজরই নেই।

'নিয়ে এসো!' চেঁচিয়ে বলল উলফ। 'বাক্সটা নিয়ে এসো। এই মেয়ে, শুনছ?'

'রবিন, প্লে করো!' আবার বলল কিশোর। 'রোভারের গান প্লে করো! রবিন, প্লে করো! রোভারের গান প্লে করো!'

চোদ্দ

'শুনেছি, কিশোর! ওভার অ্যাণ্ড আউট!'

ওয়াকি টকির সুইচ অফ করে পাশের পাথরের ওপর রেখে দিল রবিন।

এখান থেকে উলফের বোট দেখা যাচ্ছে না। কতদূরে আছে, তা-ও বোঝার উপায় নেই। তবে তিমির শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, এটা জানা আছে, জেনেছে বই পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে তিমির কান চোখে পড়ে না, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, চোখের ঠিক পেছনে সুচের ফোঁড়ের মত অনেকগুলো ছিদ্র।

রেডিওর স্পীকারের সামনে যেমন তারের জাল বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তিমির কানও তেমনিভাবে ছিদ্রওয়ালা চামড়ায় ঢাকা। মানুষের কানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী কান। অসাধারণ আরেকটা ক্ষমতা আছে ওই কানের—সোনার সিসটেম, শব্দের প্রতিধ্বনি শুনেই বলে দিতে পারে, কি জিনিসে আঘাত খেয়েছে শব্দ, জিনিসটা কত বড় এবং কত দূরে আছে, একশো গজ দূর থেকেও সেটা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে তিমি। পানির নিচে একে অন্যের ডাক কয়েক মাইল দূর থেকেও শুনতে পায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করে সোয়েটার আর জুতো খুলে নিল রবিন। বাতাস-নিরোধক বাক্সে ভরা টেপরেকর্ডারটা তুলে নিয়ে এসে নামল সাগরে। পানিতে ডুবিয়ে টিপে দিল প্লে করার বোতাম। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল ক্যাসেটের চাকা, ফিতে পেঁচাচ্ছে। ফুল ভলিয়ুমে সাগরের পানিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে রোভারের রেকর্ড করা কণ্ঠ।

মানুষের কান সে শব্দ শুনতে পাবে না, কিন্তু রোভারের কানে হয়তো পৌছবে, অনেক দূর থেকেও।

বোটের পেছনে আগের জায়গায়ই রয়েছে কিশোর। তাড়াতাড়ি আবার লকারে লুকিয়ে ফেলল ওয়াকি-টকিটা।

বিশ গজ দূরে এখনও পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। বাক্সটা নিয়ে আসার জন্যে থেমে থেমে চেঁচিয়েই চলেছে উলফ।

হাত তুলে সিগন্যাল দিল কিশোর। আগেই বলে রাখা আছে টিনহাকে, এর অর্থ ঃ রবিনকে খবর পাঠানো হয়েছে।

হাত নেড়ে জবাব দিল টিনহা ঃ বুঝতে পেরেছে। রোভারের মাথায় আলতো চাপড় দিল। এক সঙ্গে ডাইভ দিল দুজনে।

রেলিঙে সোজা হলো উলফ। 'কি হচ্ছে? হচ্ছেটা কি?' চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে

গিয়ে ককপিটে ঢুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মুসাকে। বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল একটু আগে টিনহা আর রোভার যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে।

জায়গাটায় প্রায় পৌঁছে গেছে বোট, এই সময় মাথা তুলল টিনহা। বোট থামিয়ে হুইল আবার মুসার কাছে ফিরিয়ে দিল উলফ। 'ধরে রাখো,' বলেই ছুটে বেরোল ককপিট থেকে।

'বাক্সটা কোথায়?' রেলিঙে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ।

জবাব দিল না টিনহা। এক হাতে ক্যামেরা আর সার্চ লাইট, আরেক হাতে রেলিঙ ধরে উঠছে পানি থেকে।

'তিমিটা কোথায়?' আবার বলল উলফ।

তবু জবাব নেই। ধীরে সুস্থে মাস্ক খুলল টিনহা, এয়ার ট্যাংকটা পিঠ থেকে খুলে রাখল ডেকে।

'কোথায়?' রাগে লাল হয়ে গেছে উলফের মুখ। 'বাক্স কোথায়? তিমি কোথায়?'

'আমারও সেই প্রশ্ন, মিস্টার উলফ,' সাগরের দিকে চেয়ে বলল টিনহা।

'মানে?' পাই করে কিশোরের দিকে ফিরল উলফ। 'এই বিনকিউলার নিয়ে তুমি কি করছ? দেখি, আমাকে দাও।'

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে সাগরে আঁতিপাতি করে তিমিটাকে খুঁজল সে।

রোভারের চিহ্নও নেই।

'তিমির স্বভাবই ওরকম,' বোঝানোর চেষ্টা করল টিনহা। উলফ এদিকে পেছন করে আছে। কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপল টিনহা। 'সঙ্গে আছে, আছে, হঠাৎ করে হাওয়া। একেবারে গায়েব। মুক্তির নেশায় পেয়ে বসে, না কী, কে জানে। যায় তো যায়ই, আর আসে না।'

বিনকিউলার চোখ থেকে সরাল উলফ। 'হারামজাদা আমার বাক্স নিয়ে গেছে। ওটার মাথায় বেঁধেছিল কেন?' টিনহার দিকে তাকাল, চোখে সন্দেহ। 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা, মুখ বাঁকাল হতাশ ভঙ্গিতে। 'উপায় ছিল না। আর কোনভাবে তুলে আনতে পারতাম না। ভাল কাজ দেখিয়েছে, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। কেবিনে ঢুকে কি সহজেই না বাংকের তলা থেকে বাক্সটা বের করে আনল। হ্যাঙ্গারটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেলে হুক লাগিয়ে টেনে বের করে আনল বাক্স। তারপর দড়ি ধরে টেনে তুলেছি আমি…'

'বোটে আনলে না কেন?'

'বোকার মত কথা বলবেন না। অনেক নিচে নেমে, অনেকক্ষণ পানিতে ডুবে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর ভারি একটা বোঝা নিয়ে সাঁতরে…'

'তত ভারি নয় বাক্সটা…'

'তবু খামোকা কথা বলছেন।' উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে দু-হাত রাখল টিনহা। 'ইস্পাতের একটা বাক্স, ভেতরে ক্যালকুলেটর বোঝাই, ভারি নয় তো কি হালকা? রোভারের মাথায় বেঁধে আনাটাই তো সহজ, নাকি?' রেলিঙে ঝোলানো তোয়ালে তুলে নিয়ে চুল মুছতে শুরু করল সে। খারাপ কি আমারও কম লাগছে? আপনার

যেমন অর্ধেক গেছে, আমারও তো গেছে।'

'গেছে না!' উলফের কণ্ঠে তিক্ত হতাশা। বিনকিউলারটা আবার চোখে লাগাল। 'কোথায়? কোথায়, পাজি, নচ্ছাড়, হারামীর বাচ্চা হারামী, পোকাখেকো জানোয়ারটা? গেল কোথায় বেঈমান মাছটা?'

কিশোরের দিকে চেয়ে নিরীহ গলায় বলল টিনহা, 'কিশোর, কোথায় গেল, বলতে পারো?'

'হয়তো পারি,' দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, পুরোদমে এঞ্জিন চালালেও পিছু নিয়ে ওটাকে এখন ধরতে পারবে না উলফ। তার আগেই তীরে পৌঁছে যাবে রোভার। রবিন একলা রয়েছে খাঁড়ির ধারে, তার হয়তো সাহায্য দরকার হতে পারে। 'শুধুই অনুমান। আমার মনে হয় তীরে চলে গেছে রোভার, খাঁড়ির দিকে। ওখানেই তো সকালে সাগরে নামানো হয়েছিল তাকে।

ঝট করে বিনকিউলার নামিয়ে ফিরে চাইল উলফ। চোখে সন্দেহ। 'কেন তা করতে যাবে?'

বাড়ি ফেরার প্রবণতা,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বলেইছি তো, মিস্টার উলফ, এটা আমার অনুমান।'

'ওঁম্‌ম্‌...' তীরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল উলফ। 'যাও, গিয়ে হুইল ধরো। খাঁড়ির দিকে চালাও।'

সামনের ডেকে চলে এল উলফ।

মুসার হাত থেকে হুইল নিল কিশোর।

'ফুল স্পীড!' আদেশ দিল উলফ।

'আই আই, স্যার,' দারুণ মজা পাচ্ছে কিশোর, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। পুরো বাড়িয়ে দিল এঞ্জিনের গতি। নষ্ট হলে উলফের হবে, তার কি? সে তো আদেশ পালন করছে মাত্র। তবে খাঁড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর ব্যাপারে উলফের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন নয় সে। দেখতে চায়, তার প্ল্যানমাফিক সব হয়েছে কিনা। নিজের গাওয়া গানের প্রতি সাড়া দিয়ে সত্যিই তীরে ছুটে গেছে কিনা রোভার। সবার আগে বাক্সটা খুলতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, কি আছে ভেতরে!

পনেরো

হাতের ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির দিকে তাকাল রবিন। পঁচিশ মিনিট।

পঁচিশ মিনিট ধরে রোভারের গান বাজাচ্ছে সে। আর পাঁচ মিনিট পরেই শেষ হয়ে যাবে ফিতে, আবার শুরুতে পেঁচিয়ে এনে তারপর প্লে করতে হবে।

পানিতে নেমে উবু হয়ে পানির নিচে ধরে রেখেছে বাক্সটা। একবার এ-পায়ের ওপর ভর রাখছে, একবার ও-পায়ের ওপর। পা নাড়াতেই হচ্ছে, নইলে যা ঠাণ্ডা পানি, জমে যেতে চায়। বাঁকা হয়ে থাকতে থাকতে কোমর ধরে যাচ্ছে।

সামান্য সোজা হলো রবিন। এই সময় দেখতে পেল তীর থেকে শ-খানেক গজ দূরে স্থির পানিতে মৃদু নড়াচড়া, নিচ দিয়ে বড় কিছু একটা আসছে, ওখানকার পানি

অস্থির। সত্যিই দেখছে তো, নাকি কল্পনা?

না, সত্যিই দেখছে। আবার দেখা গেল নড়াচড়া। এবার বেশ জোরে। উত্তেজনায় পা নড়াতে ভুলে গেল রবিন। সাগরের দিকে চেয়ে আছে, চোখে পলক পড়ছে না।

সবার আগে চোখে পড়ল ধাতব বাক্সটা। রবিনের মাত্র কয়েক ফুট দূরে ভেসে উঠল। মুহূর্ত পরেই ভুসস করে ভাসল রোভারের মাথা। নিঃশব্দে ভেসে চলে এল রবিনের কাছে, হাঁটুতে নাক ঘষল।

'রোভার! রোভার!' ঠাণ্ডার তোয়াক্কাই করল না রবিন, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, তিমিটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। 'রোভার, দিয়েছ কাম সেরে।'

রবিনকে দেখে রোভারও খুশি। শরীর উঁচু করে, লেজের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছে।

'সরি, রোভার,' আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো রবিনকে, 'তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি।'

ভাবছে সে—পথের শেষে কি দেখবে আশা করেছিল তিমিটা? আরেকটা তিমি? নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিল? নাকি স্রেফ কৌতূহল? দূরে নিজের কণ্ঠ শুনলে রবিনের যে-রকম লাগবে, তেমনি কোন ব্যাপার?

'কিছু মনে কোরো না, রোভার। লক্ষ্মী ছেলে। দাঁড়াও তোমার লাগাম খুলে দিই, তারপর খুশি করে দেব তোমাকে।'

সকালে আসার সময় এক বালতি মাছ নিয়ে এসেছে টিনহা।

কয়েক সেকেণ্ডেই রোভারের লাগাম খুলে নিল রবিন, বাক্সটা খুলে নিল। আরে, বেশ ভারি তো! তবে আরও অনেক ভারি হবে মনে করেছিল সে। 'দাঁড়াও এখানে। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।'

দু-হাতে বাক্সটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ঘুরল সে, উঠে আসতে শুরু করল পানি থেকে।

শুকনো বালিতে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চোখে পড়ল লোকটাকে। সৈকতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে।

লম্বা, গায়ে উইণ্ডব্রেকার, চোখের ওপরে নামিয়ে দিয়েছে হ্যাট। প্রথমেই লোকটার কাঁধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। তারপর অস্বাভাবিক মোটা বাহু।

এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকটা। অবাক কাণ্ড! মুখ কোথায়? আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, মাথার ওপর দিয়ে নাইলনের কালো মোজা টেনে দিয়েছে।

'গুড,' বলল লোকটা। 'দাও, কেসটা দাও।' কেসটা উচ্চরণ করল 'কেস-আস'।

চেনা কণ্ঠস্বর, আগেও শুনেছি রবিন, এই লোকই ফোন করেছিল তাদেরকে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিশোরকে কিডন্যাপ করেছিল। মুসা এর পেটে গুঁতো মেরেই চিত করে ফেলেছিল মড়মড়ে কাঠের মেঝেতে।

'দাও,' হাত বাড়াল লোকটা। দ্রুত এগিয়ে আসছে, মাত্র দুই গজ দূরে রয়েছে।

চুপ করে রইল রবিন। কি বলবে? বাক্সটা আরও শক্ত করে বুকে চেপে ধরে

পিছিয়ে আসতে শুরু করল।
'দাও।' গতি বাড়াল লোকটা।
হাঁটু পানিতে চলে এসেছে রবিন। লোকটাও কাছে এসে গেছে। থাবা দিয়ে বাক্সটা ছিনিয়ে নিতে গেল।
আরও পিছানোর চেষ্টা করল রবিন, কিন্তু তার আগেই বাক্স ধরে ফেলল দৈত্যটা। রবিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইল।
বাক্স ছাড়ল না রবিন, বুঝতে পারছে, লাভ হবে না। লোকটার বুক আর বাহুর আকার দেখে হতবাক হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে পারবে না সে।
কিন্তু সহজে বাক্স ছাড়ল না। টানাহেঁচড়া চলল, পিছিয়ে আসছে সে ধীরে ধীরে। কোমর পানিতে চলে এল। লোকটা তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। চাপ আরেকটু বাড়লেই চিত হয়ে পড়ে যাবে, তার ওপর পড়বে দৈত্যটা। তখন আর বাক্স না ছেড়ে পারবে না।
ভারসাম্য হারাল রবিন। ওই অবস্থায়ই দেখতে পেল, উঠতে শুরু করেছে লোকটার শরীর। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, চার হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। তার নিচেই দেখা গেল তিমির প্রকাণ্ড মাথা।
ঝাড়া মেরে আবার লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলল রোভার। অতি সহজে। টেনিস বল লোফালুফি করছে যেন বাচ্চা ছেলে। বার বার ছুঁড়ে মেরে তাকে নিয়ে চলল গভীর পানির দিকে।
চেঁচাচ্ছে দৈত্যটা, সাহায্যের জন্যে। পানিতে দাপাদাপি করছে, ভেসে থাকার চেষ্টায়।
আবার লোকটার পিঠের নিচে মাথা নিয়ে গেছে রোভার, শূন্যে ছুঁড়বে আবার। চেঁচামেচিতে থমকে গেল। পানি থেকে মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে দেখল এক মুহূর্ত, তারপর তীরের দিকে ঠেলে আনতে শুরু করল লোকটাকে।
ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটা, পারছে না। বুকে যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, ভারের চোটে তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ফল হচ্ছে না।
এই খানিক আগেও পরম শত্রু ভেবেছিল লোকটাকে রবিন। কিন্তু এখন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে। তার ডুবে মরা দেখতে পারবে না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে।
সৈকতে উঠে এক দৌড়ে এসে একটা পাথরের আড়ালে আগে বাক্সটা লুকাল সে। তারপর আবার ছুটে ফিরে এসে নামল পানিতে।
এতক্ষণে প্রায় ডুবেই গেছে লোকটা। পানির ওপরে রয়েছে শুধু মোজায় ঢাকা মুখ। তার পাশে ভাসছে রোভার। চোখে বিস্ময়।
'ওর নিচে ঢোকো, রোভার,' রবিন বলল। 'ভাসিয়ে রাখতে পারো কিনা দেখো।'
তিমিটা তার কথা বুঝল কিনা কে জানে, কিন্তু রবিন যা বলল ঠিক তা-ই করল। না বললেও বোধহয় করত। তিমি আর ডলফিনের স্বভাব এটা—ডুবন্ত মানুষকে ঠেলে তুলে তীরে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার অনেক কাহিনী আছে। দৈত্যটার বিশাল বুক ভেসে উঠল পানির ওপরে। খামচে টেনে উইণ্ডব্রেকারটা ছিঁড়ে ফেলার

চেষ্টা করছে। পারছে না। চেন খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

লোকটাকে ঠেলে কাছে নিয়ে এল রোভার।

চেন খুলে অনেক টানাটানি করে লোকটার গা থেকে উইণ্ডব্রেকার খুলে আনল রবিন। অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝল, কিসের ভারে ডুবে যাচ্ছিল লোকটা। উইণ্ডব্রেকারের ভেতরের দিকে ফোম-রবারের পুরু আস্তরণ, স্পঞ্জের মত পানি শুঁষে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ভীষণ ভারি।

উইণ্ডব্রেকার খুলতেই লোকটার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। হালকা-পাতলা দুর্বল একজন মানুষ, বেচারার দুরবস্থা দেখে করুণা হচ্ছে রবিনের। রোভারের সাহায্যে পানির একেবারে কিনারে নিয়ে এল লোকটাকে। তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে এনে ফেলল বালিতে।

চিত হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে লোকটা। এত কাহিল, ওঠার ক্ষমতা নেই। হ্যাট খুলে পড়ে গেছে পানিতে। মাথার ওপর টেনে দেয়া মোজাটা রয়েছে।

টেনে মোজা খুলল রবিন।

বেরিয়ে পড়ল লম্বা, ধারাল নাক। সামান্য বসা গাল। ডান চোখের নিচে কুঁচকানো দাগ।

নীল বনেট।

ষোলো

'ওই,' চেঁচাল উলফ, 'ওই জানোয়ারটা।' জানোয়ারকে বলল জান-ওয়ার।

চোখ থেকে বিনকিউলার সরিয়ে কিশোরকে বলল সে, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। ব্যাটা ওখানেই ফিরে গেছে।' তাড়াতাড়ি ককপিটে এসে কিশোরকে সরিয়ে হুইল ধরল।

টিনহাও দেখেছে রোভারকে। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে সে। ডাকল, 'রোভার! এই রোভার!'

ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলল রোভার। ছুটে আসতে শুরু করল।

'বাক্স কই?' বকের মত মাথা বাড়িয়ে দেখছে উলফ। 'বাক্সটা কই?'

তীরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। বালিতে পড়ে আছে একটা লোক, তার পাশে দাঁড়ানো রবিন। এদিকেই চেয়ে রয়েছে সে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা ঠেকিয়ে গোল করে দেখিয়ে ইঙ্গিত দিল ঃ সব ঠিক আছে।

'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার,' মুসাকে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'উলফ কিছু বোঝার আগেই।'

'ঠিকই বলেছ,' ওয়েট স্যুট খোলেনি মুসা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করল।

জামা খুলে কিশোরও পানিতে নামল, সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

'আরে, নীল বনেট!' হাত দিয়ে গায়ের পানি মুছতে মুছতে বলল কিশোর। 'ও কি করছিল এখানে? রবিন, কি ব্যাপার?'

সংক্ষেপে সব জানাল রবিন। সব শেষে বলল, 'মরেই গিয়েছিল আরেকটু হলে। শরীরে কিচ্ছু নেই, একেবারে কাহিল।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর। তীরের যতটা সম্ভব কাছে বোট নিয়ে এসেছে উলফ। নোঙ্গর ফেলেছে। রোদে চকচক করছে টাক। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লাফিয়ে নামল পানিতে।

'বাক্সটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লুকিয়ে ফেলেছি...' উলফকে দেখে চুপ হয়ে গেল রবিন।

নীল বনেটের দিকে তাকালই না উলফ। ওকে এখানে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি। ছেলেদের কাছে এসে রবিনকে বলল 'বাক্সটা কোথায়?'

জবাব দিল না রবিন।

'এই ছেলে, তোমাকে বলছি,' খেঁকিয়ে উঠল উলফ। 'বাক্সটা দাও।'

'কিসের বাক্স?' আকাশ থেকে পড়ল যেন রবিন। কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো দিল মুসার শরীরে। উলফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে, মুসা লোকটাকে আটকে রাখতে পারলে দৌড়ে গিয়ে বাক্স নিয়ে সাইকেলে করে পালিয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ধমকে উঠল উলফ, 'খবরদার! কোন চালাকি নয়।' কোমর পর্যন্ত ভেজা তার। খাটো ডেনিম জ্যাকেটে পানি লাগেনি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। আবার যখন বের করল, হাতে দেখা গেল ভোঁতা নাক ছোট একটা পিস্তল, কুৎসিত চেহারা।

রবিনের দিকে পিস্তল তাক করল উলফ। 'বাক্স। তিমিটা নিয়ে এসেছে। দাও, কেই-আসটা, জলদি।'

অসহায়ভাবে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

কিশোর চেয়ে আছে পিস্তলের দিকে। আগ্নেয়াস্ত্রের ওপরে পড়াশোনা মোটামুটি করছে। উলফের হাতে ওটা কোন্ কোম্পানির চিনতে পারল না, তবে ব্যারেলের আকার দেখে অনুমান করল, নিশানা মোটেই ভাল হবে না অস্ত্রটার। দশ গজ দূর থেকেও ওটা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করা কঠিন হবে। কিন্তু উলফ ধরে রেখেছে রবিনের বুকের এক ফুট দূরে।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'দিয়ে দাও বাক্সটা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুখ কালো, এত কষ্ট করে লাভ হলো না। পাথরের কাছে এসে দাঁড়াল। তার পেছনেই রয়েছে উলফ। বাক্সটা তুলল রবিন। নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল উলফ।

'না-আ-আ-আ!' তীক্ষ্ণ চিৎকার।

প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন চিৎকারটা কোথা থেকে এসেছে। তারপর দেখল, এলোমেলো পায়ে দৌড়ে আসছে বনেট।

ঘুরে চেয়েছে উলফ। চিৎকারে সে-ও অবাক হয়েছে।

রবিনের মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারা করল। বাক্সটা ছুঁড়ে দিল রবিন। লুফে নিল কিশোর।

উলফকে গাল দিতে দিতে আসছে বনেট, 'বেঈমান! হারামী! মিথ্যুক! চোর!'

রবিন আর কিশোরের দিকে নজর দেয়ার আগেই উলফের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনেট। আঙুল বাঁকা করে খামচি মারতে গেল চকচকে টাকে, গলা চেপে ধরতে গেল। পিস্তল নামিয়ে ফেলেছে উলফ, কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো মেরে বনেটকে গায়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল, এপাশ-ওপাশ সরাচ্ছে মাথা।

ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল বনেট, কিন্তু উলফের জ্যাকেট ছাড়ল না, তাকে নিয়ে পড়ল।

বাক্সটা কিশোরের হাতে। মুসা দাঁড়িয়ে আছে দশ গজ দূরে, পানির কিনারে। আরেকটু দূরে পানিতে রোভারের গায়ে গা ঠেকিয়ে দেখছে টিনহা।

মুসার কাছে বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

ঝাড়া দিয়ে জ্যাকেট ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উলফ। আবার কাহিল হয়ে গেছে বনেট, দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে-ও।

বাক্সটা ধরেছে মুসা। টিনহার দিকে তাকাল।

বুঝতে পারল টিনহা। তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল।

বাক্সটা দু-হাতে বুকে ঝাপটে ধরে টিনহার দিকে ছুটল মুসা। ছুটতে শুরু করেছে উলফ। চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও, বলছি।'

কে শোনে তার কথা? ফিরেও তাকাল না মুসা। বুঝতে পারছে, তার দিকেই চেয়ে আছে উলফের পিস্তল, কিন্তু তোয়াক্কা করল না।

'দাও,' হাত বাড়াল টিনহা। 'ছুঁড়ে মারো।'

বাসকেট বল খেলে মুসা, ভালই খেলে। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল উলফের কথা। ভুলে গেল, যে কোন মুহূর্তে গর্জে উঠতে পারে পিস্তল। বাক্সটাকে বাসকেট বলের মত করে ধরে দূর থেকে ছুঁড়ে দিল টিনহার দিকে, বল ছোঁড়ার কায়দায়।

লম্বা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল বাক্সটা, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সেটা ধরল টিনহা।

বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েই আর দেরি করেনি মুসা, ঝাঁপ দিয়েছে পানিতে। ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভাসল না। পানির নিচ দিয়েই সাঁতরে চলল গভীর পানির দিকে। দম একেবারে ফুরিয়ে এলে, ভাসল।

বিশ গজ দূরে চলে গেছে টিনহা। তীরের দিকে চেয়ে আছে। বাক্সটা কামড়ে ধরে রেখেছে রোভার।

মাথা নিচু করে রেখে ফিরে চাইল মুসা।

পিস্তল নেই উলফের হাতে, বোধহয় পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। টেকো মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। মুসার মনে হলো, ভয়ানক রেগে গিয়ে ফুঁসছে একটা ষাঁড়, কি করবে বুঝতে পারছে না। তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর রবিন।

হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল কিশোর।

পানি থেকে উঠে এল মুসা।

'...আপনার জিনিস ডাকাতি করার কোন ইচ্ছেই নেই আমাদের, মিস্টার উলফ,' কিশোর বলছে। 'বাক্সের জিনিস অর্ধেক আমাদের, মানে, মিস শ্যাটানোগার প্রাপ্য। সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই একাজ করেছি।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না উলফ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভুরু নাচাল, 'কি করতে চাইছ?'

'বাক্সটা শহরে নিয়ে যাব,' বলল কিশোর। 'থানায়, ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে। উনি এখানকার পুলিশ চীফ, জানেন বোধহয়। খুব ভাল লোক। পুলিশকে ভয়ের কিছু নেই, বেআইনী কিছু করেননি, আমাদেরকে পিস্তল দেখানো ছাড়া। সেকথা বলব না আমরা। সব খুলে বলবেন তাঁকে। মিস্টার ফ্লেচার বাক্সের জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে দেবেন আপনাকে আর টিনহাকে।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। সাগরের দিকে তাকাল উলফ। পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। ওদের কাছ থেকে বাক্সটা ফেরত নেয়ার কোন উপায় নেই। পিস্তল তাক করেও কোন লাভ হবে না, বিচ্ছু একেকটা, কেয়ারই করবে না। উল্টে আরও বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিতে পারে তাকে।

'বেশ,' ভোঁতা গলায় বলল উলফ। 'বোটে করে যাব আমরা। রকি বীচের নৌকাঘাটায় বোট রেখে থানায় যাব। ঠিক আছে?'

রাজি হলো না কিশোর, মাথা নাড়ল। উলফের চালাকি বুঝতে পারছে, কিন্তু সেকথা বলল না। নরম গলায় বলল, 'এত ঘুরে যাওয়ার দরকার কি? আসলে এখান থেকে যাওয়ারই দরকার নেই। চীফকেই ডেকে নিয়ে আসতে পারি আমরা।'

'ডেকে? কিভাবে?' ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠল উলফ। 'এখানে ফোন কোথায়? সব চেয়ে কাছেরটাও...'

'...আধ মাইল দূরে,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর, 'কোস্ট রোডের ধারে একটা কাফেতে। সাইকেল নিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটেই চলে যাবে রবিন। চীফকে ফোন করে আসবে। কি রবিন, পারবে না?'

'খুব পারব,' হাসল রবিন।

'মিস্টার উলফ, আপনার পিস্তলটা যদি বোটে রেখে আসেন,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর, 'টিনহাকে বাক্সটা আনতে বলতে পারি। তারপর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি পুলিশ আসার অপেক্ষায়। কি বলেন?'

কি আর বলবে উলফ? 'কোঁকড়াচুলো, সাংঘাতিক পাজি, ইবলিসের দোসর' ছেলেটাকে কষে দুই চড় লাগানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। চোখ পাকিয়ে তাকাল 'অতি নীরিহের' ভান করে থাকা মুখটার দিকে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

পুলিশকে ফোন করতে গেল রবিন।

বোটের লকারে পিস্তলটা রেখে এল উলফ। মুসা আবার গিয়ে দেখে এল, সত্যিই রেখেছে কিনা।

তীরে এসে মাছের বালতিটা নিয়ে গেল টিনহা, রোভারকে খাওয়াল। তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এল তিমিটা, তীরের কাছে এসে মাথা তুলে চেয়ে রইল, টিনহাকে চলে যেতে দেখে খারাপ লাগছে তার।

এতক্ষণে খেয়াল করল কিশোর, বনেট নেই। কোথাও দেখা গেল না তাকে। কেটে পড়েছে কোন এক ফাঁকে।

পথের ধারে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের, রবিন ফিরে এল।

কয়েক মিনিট পরেই পুলিশের গাড়ি। আরও পনেরো মিনিট পর থানায় পৌঁছল ওরা।

ওদের দিকে চেয়ে অবাকই হলেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁকে দোষ দিতে পারল না কিশোর, কাদা-পানিতে যা চেহারা হয়েছে ওদের একেকজনের, পোশাক-আশাকের যা অবস্থা, তাতে তিনি অবাক না হলেই বরং অস্বাভাবিক লাগত।

'কি ব্যাপার কিশোর?' জানতে চাইলেন পুলিশ-প্রধান।

তিন গোয়েন্দাকে চেনেন তিনি। কয়েকবার পুলিশকে সাহায্য করেছে ওরা। বেশ কয়েকটা জটিল কেসের সমাধান করে দিয়েছে। কিশোরের বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট আস্থা তাঁর।

উলফকে দেখিয়ে বলল কিশোর, 'উনি মিস্টার উলফ। উনিই বলুন সব, সেটাই ভাল হবে।'

'বলুন, মিস্টার উলফ,' অনুরোধ করলেন ফ্লেচার।

উঠে দাঁড়াল উলফ। পকেট থেকে ভেজা কাগজপত্র বের করে তা থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

লাইসেন্সটা একজন সহকারীকে দিলেন ক্যাপ্টেন, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

সব খুলে বলল উলফ। মেকসিকোয় ক্যালকুলেটর চোরাচালান করতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ফেরার পথে ঝড়ে বোট ডোবা, তারপর তিমির সাহায্যে বাক্সটা উদ্ধার, কিছুই বাদ দিল না। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'আমার এই খুদে বন্ধুটি পরামর্শ দিল, বাক্সটা আপনার সামনে খুলতে। তাতে আমার আর মিস্টার শ্যাটানোগার ভাগ নিয়ে পরে কোন গোলমাল হবে না। ভেবে দেখলাম ঠিকই বলেছে। রাজি হয়ে গেলাম।'

পকেট থেকে বাক্সের চাবি বের করে ক্যাপটেনকে দিল উলফ। 'টিনহা, বাক্সটা দাও ক্যাপটেনের কাছে।'

মনে মনে স্বীকার না করে পারল না কিশোর, অভিনয় মোটামুটি ভালই করেছে উলফ। যেন নিরীহ সৎ একজন মানুষ। কারও সঙ্গে বেঈমানী করতে চায় না। মিস্টার শ্যাটানোগার প্রাপ্য ভাগ দিতে বিশেষ আগ্রহী।

তালা খুলে বাক্সের ডালা তুললেন ক্যাপটেন। কুঁচকে গেল ভুরু।

টিনহা চমকে গেল। রবিন আর মুসার চোখ দেখে মনে হলো, হঠাৎ সার্চ লাইটের তীব্র উজ্জ্বল আলো ফেলেছে কেউ তাদের চোখে।

ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল কিশোর, উঁকি দিয়ে দেখল বাক্সের ভেতরে কি আছে। সামান্যতম অবাক মনে হলো না তাকে, যেন জানত এ-জিনিসই থাকবে।

দশ ডলারের কড়কড়ে নতুন নোটের বাণ্ডিলে ঠাসা বাক্সটা।

রবার ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিশোর অনুমান করল, দশ লাখ ডলারের কম হবে না।

'তো, দেখলেন তো চীফ,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল উলফ। 'লা পাজে এবারের ট্রিপে যা আয় হয়েছে, আছে এখানে। সেই সঙ্গে...' টেলিফোন বেজে ওঠায় থেমে গেল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনলেন মিস্টার ফ্লেচার। নামিয়ে রেখে বললেন, 'আপনার আই ডি চেক করা হয়েছে। পরিষ্কার। আপনার

নামে কোথাও কোন ওয়ারেন্ট নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলেন, সেই সঙ্গে কি?'

'পকেট ক্যালকুলেটরগুলো লা পাজে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, সেই টাকা আছে এখানে। সেই সঙ্গে রয়েছে আমার অন্য টাকা। লা পাজে আমার কিছু সম্পত্তি ছিল, একটা হোটেল ছিল, সব বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সেই টাকা। এখন টিনহা বলুক, তার বাবার ক্যালকুলেটরগুলোর জন্যে কত চায়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'আপনার বিরুদ্ধে কোন কেস দাঁড় করাতে পারছি না। ট্যাক্স যদি ক্লিয়ার থাকে...' শ্রাগ করলেন তিনি। 'মিস শ্যাটানোগা, বলুন কত চান?'

হাসল টিনহা। 'বুঝতে পারছি না। মিস্টার উলফ বলেছিলেন, বাক্সে ক্যালকুলেটর রয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ হাজার ডলার দাম। মিছে কথা কেন বলেছিলেন, জানি না। যাক গে। বাবার অর্ধেক শেয়ার হয় সাড়ে বারো থেকে পনেরো হাজার কিন্তু তুলতে খরচাপাতি লেগেছে। হাসপাতালের বিল হাজার দশেক লাগবে, ওটা পেলেই আমি খুশি।'

'ঠিক আছে, দশ হাজারই দেব,' বাক্সটা তুলে নেয়ার জন্যে সামনে ঝুঁকল উলফ। 'কাল সকালে চেক দিয়ে দেব তোমাকে। কালই টাকা তুলে নিতে পারবে ব্যাংক থেকে।'

এখান থেকে নগদ নয় কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না টিনহা, সঙ্কোচে।

বাক্সটা টেবিলের ওপর দিয়ে টেনে আনল উলফ। ডালা আটকাবে। তারপর বেরিয়ে যাবে এতগুলো টাকা নিয়ে।

এক কদম সামনে বাড়ল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল, হাত সরিয়ে ক্যাপটেনকে বলল, 'স্যার, ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে।'

চাবিটা উলফকে দিতে গিয়েও থেমে গেল ক্যাপটেনের হাত। 'কি?'

'বাক্সটা আবার খুলুন। নোটের সিরিয়াল নাম্বার মেলান।'

'সিরিয়াল?'

'মেলান। আমার ধারণা, একই নাম্বারের অনেকগুলো পাবেন।' বলতে বলতেই টান দিয়ে নিজেই নিয়ে এল বাক্সটা। ডালা তুলে একটা বাণ্ডিল বের করে ঠেলে দিল ক্যাপটেনের দিকে। 'আর, ট্রেজারিতে ফোন করুন, এক্সপার্ট পাঠাক। সব জাল নোট, আমি শিওর।'

সতেরো

'সহজেই নীল বনেটকে ধরে ফেলেছে পুলিশ,' বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তাঁর বিশাল টেবিলের সামনে বসে বলছে কিশোর। 'ওর ঝরঝরে লিমোসিনে করে মেকসিকো পালাচ্ছিল। পথে খারাপ হয়ে যায় গাড়ি। স্যান ডিয়েগোর কাছে। পুলিশের কাছে সব বলে দিয়েছে ও।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'বনেট স্বীকার করেছে জাল নোটগুলো সে বানিয়েছে?'

'করেছে,' জবাব দিল রবিন। 'শুধু তাই না। মিস শ্যাটানোগার গাড়ির ব্রেকের কানেকশন কেটেছে। যত ভাবে পেরেছে, ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাদেরকে, যাতে বাক্সটা না তুলতে পারি। লোকটার জন্যে এখন আমার দুঃখই হচ্ছে। বেচারা।...আসলে উলফ তাকে বাধ্য করেছিল নোট জাল করতে। বনেট তার ব্ল্যাকমেলের শিকার।'

'ব্ল্যাকমেল? কিভাবে?'

'ইউরোপে কাজ করত বনেট। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স আরও নানা রকম দরকারী কাগজপত্র জাল করত। সেটা জেনে ফেলল পুলিশ। উলফও জানল। বনেটের কাজকর্মের কিছু প্রমাণও জোগাড় করে ফেলল। পালাল বনেট। মেকসিকোতে গিয়ে ঢুকল। মনস্থির করল, আর বেআইনী কাজ করবে না। তার যা দক্ষতা, প্রেসের কাজে উন্নতি করতে পারবে। তা-ই করল সে, লা পাজে প্রেস দিল। ভালই চলছিল, এই সময় একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হলো উলফ। দেখা হয়ে গেল বনেটের সঙ্গে। নোট জাল করতে বাধ্য করল তাকে। ভয় দেখাল, তার কথা না শুনলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে।'

'হুঁ, মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'কিশোর, তুমি কি করে বুঝলে নোটগুলো জাল?'

'বনেটের চোখের নিচের দাগ, স্যার,' বলল কিশোর। 'কারা কারা ঘড়ির মেকানিকের গ্লাস পরে, ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, লেখা কিংবা নকশা জালিয়াতির কাজ যারা করে, তারাও পরে।'

'আমার হলে মনে পড়ত না,' স্বীকার করলেন পরিচালক। 'অনেক তলিয়ে ভাব তুমি। যাক, বাক্সটা তুলতে বাধা দিল কেন বনেট, নিশ্চয় তার জাল করা সমস্ত নোট ছিল ওটাতে? ডুবে গিয়েছিল বলে খুব খুশিই হয়েছিল সে, না?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়লে তার অপরাধ আরও বাড়ত। বোট ডুবে যাওয়ায় খুশি হয়েছিল সে, সেজন্যেই ওটা তুলতে বাধা দিচ্ছিল। উলফ জানত না। একজন তুলতে চাইছে, আরেকজন বাধা দিচ্ছে, ব্যাপারটায় প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম।' থামল কিশোর। তারপর বলল, 'আপনার জানা আছে, স্যার, প্রতিটি জালিয়াতের কাজে কিছু না কিছু ফারাক থাকেই, বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে সেটা। বনেটও জানত, টাকাগুলো ব্যাংক থেকে পাবলিকের কাছে যাবে, সেখান থেকে কিছু যাবে ট্রেজারিতে, ট্রেজারির চোখে ধরা পড়ে যাবে ওগুলো জাল। জালিয়াতকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা। এক সময় না এক সময় বনেটের কাছে পৌঁছে যাবেই।'

'বানাতে গেল কেন তাহলে? মানা করে দিলেই পারত।'

'ভয়ে। মুখের ওপর উলফকে না করতে পারেনি, কিন্তু বোটটা ডুবে যাওয়ার পর ওগুলো যাতে আর তোলা না যায়, সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। শেষ দিকে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে।'

'হুঁ। অপরাধবোধ সঠিক চিন্তা করতে দেয় না মানুষকে। দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। কিন্তু বনেটেই বাধা দিচ্ছে তোমাদেরকে, শিওর হলে কি করে?'

'অনেক সময় লেগেছে, স্যার। তিনজনকে সন্দেহ করলাম। বিংগো উলফ, নীল

বনেট, আর যে লোকটা একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে তাকে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'বনেটের মাথা থেকে সেদিন সৈকতে মোজা খোলার আগেতক বুঝতে পারিনি, সে-ই বাধা দিয়েছে।'

মাথা দোলালেন চিত্রপরিচালক, 'হুঁ উলফের ওপর তোমাদের নজর ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যেই ওভাবে কথা বলেছে বনেট। টেনে টেনে ভেঙে ভেঙে বলেছে, গোয়ে-নদা, কেই-আস...'

'বেই-অ্যাও,' হাসল কিশোর। 'পাকা জালিয়াত লোকটা, অভিনয়ও ভাল করে। যেভাবে উলফের কথা নকল করল, বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাদেরকে।'

'তোমরা তিন গোয়েন্দা, সেটা জানল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'স্যান পেড্রোতে দেখেই নাকি চিনেছিল?'

'রোভারকে যেদিন বাঁচালাম, সেদিন বোটে উলফের সঙ্গে বনেটও ছিল,' বলল কিশোর। 'তিমিটাকে বাঁচিয়েছি, দেখেছে ওরা। তিমিটার সাহায্যে বোটের মাল তোলার কথা বলল তাকে উলফ, পুরো প্ল্যানটা বলল। তখনই ঠিক করে ফেলেছে বনেট, পরদিন ওশন ওয়ারল্ডে যাবে। ওখানে দেখল আমাদেরকে। আগের দিন সৈকত দেখেছিল, পরদিন ওশন ওয়ারল্ডে আমাদের দেখে ধরে নিল তিমিটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই গেছি আমরা। টিনহার অফিসে ঢুকতে দেখল, পরে টিনহার টেবিল আমাদের কার্ডটা দেখল। তার ধারণা হলো, আমাদেরকে দিয়েই তার কাজ হবে, ঠেকাতে পারবে উলফকে। তিমিটা সাগরে ছেড়ে দিতে পারলেই আর বোটের মাল তোলা যাবে না।'

'তিমি ছেড়ে দিলেও হয়তো অন্য উপায় বের করত উলফ,' বললেন চিত্রপরিচালক। 'এতগুলো টাকা, পুরো এক মিলিয়ন ডলার। আচ্ছা, ম্যারিবু শ্যাটানোগার অফিসে ঢুকেছিল কেন বনেট? নিশ্চয় একটা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঢুকল কেন?'

'শ্যাটানোগার স্কুবা যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করতে। ওশন ওয়ারল্ড থেকে যন্ত্রপাতি ধার নিল টিনহা। বেকায়দায় পড়ে গেল বনেট। শেষে উলফের বোটে উঠে কোনমতে একটা যন্ত্র নষ্ট করতে পারল।'

'আর সেটা পড়ল মুসার ভাগে,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'মুসা, তোমার কপালই খারাপ।'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন পরিচালক। 'আরিব্বাবা, অনেক বেজেছে। লাঞ্চের সময়। আরে বসো বসো, তোমাদের জন্যেও আনতে বলছি। এখানেই খেয়ে যাও।' আড়চোখে তাকালেন মুসার হাসি হাসি মুখের দিকে, একটু আগের গোমড়া কুচকুচে কালো মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে খাবার আনতে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। রবিনের দিকে ফিরলেন। 'রবিন, টিনহার বাবার কি খবর? ভদ্রলোক সেরে উঠেছেন? হাসপাতালের টাকার কি ব্যবস্থা?'

'ভালা, স্যার,' রবিন জবাব দিল। 'তবে টাকার ব্যবস্থা পুরোপুরি হয়নি।

এতবড় একটা জালিয়াতি ধরিয়ে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে ছোটখাটো একটা পুরস্কার দিয়েছে ট্রেজারি। আমাদের ভাগেরটাও টিনহাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তার বাবার চিকিৎসার জন্যে, নেয়নি। তার ভাগেরটাই শুধু নিয়েছে। আশা করছে, কেস করে ক্যালকুলেটর বিক্রির অর্ধেক টাকা আদায় করবে উলফের কাছ থেকে।'

'ভাবছি,' সামনে ঝুঁকলেন চিত্রপরিচালক, 'তোমাদের এবারের কেসটা নিয়ে ছবি করব। ভাল কাহিনী। নামটা কি দেয়া যায়?'

'লস্ট হোয়েল,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

'নাহ,' মাথা নাড়ল রবিন। 'লস্ট ওয়ারল্ড লস্ট ওয়ারল্ড মনে হয়। তাছাড়া তিমিটাকে তো আবার পাওয়া গেছে।'

'কিডন্যাপড হোয়েল,' বিড় বিড় করল কিশোর। বাংলায় বলল, হারানো তিমি।

'ঠিক,' আঙুল তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিডন্যাপড হোয়েল। চমৎকার নাম।'

খাবার এল। সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা।

'নাও, শুরু করো,' বলতে বলতে নিজের প্লেটটা টেনে নিলেন পরিচালক। খাওয়ার সময় আর বিশেষ কথা হলো না। শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে বললেন তিনি, 'কফি?'

ঘাড় কাত করল কিশোর। মুসা আর রবিনও সায় দিল।

'আচ্ছা,' কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন পরিচালক। 'রোভারের কি খবর? চলে গেছে?'

'নড়েওনি,' হেসে বলল রবিন। 'তাকে যেখানে রেখে এসেছিল টিনহা, থানা থেকে ফিরে গিয়ে দেখল, ওখানেই রয়েছে। ঘোরাঘুরি করছে। টিনহার বড় বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে। ভেবেচিন্তে আবার নিয়ে এসেছে ওটাকে।'

'কোথায়? ওশন ওয়ারল্ডে?'

'হ্যাঁ।'

'গুড,' চেয়ারে হেলান দিলেন আবার পরিচালক। 'টিনহার উপকার করা যায় কিভাবে, ভাবছিলাম। ছবিতে ওকে আর রোভারকে দিয়েই অভিনয় করাতে পারি। দুজনের বেশ কিছু সম্মানী পাওনা হয় তাহলে আমার কাছে।'

তিনজনেই তাকিয়ে আছে পরিচালকের দিকে।

'হাজার দশেক অগ্রিমও দিতে পারি,' আবার বললেন তিনি।

'টিনহার বাবার বিলের টাকা হয়ে যায় তাহলে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'কিশোর, বসে আছ কেন? চলো জলদি, টিনহাকে খবরটা দিতে হবে না? চলো, চলো।'

চিত্রপরিচালককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা দিল তিন কিশোর।

হাসিতে ভরে উঠল মিস্টার ক্রিস্টোফারের কুৎসিত মুখ। হাসলে আর তত খারাপ দেখায় না তাঁকে।

***
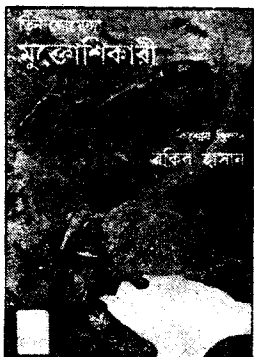
মুক্তোশিকারী

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮

'কোথাও ঢুকে একটা হ্যামবারগার খেয়ে নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা আমান।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। ওদের প্রিয় সৈকতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা—কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। প্রায় সারাটা দিনই কাটিয়েছে সৈকতে। সাগর পাড়ের রাস্তা ধরে সাইকেলে করে রকি বীচে বাড়ি ফিরছে এখন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী ছোট্ট একটা শহর রকি বীচ, সান্তা মনিকা থেকে কয়েক মাইল দূরে।

গোয়েন্দা সহকারীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল রবিন, সাইকেলের গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি হলো মুসার।

যে কোন ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত খতিয়ে দেখা স্বভাব প্রধান গোয়েন্দা কিশোর পাশার। সাইকেল চালিয়ে গরম হয়ে উঠেছে শরীর, সারা দিন সাঁতার কেটে ক্লান্ত। ভেবে দেখল, মুসার কথাটা মন্দ না। তারও খিদে পেয়েছে। সামনেই পথের পাশের পাহাড় চূড়ায় পুরানো 'স্ন্যাকস' রেস্টুরেন্টটায় থেমে কিছু খেয়ে নিলে ভালই হয়, পেটও ঠাণ্ডা হবে, বিশ্রামও হবে।

কিন্তু হ্যাঁ বলল না কিশোর, আরও খতিয়ে ভাবল। এখন বাজে বিকেল তিনটে, নাস্তা করেছে সেই সকাল ছ-টায়। কিছু মুখে না দিয়ে বাড়ি ফিরলে—মেরিচাচী যদি শোনেন—এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায়নি ওরা, বকা যে কি পরিমাণ দেবেন...নাহ্, খেয়ে নেয়াই ভাল।

'ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে সামনের দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর, 'সামনে থাম। ওশনসাইড রেস্তোরাঁয় খাব।'

এ-সময়ে ভিড় থাকে না, এক-দেড় ঘণ্টা আগেই দুপুরের খাওয়া খেয়ে চলে গেছে লোকে। রেস্তোরাঁ প্রায় খালি। রাস্তার দিকে একটা জানালার পাশে বসল তিন গোয়েন্দা। পা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারেই আধশোয়া হয়ে পড়ল মুসা। মেনু দেখায় মন দিল রবিন।

ঘরে যে কজন খদ্দের আছে তাদেরকে দেখছে কিশোর। লোকের চেহারা দেখে তাদের স্বভাব অনুমান করা তার হবি। তাছাড়া সব জিনিসই খুব খুঁটিয়ে দেখে সে, কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখতে চায় না।

একটা লোক বিশেষভাবে কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হালকা-পাতলা, ওদেশের মানুষের তুলনায় বেঁটেই বলা চলে, পাঁচ ফুট পাঁচের বেশি না। গাঢ় বাদামী স্যুট পরনে, সাদা শার্ট—গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা, চোখা কালো জুতো, অবিশ্বাস্য রকমের বড় পায়ের পাতা। বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা একটা

কাগজ, তার কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আছে, পড়া যায়, তা থেকেই বুঝল কিশোর, লোকটার ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে, জুয়াড়ী।

কাউন্টারের সামনে এক কাপ কফি নিয়ে টুলে বসেছে লোকটা, খালি নড়ছে, উসখুস করছে, খানিক পর পরই মাথা বাড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারছে রাস্তার দিকে। বেশ বড়সড় টুলে বসেছে, পাশে রেখেছে চার কোণা একটা বাক্স, একটু পর পরই ছুঁয়ে দেখছে বাক্সটা জায়গামত আছে কিনা। যেন কেউ নিয়ে যাবে ওটা। একটা জালি কাপড় দিয়ে মোড়া বাক্স, কাপড়ের জোড়াগুলো নিপুণভাবে টেপ দিয়ে আটকানো।

আরেকবার জানালার বাইরে লোকটা উঁকি দিতেই কিশোরও মাথা খানিকটা সরিয়ে চট করে দেখে নিল রাস্তার কি দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে লোকটার ওপরও নজর রেখেছে।

কই, তেমন কিছু তো না। প্রায় নিঃশব্দে চলে গেল কয়েকটা লিমোসিন। ওগুলোকে গুরুত্ব দিল না লোকটা। তারপর শোনা গেল মোটরের জোরাল গোঁ গোঁ, আরেকটা গাড়ি আসছে। টুল থেকে লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল লোকটা, সতর্ক দৃষ্টি, কারও আসার অপেক্ষা করছে বুঝি। একটা ক্যাম্পার গাড়ি দেখা গেল। আবার এসে টুলে বসে পড়ল সে।

ভারি কোন গাড়ি—ভ্যান বা ট্রাক জাতীয় কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা—ভাবল কিশোর।

হ্যামবারগার নিয়ে এল ওয়েইট্রেস। নিজের প্লেট টেনে নিল কিশোর। বন রুটির ওপরের অংশ ছিঁড়ে আলাদা করে রেখে মাংসসহ বাকিটুকু তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

অবাক কাণ্ড! চোখ টিপল লোকটা। হেসে তার জবাব দিল কিশোর।

ব্যাপারটাকে আমন্ত্রণ ধরে নিল লোকটা। চারকোণা বাক্সটা হাত নিয়ে এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'সাঁতার কাটতে গিয়েছিলে?' সাধারণ একটা প্রশ্ন, লোকটার বলার ধরনে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠল। চোখও টিপল সেই সঙ্গে।

'হ্যাঁ,' হ্যামবারগারে মুখ বোঝাই মুসার, হাসতে পারছে না ঠিকমত। 'উইলস বীচে।'

'উইলস বীচ?' মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন লোকটা। 'এজন্যেই এত খিদে পেয়েছে।' চোখ টিপল।

এমনি একটা কথার কথা বলল লোকটা, তাতে হাসির কিছু নেই, কিন্তু হেসে ফেলল তিন গোয়েন্দা। কথার সঙ্গে চোখ টেপাটা বেশ মজার মনে হয়েছে ওদের কাছে।

লোকটাও হাসল।

'বসি তোমাদের কাছে?' চোখ টিপল লোকটা।

জানালার কাছে চেয়ার সরিয়ে নিল কিশোর, তার পাশের খালি চেয়ারে বসল লোকটা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

'আমার নাম স্লেটার, অসকার স্লেটার,' বলতে বলতেই ডান চোখ টিপল বেশ জোর দিয়ে।

নিজেদের নাম বলল তিন গোয়েন্দা।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' স্বাভাবিক কথা, কিন্তু লোকটার চোখ টেপা অস্বাভাবিক করে তুলল কথাটা। ভারি এঞ্জিনের শব্দ শোনা যেতেই লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। একটা তেলের ট্রাক চলে গেল। আবার বসে পড়ল সে।

'আমার নাম স্লেটার বটে,' বলল সে, 'কিন্তু চোখ টিপি বলে সবাই ডাকে ব্লিংকি।' বলতে বলতেই আরেকবার চোখ টিপল।

এবার আর হাসি এল না ছেলেদের, খারাপ লাগছে লোকটার জন্যে। চোখ সে ইচ্ছে করে টেপে না, এটা তার মুদ্রাদোষ। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারে না।

এক সঙ্গে বসে চা খেলো ওরা। একটা দশ ডলারের বিল ওয়েইট্রেসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্লেটার বলল, 'হ্যামবারগারের দামও রাখুন,' চোখ টিপল। 'না না, মানা কোরো না। আমি তোমাদের খাওয়ালাম। বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে?' চোখ টিপল।

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে ওয়েইট্রেস, স্লেটারের চোখ টেপার কি অর্থ করেছে কে জানে, রাগ দেখা গেল তার চোখে। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। নোটটা নিয়ে গটমট করে হেঁটে চলে গেল। বিল রেখে ভাঙতি নিয়ে ফিরে এল।

মেহমানদারীর জন্যে স্লেটারকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেরা।

পরের কয়েক মিনিটেও ভারি কোন এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল না। স্লেটার উত্তেজিত, কথা বলার পরিবেশ নয়। তাছাড়া কি বলবে? অর্ধেকটা রুটি রেখে দিয়েছিল বলে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাল এখন কিশোর, চুপচাপ খাচ্ছে ওটা, কথা বলতে হচ্ছে না। উসখুস করছে অন্যেরা।

অবশেষে কিশোরই সহজ করল পরিবেশ। জিজ্ঞেস করল, 'সান্তা মনিকায় থাকেন আপনি, না?'

ঝট করে সোজা হয়ে গেল স্লেটার। হাত চলে গেল বাক্সের ওপর। পরের কয়েকটা সেকেণ্ড তার ডান চোখটা দ্রুত বার বার উঠল নামল। 'কি করে জানলে?' শুকনো কণ্ঠ।

লোকটাকে চমক দিতে চায়নি কিশোর। হাসল। 'না না, তেমন কিছু ভেবে বলিনি। এটা আমার কাছে খেলা, এক ধরনের খেলা,' বুঝিয়ে বলল সে। 'পার্কিং লটে তিনটে গাড়ি দেখলাম। একটার সামনের সীটে একটা খেলনা ভালুক পড়ে আছে। ধরে নিলাম ওটা ওই মহিলার, ওই যে সঙ্গে একটা মেয়ে। আরেকটা গাড়ির ছাতে দেখলাম সার্ফবোর্ড বাঁধা।' সুগঠিত স্বাস্থ্য, রোদে পোড়া বিবর্ণ চুল এক তরুণ কোক খাচ্ছে কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে, তাকে দেখিয়ে বলল গোয়েন্দা প্রধান, 'ওই গাড়িটা ওর। কি করে বুঝলাম? স্বাস্থ্য আর চুল দেখেছেন? সার্ফবোর্ড নিয়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ওকেই মানায়, না?' স্লেটারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে। 'বাকি থাকল আর একটা গাড়ি। সান্তা মনিকার নাম্বার প্লেট।'

নীরবে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে স্লেটার। 'চমৎকার খেলা। একেবারে

গোয়েন্দাগিরি।'

'গোয়েন্দাই আমরা,' কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। 'এরা দুজন আমার সহকারী।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে স্লেটারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

বিড়বিড় করে পড়ল লোকটা, 'কিশোর পাশা, গোয়েন্দাপ্রধান···মুসা আমান, সহকারী গোয়েন্দা···রবিন মিলফোর্ড, নথি গবেষক।···হুঁ,' টেলিফোন নম্বরটাও পড়ল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নম্বর নয়, তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বর। নিজেদের রোজগার থেকে ওটার বিল দেয় ওরা।

'আশ্চর্যবোধক চিহ্নগুলো কেন?' জিজ্ঞেস করল স্লেটার।

'অদ্ভুত সব রকম রহস্যের কিনারা করতে আমরা প্রস্তুত,' বিশেষ বিশেষ সময়ে দুর্বোধ করে কথা বলা কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কিশোরের স্বভাব।

মাথা ঝাঁকাল স্লেটার। কি ভেবে কার্ডটা রেখে দিল পকেটে। 'খুব বেশি···' থেমে গেল সে।

কি বলতে চেয়েছিল—বেশি রহস্য, বেশি মক্কেল, না বেশি কেস—বোঝা গেল না। লাফিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে। ভারি মোটরের গর্জন কানে আসছে। শব্দের অসঙ্গতিই প্রকাশ করে দিচ্ছে, দোষ আছে এঞ্জিনে।

কিশোরও তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরে গোঁ গোঁ করতে করতে আসছে একটা গাড়ি। ড্রাইভারকে জাপানী বলে মনে হলো।

স্লেটারের দিকে ফিরল কিশোর। কিন্তু আগের জায়গায় নেই···দরজার কাছে চলে গেছে। আরেক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে ছুটে যাবে পারকিং লটের দিকে।

সবার আগে লাফ দিয়ে উঠল মুসা। নিয়মিত ব্যায়াম করে, শরীরের ক্ষিপ্রতাও তাই অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। মেঝেতে রাখা বাক্সটা থাবা দিয়ে তুলে দৌড় দিল লোকটার পেছনে। 'এই যে, শুনুন,' চেঁচিয়ে ডাকল সে, 'আপনার বাক্স···'

থামল না স্লেটার।

পেছন পেছন দৌড়াল মুসা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করছে স্লেটার। স্টার্ট নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল দুই দরজার কালো সিডান গাড়িটা, হাইওয়েতে উঠেই স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ফিরে এল মুসা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল টেবিলের পাশে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর ভাবনায় মগ্ন। চিমটি কাটে কেন জিজ্ঞেস করেছে মুসা। কিশোরের জবাব, এতে নাকি তার একাগ্রতা আনতে সুবিধে হয়।

'বাক্সটা ওয়েইট্রেসের কাছে রেখে যাব,' রবিন বলল। 'ব্লিংকি শিওর ফিরে আসবে। ওটা নিতে।'

মুসাও তার কথায় সায় দিল।

কিন্তু কিশোর চুপ। চিমটি কেটেই চলেছে। সবুজ ভ্যান দেখে স্লেটারের অস্বাভাবিক উত্তেজনা কৌতূহলী করে তুলছে তাকে। তার সদা-সন্দিহান মন সব প্রশ্নের জবাব খোঁজে, জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হয় না।

'আমি বলি কি, বাক্সটা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যাক,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর, তার ধারণা আরেকটা রোমাঞ্চকর জটিল রহস্যের সন্ধান মিলতে যাচ্ছে। 'যত্ন করে রেখে দেব। ব্লিংকি যোগাযোগ করবেই। ওর কাছে আমাদের ফোন নম্বর আছে।' প্রতিবাদ করার জন্যে মুসা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'তাছাড়া ওয়েইট্রেসের কাছে বাক্সটা ফেলে যায়নি ব্লিংকি, তাই না? আমাদের কাছে রেখে গেছে। আমাদের বিশ্বাস করেছে?'

'বিশ্বাস না ছাই,' বাধা দিলই মুসা। 'ভুলে ফেলে গেছে।' বলল বটে, কিন্তু জানে সে, কোন লাভ হবে না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, বাক্সটা নিয়ে যাবেই।

আধ ঘণ্টা পর, হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে ওদের হেডকোয়ার্টার। অনেক দিন আগে পুরানো মাল হিসেবে কিনে এনেছিলেন ওটা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। এতই বাতিল, বিক্রি করতে পারেননি। জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে গেছে এখন পুরোপুরি। ওটাকেই মেরামত করে ঠিকঠাক করে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিশোর, বেরোনো আর ঢোকার জন্যে কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু ওরাই।

ট্রেলারের ভেতরে সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা অফিস আছে, চেয়ার-টেবিল-ফাইলিং কেবিনেট, সবই আছে তাতে। ডেস্কের ওপর রয়েছে টেলিফোন। ছোট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি, আর ফটোগ্রাফিক ডার্করুমও রয়েছে ট্রেলারে।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে বাক্সটা এনেছে মুসা, অফিসে ঢুকে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর। 'নিয়ে তো এলাম অন্যের জিনিস,' খুশি হতে পারছে না সে। 'কি করবে এখন? খুলে দেখবে?'

ডেস্কের ওপাশে তার সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। মাথা নাড়ল। 'সেটা বোধহয় উচিত হবে না...' থেমে গেল। কুঁচকে গেছে ভুরু। কাত হয়ে কান ঠেকাল অয়েলপেপারে মোড়া বাক্সটার গায়ে।

শুনতে পাচ্ছে তিনজনেই। বাক্সের ভেতর মৃদু ফড়ফড় শব্দ। জীবন্ত কিছু একটা রয়েছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'আর ফেলে রাখা গেল না। খুলতেই হচ্ছে।'

জন্তু-জানোয়ারের ভক্ত মুসা। আগে প্রায়ই রাস্তা থেকে ভবঘুরে কুকুর-বেড়াল ধরে নিয়ে আসত পোষার জন্যে। একদিন তো কোথা জানি একটা রোমওঠা, রোগা, বেতো গাধাই ধরে নিয়ে এসেছিল। মুসার মা তার ঠিক উল্টো, দুচোখে দেখতে পারে না জন্তু-জানোয়ার। কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সহ্য করেছেন তিনি, কিন্তু গাধাটাকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়িয়েছেন, দু-এক ঘা মুসার পিঠেও পড়েছে। এখন বাক্সের ভেতরে নড়াচড়া শুনে তার পুরানো ভালবাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো পোষার মত কিছু পাওয়া যাবে, এমন কিছু যাতে মা আপত্তি করবেন না।

ফড়াত করে এক টানে বাক্সের কোণের চীজক্লথ ছিঁড়ে ফেলল মুসা। খানিকটা তারের জাল দেখা গেল। পুরো কাগজটাই ছাড়িয়ে নিল সে। জালের খাঁচার

ভেতরে একটা কবুতর।

খুব সুন্দর একটা পাখি। ফুলে থাকা পালক, হাত পাখার মত ছড়ানো লেজ। গাঢ় ধূসর পালকগুলো এত চকচকে, আলাদা একটা উজ্জ্বল বেগুনী আভা ছড়াচ্ছে।

কিশোরই প্রথম লক্ষ করল খুঁতটা, পাখিটার একটা আঙুল নেই। ডান পায়ে তিনটেই আছে, কিন্তু বাঁ পায়ে দুটো।

'এত ছোট খাঁচায় রাখা যাবে না,' বলল মুসা। 'যদি রাখতেই হয়, রেখেই দিই কি বলো? হ্যাঁ, তাহলে বড় আরেকটা খাঁচা বানিয়ে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'চার বাই দুই ফুট ছ-টা জাল লাগবে। কিছু তার কাঁটা, একটা হাতুরি। তক্তা লাগবে কয়েকটা।'

ইয়ার্ডেই পাওয়া গেল সব। পুরানো মালের ডিপো, এসব জিনিসের অভাব নেই। তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে কাজ চলল। কবুতরটার জন্যে আরামদায়ক শক্ত একটা খাঁচা বানিয়ে ফেলল ওরা দেখতে দেখতে।

অফিস থেকে পাখিটাকে নিয়ে এল মুসা। একটা প্লাসটিকের বাকেটে কিছু গমের দানা রেখে খাঁচার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। পানির বন্দোবস্ত করল রবিন।

ছোট খাঁচা থেকে বের করে বড় খাঁচায় কবুতরটাকে ঢুকিয়ে দিল মুসা। 'যাও, আরাম করে থাকো।'

বেশ সুখী মনে হলো পাখিটাকে। গমের দানা ঠুকরে খেলো কিছুক্ষণ, পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে ঝটকা দিয়ে ওপরের দিকে তুলে তুলে পানি খেতে লাগল। বার দুই বাগবাকুম করে খাঁচার কোণায় গিয়ে পাখার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বসে পড়ল। তার জন্যে দিন শেষ, ঘুমানোর সময়।

পাখিটাকে ওয়ার্কশপেই রেখে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। সাইকেল নিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন, কিশোর চলে গেল তার ঘরের দিকে।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল কিশোর। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে চলে এল ওয়ার্কশপে।

দানা খাচ্ছে কবুতরটা, ভাবেসাবে মনে হয়, রাতে কোন অসুবিধে হয়নি।

বসে পড়ে খাঁচার তারে নাক ঠেকাল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, 'কোথা থেকে এসেছ? ওই বাক্সে ভরে রেখেছিল কেন তোমাকে ব্লিংকি? এত নার্ভাস দেখাচ্ছিল কেন তাকে?'

কবুতরটাকে ঘিরে কোন একটা ঘোর রহস্য রয়েছে। কি, সেটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে ব্যাপারটা চোখে পড়ল কিশোরের। রহস্যটা আরও ঘনীভূত হলো।

পাখিটার দুই পায়েই এখন তিনটে করে আঙুল।

দুই

'ওটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার,' বলল রবিন। 'মানে, ওই দুটোই।'

নতুন কবুতরটা দেখার পরই গিয়ে দুই সহকারীকে ফোন করেছে কিশোর।

কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় লাঞ্চের পরে ছাড়া আলোচনায় বসতে পারল না ওরা।

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন, সকালে ওখানেই গিয়েছিল। ছুটির পর একটা বই খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে। বই খুলে বেলজিয়ান রেসিং হোমারের রঙিন একটা ছবি দেখাল সে।

ছবিটা দেখল কিশোর। তার সামনে ডেস্কের ওপরই রয়েছে ছোট খাঁচায় ভরা নতুন কবুতরটা, ওটার সঙ্গে ছবি মিলিয়ে দেখল।

'ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল সে। 'দুটো পাখিই দেখতে অবিকল এক। শুধু যেটা হারিয়েছে, সেটার এক পায়ে আঙুল ছিল দুটো। দুটোই রেসিং হোমার,' বইটা রবিনের দিকে ঠেলে দিল কিশোর।

খাঁচার ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল মুসা, পাখিটার পালকে আঙুল বোলাল।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো কবুতরের, ঘাড় কাত করে উজ্জ্বল চোখে তাকাল সে, সহকারী গোয়েন্দার দিকে।

'এখানে প্রায়ই ওরকম ঘটে,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'খেয়াল করোনি? সৈকতের আশেপাশে অনেক বুনো পায়রা দেখেছি, দু-একটা করে আঙুল খোয়া গেছে।'

আনমনে মাথা নোয়াল গোয়েন্দাপ্রধান। খেয়াল করেছে কি করেনি বোঝা গেল না এই ভঙ্গি থেকে। 'ইঁদুর ধরার কল দিয়ে পাখি ধরতে চেষ্টা করে হয়তো লোকে, বেচারা পায়রাগুলোর আঙুল কাটে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু এগুলোর নাম বেলজিয়ান হোমার হলো কেন?'

কবুতরের বই থেকে মুখ তুলল রবিন। 'ওরা খুব ভাল উড়তে পারে। জন্মায়ই যেন ওড়ার জন্যে, রেসের ঘোড়া যেমন দৌড়ানোর জন্যে জন্মায়। ঘোড়া বিশেষজ্ঞের মত কবুতর বিশেষজ্ঞও আছে, শত শত পাখির মধ্যে থেকেও আসল পাখিটা ঠিক চিনে বের করে ফেলে।' বইয়ের একটা বিশেষ পাতা ঝুড়িতে কিংবা খাঁচায় ভরে—অনেক সময় খাঁচার চারদিকে ঢেকে—নিয়ে যায় ওদেরকে লোকে। পাঁচ-ছয় শো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়, পথ চিনে ঠিক বাড়ি ফিরে আসে পাখিগুলো। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে উড়তে পারে, একটাও পথ হারায় না।'

আবার বইয়ের দিকে তাকাল সে। 'বেলজিয়ামের জাতীয় খেলা এই কবুতর ওড়ানো। একবার করেছিল কি, একটা রেসিং হোমারকে ঢাকনাওয়ালা ঝুড়িতে ভরে জাহাজের অন্ধকার খোলে করে ইন্দো চায়নায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাত হাজার মাইল পেরিয়ে, চব্বিশ দিন পর দেশে ফিরে এসেছিল ওটা, বেলজিয়ামে। পুরাটাই তার জন্যে অচেনা পথ ছিল।'

'হুঁ,' বিড় বিড় করল কিশোর।

'দেখি,' বইটা নিয়ে মিনিটখানেক পড়ল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'খাইছে, খবর আনা-নেয়ার কাজও দেখছি করে কবুতর। জানতাম না তো। ঐতিহাসিক ব্যাপার-স্যাপার। গল জয় করার সময় সীজার কবুতর ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকান আর্মি বহু বছর ধরে কবুতর কাজে লাগিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে, কোরিয়ার

যুদ্ধেও নাকি কবুতর ব্যবহার হয়েছিল। কাণ্ড! নিয়মিত কবুতর ডাক বিভাগ নাকি ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস আর ক্যাটালিনা দ্বীপের মাঝে। কিশোর, তুমি জানো এসব?'

জবাব দিল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কিভাবে? এবং কেন?'

'বই বলছে, কেউই সঠিক জানে না, কিভাবে পথ চিনে বাড়ি ফেরে ওরা,' মুসার হাত থেকে বইটা নিল রবিন। 'ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের চাপের ওপর নির্ভর করে কবুতর।'

বাতাসের চাপের তারতম্য নিখুঁতভাবে বুঝতে পারে, আর শ্রবণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ওদের। তবে এ-সবই অনুমান। এই যে, এখানে একজন প্রফেসর বলেছেন ঃ পায়রা পথ চিনে কিভাবে বাড়ি ফেরে জানতে হলে ঠিক ওদের মতই হতে হবে আমাদের, ওদের মত অনুভব করতে হবে, ওদের মত করে ভাবতে হবে।'

বন্দি থাকতে পাখিটার কেমন লাগছে, কি ভাবছে এখন, অনুমানের চেষ্টা করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিভাবে ওরা বাড়ি ফেরে আমি জানতে চাইনি। আমার প্রশ্ন, এই পাখিটা কি করে খাঁচায় এল, আর দু-আঙুলেটাই বা গেল কোথায়? রাতের বেলা এই বদলটা কে করেছে? কি করে জানল, দু-আঙুলেটা কোথায় আছে? আর কেনই বা এই কাজ করল সে?'

'আমার দিকে চেও না,' হাত নাড়ল মুসা, 'কিচ্ছু বলতে পারব না।' টোকা দিয়ে পায়রাটাকে আবার আদর করল সে। মৃদু বাগবাকুম করে পালক ফুলিয়ে তার আদরের জবাব দিল পাখিটা, মনিব আদর করলে কুকুর আর বেড়াল যেমন করে অনেকটা তেমনি। 'একটা নাম দেয়া দরকার। কি রাখা যায়, বলত? টম?'

'এক নম্বর,' মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, 'ব্লিংকি নিজেই পাখিটাকে সরিয়েছে। আমাদের কার্ড আছে ওর কাছে। রকি বীচে আমরা পরিচিত। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে কিশোর পাশা কোথায় থাকে।'

'হ্যাঁ, তা দেবে,' মুসা মাথা দোলাল।

'নাম্বার টু,' কথা অব্যাহত রাখল কিশোর, 'ব্লিংকি যাকে অনুসরণ করেছে, সেই সবুজ ভ্যানওয়ালাও এ-কাজ করতে পারে। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে ঘাপটি মেরে ছিল, মুসার সাইকেলে বাক্সটা দেখে পিছু নিয়ে আমাদের জায়গা চিনে গেছে। তবে এটা ঠিক মেনে নেয়া যায় না। সাইকেলের পেছনে এলে দেখতে পেতাম। তবুও,' গম্ভীর হয়ে তাকাল পাখিটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। 'ব্লিংকি আর তার সবুজ গাড়িটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। 'ব্লিংকি আর তার সবুজ গাড়িঅলা সঙ্গীর সম্পর্কেও কিছু জানি না আমরা। ব্লিংকির ঠিকানা জানি না, শুধু জানি, সান্তা মনিকায় কোথায় থাকে। গাড়ির নাম্বার প্লেটে এমও কে লেখা দেখেছি, এত তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল, নম্বরটা পড়তে পারিনি। সবুজ ভ্যানের প্লেটে কাদা লেগে ছিল, পড়া যাচ্ছিল না। কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে, একটা ব্যাপার বাদে।'

'কী?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা।

'পায়রা। সাধারণ কবুতর নয়। খুব সাবধানে যত্ন করে বড় করা, নিখুঁত ট্রেনিং দেয়া রেসিং হোমার। রেসের ঘোড়ার মত এসব নিয়ে যেসব লোক মাথা ঘামায় তাদের একজন আরেকজনকে চেনার কথা। সম্ভাবনাটা খুবই জোরাল। নিশ্চয় কোন ক্লাব বা সংগঠন রয়েছে যেখানে মিলিত হয় ওরা,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে টেলিফোন গাইড টেনে নিল। 'ওই কবুতর পোষে কিংবা ট্রেনিং দেয় এমন কারও খোঁজ পেলে পাখিটা দেখানোও যাবে। চেনে কিনা জানা যাবে...'

'পাখি পাখি করছ কেন?' প্রতিবাদ করল মুসা। 'নাম বললেই হয়। টম নামটা মন্দ কি?'

'হয়তো বলতে পারবে কে এটার মালিক।' হলদে রঙের পাতাগুলো দ্রুত উল্টে চলল কিশোর, সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে গেল, 'পি ফর পিজিয়ন···এ ফর অ্যাসোসিয়েশন···সি ফর ক্লাব।' তারপর প্রায় মিনিটখানেক নীরব রইল মুখ, আঙুলগুলো কাজ করেই গেল, তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল পাতার পর পাতা। অবশেষে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'নাহ্ কিচ্ছু নেই। শুধু পি ফর পেট শপ, পোষা পশুপাখির দোকান,' শেষ তিনটে শব্দ বাংলায় বলল।

'কিংবা মিস কারমাইকেল,' রবিন যোগ করল।

গাইড থেকে চোখ তুলল কিশোর। 'এই মিস কারমাইকেলটা কে?'

'প্রায়ই আমাদের লাইব্রেরিতে আসেন। বই যা নেন, সব পাখি সম্পর্কে লেখা। পাখি বলতে পাগল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, একটা পাখি-সংগঠনের প্রেসিডেন্ট তিনি।'

গাইড বুকটা বন্ধ করে কেবিনেটে রেখে দিল কিশোর। 'তাহলে তাঁকে গিয়ে ধরতে হয়। কবুতর বিশেষজ্ঞ কেউ আছে কিনা হয়তো তিনি জানবেন। মহিলার ঠিকানা জানো?'

'না,' গাল চুলকাল রবিন। 'তবে রকি বীচেই থাকেন, নইলে এখানকার লাইব্রেরিতে আসতেন না। পুরো নামটা অবশ্য জানি, লাইব্রেরি কার্ডে দেখেছি। কোরিন কারমাইকেল।'

নামটা গাইড বুকে সহজেই খুঁজে পেল কিশোর। হ্যাঁ, রকি বীচেই থাকেন মহিলা, মাইল দুয়েক দূরে, অ্যালটো ড্রাইভে।

'সাইকেল নিয়েই যেতে পারি,' মুসা বলল। 'কিন্তু টমকে কি করব?'

'কি টম টম করছ?' বলল কিশোর। 'কবুতরের আর কোন নাম খুঁজে পেলে না।'

'কেন মন্দ কি? মানুষের নাম টম, কুকুর-বেড়াল-ছাগল-শুয়োর-ঘোড়া সব কিছুর নামই যদি টম হতে পারে, কবুতরের বেলায় অসুবিধে কি?'

'হুঁ,' মুসার *অকাট্য* যুক্তির পর আর তর্ক করল না কিশোর। কিন্তু কবুতরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাল।

'কোথায় রেখে যাব তাহলে?' বলল মুসা।

'এখানেই···'

'খুব কষ্ট পাবে। তারচে বাইরের বড় খাঁচাটায়···'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'চুরির ভয় আছে। গত রাতের কথা ভুলে গেছ?'

'তাহলে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মুসার পক্ষ নিল রবিন। 'নইলে ফিরে এসে হয়তো দেখব তিন আঙুলের জায়গায় চার আঙুলওলা আরেকটা পায়রা বসে আছে।'

ভোটে হেরে যাচ্ছে কিশোর, কি ভেবে রাজি হয়ে গেল সঙ্গে নিতে।

দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে খাঁচাটা নিয়ে নামল মুসা। তার পেছনে রবিন।

নামার জন্যে এগিয়েও থমকে গেল কিশোর, ভ্রুকুটি করে ফিরল। ডেস্কের কাছে এসে তার নতুন আবিষ্কার ফোন-এলে-জবাব-দেয়ার মেশিনটার সুইচ অন করে দিল। তারপর এসে নামল দুই সুড়ঙ্গে।

রকি বীচের পুব প্রান্তে অ্যালটো ড্রাইভ। ধনী মানুষের পাড়া। অনেক জায়গা নিয়ে বিশাল সব বাড়ি। রাস্তার ধারে গেট, গেটের পরে একরের পর একর জুড়ে বাগান, লন আর গাছপালার পরে রয়েছে বাড়িগুলো, কোনটা আংশিক চোখে পড়ে, কোনটা গাছের জঙ্গলের ওপাশে একেবারেই অদৃশ্য।

লোহার মস্ত এক সদর দরজার সামনে সাইকেল থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। গেটের পাশে কংক্রিটের থামে বসানো শ্বেত পাথরের ডিম্বাকৃতি ফলক, তাতে কুচকুচে কালো হরফে লেখা রয়েছে ঃ মিউজিক নেস্ট।

'এটাই,' বলল কিশোর।

আরেক পাশের থামে খোপ কেটে তাতে ইনটারকম সিসটেম বসান হয়েছে। সুইচ টিপে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়াল কিশোর জবাব দেয়ার জন্যে। কিছুই শোনা গেল না। আবার সুইচ টিপে যন্ত্রটায় কান ঠেকাল সে।

জবাব এলেও কথা বোঝা যাবে কিনা সন্দেহ। মিউজিক নেস্টের আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যে হারে কলরব আর হই চই। চেঁচিয়ে কথা বলেও একে অন্যের কথা ঠিকমত শুনতে পাবে না।

অবস্থা অনেকটা বড় সড় ইলেকট্রনিক মার্কেটের মত। পুরো ভলিয়ুমে বাজানো রেডিও আর টেপ-রেকর্ডারের মিউজিকের শব্দে ওখানে যেমন টেকা দায়, এখানেও তেমনি অবস্থা। তফাত শুধু মার্কেটে মানুষের কণ্ঠ আর নানারকম বাদ্যযন্ত্রের বাজনা, এখানে পাখির কলরব। শিস, কিচির-মিচির, তীক্ষ্ণ একঘেয়ে চিৎকার, কা-কা, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড।

আবার সুইচ টিপল কিশোর। জবাবে কিছু একটা শোনাও গেল, কিন্তু বোঝা গেল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ ডাক ছেড়ে আকাশে উড়ল একঝাঁক টিয়ে।

ইনটারকমের কাছ থেকে সরে এল কিশোর, বিরক্ত চোখে তাকাল গাছপালার মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে। গাছের ডালে অসংখ্য কাকাতুয়া, উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর নীলের মাঝে গাছের ঘন সবুজ পাতাও ফেকাসে দেখাচ্ছে। টিয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কণ্ঠস্বর আরও উঁচু পর্দায় তুলে দিল কাকাতুয়ার দল।

'পাখি!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'পুরো এলাকাটা পাখিতে...' শেষ শব্দটা বোঝা

গেল না, টিয়েগুলো সমস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠেছে।

'ভরা,' মুসার চেয়েও জোরে বলল কিশোর। শুধু কাকাতুয়া আর টিয়েই নয়, স্টারলিং, ক্যানারি, লার্ক, চড়ুই, কাক, চিল, শকুন, বাজ, দোয়েল, বুলবুল, কোন পাখিরই অভাব নেই এখানে। ডালে বসে চেঁচাচ্ছে কেউ, কেউ লাফালাফি করছে, কেউ এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যাচ্ছে ফুরুত করে, কেউ বা আবার মহা গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজল কিশোর। গেটের পাল্লায় শুধু খিল লাগানো, তালা-টালা নেই। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে খিল তুলে ফেলল। পাহারাদার কেউ আছে কিনা তাকিয়ে দেখল এপাশ-ওপাশ। নির্জন। সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে।

অন্য দুজনও ঢুকল। পাল্লা ঠেলে লাগিয়ে আবার জায়গা মত খিলটা তুলে দিল মুসা। 'এবার কি?' কিশোরের কানে মুখ ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

গাছপালার ভেতরে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া গাড়িচলা পথটা দেখাল কিশোর, সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল।

এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। কলরব সামান্যতম কমেনি, বরং বাড়ছে বলে মনে হলো ওদের। ওই প্রচণ্ড শব্দ বেশিক্ষণ আর সইতে পারল না রবিন, হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কান ঢাকল, শুধু পা আর কোমরের সাহায্যে ব্যালান্স করে সাইকেল চালাচ্ছে।

আগে আগে ছিল কিশোর, হঠাৎ থেমে গেল। গাছগাছালি আর পঙ্গপালের মত পাখির ঝাঁকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা বিশাল বাড়ির খানিকটা চোখে পড়ছে। কিন্তু বাড়ি দেখে থমকায়নি সে, অন্য কারণ।

পাখির কলকাকলী ভেদ করে কানে আসছে আরেকটা কণ্ঠ, মহিলা কণ্ঠের গান; তীক্ষ্ণ, উঁচু পর্দা, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। নরম গলায় গাইলে আর এত সব কোলাহল না থাকলে বেশ মিষ্টিই শোনাবে।

আরেকটু আগে বাড়ল ওরা।

আবার গান গাইল মহিলা, কথাগুলো বোঝা গেল এবার ঃ তিনটে ছেলে ড্রাইভওয়েতে, কি চাই ওদের, কি চাই।

সুরটা পরিচিত মনে হলো রবিনের। ও, মনে পড়েছে। দি ব্যাট্‌ল হাইম অভ দা রিপাবলিক।

'আসছে ওরা আরও কাছে,' গেয়েই চলেছেন মহিলা, 'আসছে ওরা আসছে গো। ভয় পেয়ো না মিষ্টি পাখি, ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীরা। হয়তো ওরা কোনই ক্ষতি করবে না-কো তোমাদের।'

সাইকেল থেকে নেমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল তিন কিশোর।

গাছের জঙ্গল আর বাড়ির মাঝের ছড়ানো লনে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়েসী মহিলা। সাধারণের চেয়ে বেশিই লম্বা। গরমকালের ঢোলা হালকা পোশাক পরনে। মাথায় নরম হ্যাট, চওড়া কানা। গোলগাল বেশ সুন্দর চেহারা।

তাঁর কাঁধে বসে আছে একটা তোতা, হ্যাটের চাঁদিতে শুয়ে ঝিমাচ্ছে একটা

ক্যানারি। আর ঠিক মাথার ওপরে শূন্যে ফড়ফড় করে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বাজ, বসার সুবিধেমত জায়গা খুঁজছে।

'কথা কিছু থাকলে বলার, বলো শুনি গান গেয়ে,' তিন গোয়েন্দা একেবারে কাছে চলে এল বললেন মহিলা। 'দরাজ গলায় গাইবে গান, নইলে কানে ঢুকবে না, কিছুই কানে ঢুকবে না।'

পাগলের পাল্লায় পড়েছে, কোন সন্দেহ নেই মুসার, জরুরী অবস্থায় পালানোর জন্যে তৈরি হয়ে রইল। রবিন চুপ। বার বার তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে।

কিশোর বুঝল, জবাব তাকেই দিতে হবে। খুব ভাল অভিনেতা সে, শিশুকালেই টেলিভিশনে অভিনয় করে অনেক সুনাম-কুড়িয়েছে, কিন্তু গানের ব্যাপারে সে আনাড়ি। কখনও গলা সেধে দেখেনি। এমনকি বাথরুমেও কখনও গুনগুন করেছে কিনা মনে পড়ে না। সমস্যায় পড়ে গেল। মনে মনে গুছিয়ে নিল শব্দগুলো কবিতার মত করে, তারপর হেঁড়ে গলায় গান ধরল ঃ মিস কোরিনকে খুঁজি মোরা, পাখির যিনি বিশারদ; আপনি কি সেই···আপনি কি সেই···ইয়ে মানে··· ইয়ে···তাল ছন্দ কথা সব হারিয়ে তোতলাতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান।

হা-হা করে হেসে উঠেই রবিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে আঁউক করে থেমে গেল মুসা। বোধহয় শুনতে পাননি মহিলা, তাই ফিরে তাকালেন না। কিশোরের কথার জবাব দিলেন 'আমিই সেই মিস কোরিন, খুঁজছ যাকে তোমরা।'

আবার কিশোরের পালা। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল মিস কারমাইকেলের দিকে। সুর করে বলল, 'অনুপ্রবেশ করেছি বলে আমরা সবাই দুঃখিত।' দি ব্যাটল হাইম অভ দ্য রিপাবলিক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। 'কিন্তু কোন ছিল না উপায়···' থেমে গেল সে। না, কথা আটকে যায়নি, তার প্রতি মনোযোগ হারিয়েছেন মহিলা, চেয়ে রয়েছেন মুসার হাতের খাঁচাটার দিকে।

হাসলেন মিস কারমাইকেল, আন্তরিক হাসি, নেচে নেচে এগোলেন মুসার দিকে।

এক লাফে পিছিয়ে গেল মুসা। দ্রুত একবার তাকাল দু-পাশে। কোনদিকে দৌড় দিলে সুবিধে হবে আন্দাজ করল।

কিন্তু দৌড় দিতে হলো না। তার আগেই গান গেয়ে উঠলেন মহিলা, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, কি চমৎকার দেখিতে। টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিং।' বলেই কবুতরের গলা নকল করে বাগবাকুম করে উঠলেন।

ছোঁ মেরে মুসার হাত থেকে খাঁচাটা ছিনিয়ে নিলেন মিস কারমাইকেল। বুকে জড়িয়ে ধরে আবার গাইলেন, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, দেব ওদের পুরস্কার। টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা···'

তিন

'কি পুরস্কার···' গেয়ে উঠে আবার থেমে গেল কিশোর, তার দিকে খেয়ালই নেই

মহিলার, খাঁচার দরজা খুলছেন।

'প্লীজ,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'প্লীজ, খুলবেন না।' তারপর যথাসম্ভব ভদ্রভাবে মিস কারমাইকেলের হাত থেকে নিয়ে নিল খাঁচাটা। বলল, 'মনে কিছু করবেন না, এটা আমাদের পায়রা না।'

এরপর কি বলবে? মনে মনে ছন্দ সাজাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল কিশোর। ব্যাখ্যা করে বোঝানো এক কথা, আর সেটা গান গেয়ে শোনানো, তা-ও আবার ব্যাট্‌ল্ হাইমসের সুর, নাহ, অসম্ভব। পারবে না। জোরে জোরে চেঁচিয়ে এমননিতেই গলা-মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ এই অবস্থা চালালে কথাই বলতে পারবে না শেষে।

ব্যাট্‌ল্ অভ হাইমসের ধার দিয়েও আর গেল না কিশোর, কিছু মনে করলে করুনগে মহিলা, সে না পারলে কি করবে? নিজেই একটা বেসুরো সুর বানিয়ে নিয়ে চেঁচাল, 'এখানে আর পারছি না, আর কোথাও চলুন না। অনেক কথা বলার আছে, দয়া করে শুনবেন কি?'

গলায় ঝোলানো তিননরী মুক্তার হারটায় আঙুল বোলাচ্ছেন মহিলা, ছেলেদের দেখছেন। কিশোর ওভাবে খাঁচাটা নিয়ে নেয়ায় মনে আঘাত পেয়েছেন তিনি, তবে প্রকাশ করছেন না।

কিশোরের কথায় মাথা ঝাঁকালেন, ইঙ্গিত করলেন বাড়ির দিকে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল বাজ পাখিটা, কাঁধে বসার আর সুযোগ হবে না বুঝে গিয়ে বসল একটা ডালে। কাঁধের তোতাটা তেমনি বসে আছে, হ্যাটে বসা ক্যানারি ঝিমাচ্ছে আগের মতই।

মিস কারমাইকেলকে অনুসরণ করে বড় একটা জানালা গলে একটা ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। বিরাট বসার ঘর, প্রচুর আলো। আরও কয়েকটা জানালা রয়েছে, তবে সবগুলোই পুরু কাচে ঢাকা।

খোলা জানালার কাচের পাল্লা বন্ধ করে দিলেন মিস কারমাইকেল। বাইরের কোলাহল তাতে কিছুটা কমল। দেয়ালে বসানো একটা বোতাম টিপলেন। জানালার ফ্রেমের ওপরের একটা খাঁজ থেকে নেমে এল পুরু কাচের পর্দা, ফ্রেমের নিচের দিকের খাঁজে শক্ত হয়ে বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কোলাহল, নীরব হয়ে গেল ঘর।

চমৎকার ব্যবস্থা, ভাবল মুসা, একেবারে সাগরের তলার নীরবতা। স্কুবা ডাইভিঙের সময় এই নীরবতা খুব লাগে তার, খুব উপভোগ করে। প্রচণ্ড শব্দের পর এই হঠাৎ নীরবতায় হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা।

'পায়রাটাকে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন মিস কারমাইকেল, কিশোরের দিকে চেয়ে।

কিশোর বুঝল, বাইরে পাখিদের সঙ্গে একাত্মতা রক্ষার জন্যেই গানের মত করে কথা বলেন তিনি।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বললেন মিস কারমাইকেল, 'আমি ভেবেছিলাম ওটাকে এখানে ছেড়ে দেয়ার জন্যে এনেছ। হ্যাণ্ডবিল ছেড়েছি আমি, পত্রিকায়

ঘোষণা দিয়েছি, কেউ খাঁচায় বন্দি কোন পাখি এনে এখানে ছাড়লে প্রতিটা পাখির জন্যে বিশ ডলার করে পুরস্কার দেব। বন্দি পাখি দেখলে বড় কষ্ট হয় আমার। এ ভারি নিষ্ঠুরতা।'

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল যেন তাঁর কাঁধে বসা তোতাটা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

পুরস্কারের ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো ছেলেদের কাছে।

কিশোর জানাল মিস কারমাইকেলকে, কবুতরটা তাদের নয়। কিভাবে কোথায় পাওয়া গেছে, খুলে বলল। এখন পাখিটাকে তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে চায়।

মিস কারমাইকেলের সঙ্গে কোন একজন অভিনেত্রীর অনেক মিল আছে, ভাবছে রবিন, নামটা মনে করতে পারছে না।

কিশোরের কথা শেষ হলে মুখ খুলল মুসা, 'আসল মালিকের কাছে টমকে ফিরিয়ে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, ছেড়েই রাখা হবে ওকে।'

'টম?' গলার মুক্তোর হারে আঙুল বোলাচ্ছেন মিস কারমাইকেল। 'এটা কি রকম নাম হলো? না না, পাখির এমন নাম হওয়া উচিত না। তার চেয়ে অন্য কিছু রাখো, এই যেমন কোন ধাতু কিংবা মূল্যবান পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে। ওটার পালক নীলচে তো…এক কাজ করো, কোবাল্ট রাখো…'

'দূর!' নাক কোঁচকাল মুসা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' একটা বিচ্ছিরি কিছু না ঘটে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল রবিন, 'নাম একটা হলেই হলো। কোবাল্ট নামটাও খারাপ না। কি বলো কিশোর?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর। 'ম্যাডাম, রবিনের কাছে শুনলাম,' রবিনকে দেখাল সে, 'লাইব্রেরিতে নাকি পাখি নিয়ে ওর সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে। ভাবলাম, আপনার কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে, তাই ছুটে এসেছি। রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয় এমন কাউকে চেনেন?'

জবাব দিলেন না মিস কারমাইকেল। ছেলেদের পেছনে জানালার দিকে নজর। 'এক মিনিট,' বলেই এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে জানালার কাচের পর্দা উঠিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল যেন প্রচণ্ড কোলাহল।

জানালার পাল্লা খুললেন তিনি। পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পাখি। একটা দোয়েল। জানালা খুলতেই উড়ে এসে বসল চৌকাঠে।

পাখিটার ঠোঁট থেকে কি একটা জিনিস নিলেন মিস কারমাইকেল।

'আহা, কি বুদ্ধিমান বন্ধু আমার,' গান গেয়ে উঠলেন তিনি। 'তাই তো ওকে ডাকি হীরা।'

পাখিটা উড়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

আবার জানালা বন্ধ করে কাচের পর্দা নামিয়ে দিলেন মিস কারমাইকেল। ছেলেদের কাছে এসে বললেন, 'চুরি করা দোয়েল পাখির স্বভাব। তবে আমার পাখি দুটো এমন নয়। হীরা তো খাঁটি হীরা, অন্য দোয়েলটাও ভাল। চুরিদারি একদম করে না, তবে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে হীরার সেটা কুড়িয়ে নেয়া চাই-ই। কত সুন্দর

সুন্দর জিনিস যে সে এন দেয় আমাকে। এই দেখো।'

মাংসল সাদা হাতের মুঠো খুলে দেখালেন তিনি হীরা কি এনেছে।

মস্ত একটা মুক্তো, ঝকমক করছে।

'এই নিয়ে তিনটা হলো,' বললেন তিনি, 'এক মাসে তিনটা মুক্তো এনেছে। কোথায় পায় কে জানে। মুক্তো আমি খুব ভালবাসি। পাখি আর মুক্তো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আবার আগের কথা তুলল কিশোর। 'রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয়…'

মাথা নাড়লেন মিস কারমাইকেল। 'না, তেমন কারও কথা মনে পড়ছে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি মনে পড়ে…' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করে জানালে খুব খুশি হব।'

কার্ডটা ধরলেন মিস কারমাইকেল, কিন্তু পড়তে পারলেন না। তার আগেই ডাইভ দিয়ে নেমে এল তোতা, কার্ডটা ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে বসল আবার আগের জায়গায়।

'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, থ্যাংকিউ,' বলল কিশোর। মহিলাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে সে। তবে যে কাজে এসেছিল, তার কিছুই হয়নি, কোন রকম সাহায্য হলো না। সাউণ্ডপ্রুফ এই ঘরটাকে এখন একটা খাঁচা মনে হচ্ছে তার, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

জানালার কাচের পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে দিলেন মিস কারমাইকেল। একে একে বেরিয়ে এল ছেলেরা মহাকোলাহলের মধ্যে। একবার ফিরে তাকাল কিশোর, তাদের দিকে নজর নেই মহিলার। হাতের মুক্তোটা দেখছেন, মুখে হাসি।

ড্রাইভওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এখানে কথা বলার চেষ্টা বৃথা। দূরে গিয়ে তারপর যা বলার বলবে, ভাবল কিশোর। পাখির কলরব কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে, অসহ্য লাগছে তার।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে থেমে গেল কিশোর। প্রথমে ভেবে ছিল পাখির ডাক, কি ভেবে ফিরে তাকাল বাড়ির দিকে। পাখি নয়, বাজ পাখির গলা নকল করে চেঁচিয়ে উঠেছেন মিস কারমাইকেল, কিশোর ফিরে তাকাতেই হাত তুলে ডাকলেন।

'আমার এক বন্ধু আছে,' গাইলেন মিস কারমাইকেল, 'রিচার্ড হ্যারিস নামটি তাহার, বাস করে এই শহরেই; পায়রা পোষার শখ ছিল তার, বলেছে সে একদিন। কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম, কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম।'

'থ্যাংকিউ, মিস কারমাইকেল,' বলল কিশোর। 'রিচার্ড হ্যারিস নামটি আমি আর সহজে ভুলব না,' শেষের কথাগুলো সুর করে বলল।

চার

'রিচার্ড হ্যারিস,' মিউজিক নেস্ট থেকে দূরে মহাসড়কের শান্ত পরিবেশে ফিরে এসে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর, 'মেইন স্ট্রীটের একটা অলঙ্কারের দোকানের নাম।'

পথের ধারে ঘাসের ওপর সাইকেল নিয়ে এল সে, সাইকেল থেকে নামল।

রবিন আর মুসাও নামল।

'শোনো,' মুসা প্রস্তাব দিল, 'এত সব ঝুট ঝামেলা না করে চলো আবার মিস কারমাইকেলের বাড়িতে ফিরে যাই। তার সামনে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিই টমকে। কুড়ি ডলার নিয়ে ফিরে আসব। ছাড়া পেলেই বাড়ি ফিরে যাবে টম, তার বন্ধুদের কাছে। আমাদেরও ঝামেলা শেষ।'

এই আশঙ্কাই করছিল কিশোর। তবে একেবারে মন্দ বলেনি মুসা, অন্তত পাখিটার পক্ষ থেকে ভাবলে সেটা করাই ভাল। কেন খাঁচায় বন্দি রেখে কষ্ট দেয়া? ছাড়া পেলে নিজের ঝাঁকে বন্ধুদের মাঝে ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু এই পায়রাটাই এখন একমাত্র সূত্র রহস্যভেদী কিশোর পাশার কাছে, হাতছাড়া করতে সায় দিচ্ছে না তার মন। চমৎকার একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে, শুরুতেই দেবে সব ভণ্ডুল করে, এটা ভাবতে পারছে না।

হেডকোয়ার্টারে চালু করে দিয়ে আসা জবাব-দেয়ার যন্ত্রটার কথা ভাবল কিশোর। সবুজ গাড়িওয়ালা লোকটা আগের কবুতরটাকে চুরি করে থাকলে, আর সেটা স্লেটারের জানা না থাকলে শিগগিরই ফোন করবে। দু-আঙলাকে ফেরত চাইবে। নিতে আসবে। তখন তার সামনে থাকতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, তিন-আঙলাকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় স্লেটারের। চিনতে পারে কিনা কবুতরটাকে।

'এখুনি ছেড়ে না দিয়ে,' বলল কিশোর, 'আগে রিচার্ড হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করে নিই। যাওয়ার সময় পথেই পড়বে তার দোকান। রবিন, তুমি কি বলো?'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল মুসা, 'তোমরা যখন চাও···হ্যালো, মিস্টার রিচার্ড হ্যারিস, আসিতেছি আমরা।'

রকি বীচের সব চেয়ে দামী অলঙ্কারের দোকান 'রিচার্ড হ্যারিস'—মালিকের নামে নাম। খরিদ্দার আকৃষ্ট করার জন্যে বাইরের শো-কেসে ঘড়ি কিংবা আঙটির মত শস্তা জিনিস নেই। আছে কুচকুচে কালো মখমলে মোড়া ধাতব স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো মুক্তার অনেক দামী একটা হার, আর সেটার দুপাশে বেশ কায়দা করে আটকানো হীরের দুটো ব্রোচ। উজ্জ্বল দিবালোকে ঝলমল করে জ্বলছে, যেন নীরবে ঘোষণা করছে ঃ আমাদের দেখেই অবাক হয়ে গেলেন? ভেতরে এসে দেখুন না, আরও কত কি আছে।

ভেতরে অনেকগুলো কাচের বাক্স সাজানো। ভেতরে দামী দামী সব গহনা।

বড় একটা বাক্সের ওপাশে দাঁড়ানো একজন লোক। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা শরীর, গায়ে কালো কোট, পরনে কড়া ইস্তিরী করা ডোরাকাটা প্যান্ট। সিল্কের টাই আর শক্ত মাড় দেয়া কলারও মনে হচ্ছে আছে পরনে, তবে সেটা দেখা যায় না দাড়ির জন্যে। লম্বা কালো দাড়ি মুখের পুরোটাই প্রায় ঢেকে দিয়েছে, শুধু নাক আর চোখ দেখা যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলের মাঝে খোলা জায়গার মত ঠোঁট দেখা যায়, তবে অস্পষ্ট।

'বলো?' তিন গোয়েন্দাকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল লোকটা।

'মিস্টার রিচার্ড হ্যারিস?' জানতে চাইল কিশোর

'হ্যাঁ।'

কিশোর জানাল, তারা মিস কোরিন কারমাইকেলের বন্ধু। মহিলার নাম শুনেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল হ্যারিসের চোখ।

বলে গেল কিশোর, কারমাইকেলের কাছেই মিস্টার হ্যারিসের নাম শুনেছে ওরা। একটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার নিয়ে এনেছে। দেখে দয়া করে যদি মিস্টার হ্যারিস জানান কবুতরটা কার (যদি অবশ্য চিনতে পারেন) তো সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে কিশোর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আরে না না, কে বলে আমি বিশারদ,' বিনয়ে গলে গেল মিস্টার হ্যারিস। 'একবার কবুতর পোষার শখ হয়েছিল, চেষ্টা করেছিলাম। ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছি। সে অনেক বছর আগের কথা।' মুসার হাতের খাঁচার দিকে তাকাল। 'ওটাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' খাঁচাটা ওপরে তুলল মুসা, হ্যারিসকে ভালমত দেখানোর জন্যে।

মিনিটখানেক নীরবে পাখিটাকে দেখল হ্যারিস, জিজ্ঞেস করল, 'পেলে কোথায়? তোমাদের কাছে এল কি করে?'

'আমাদের বাড়িতে কে জানি ফেলে রেখে গেছে,' স্লেটারের কথা চেপে গেল কিশোর।

'কে?'

'জানি না,' মুসা জবাব দিল। 'সকাল বেলা পেলাম। সে জন্যেই এসেছি আপনার কাছে। ভাবলাম, আপনি হয়তো জানেন…'

মাথা নাড়ল হ্যারিস। 'বেলজিয়ান রেসিং হোমার নয় এটা। মানে, হোমারই, তবে রেসার বলা চলে না। মেয়ে পাখি তো, রেস দেয় না।'

'কিন্তু…' বলতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল রবিন। চুপ হয়ে গেল।

'তাহলে বলতে পারছেন না এটা কার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' আবার মাথা নাড়ল হ্যারিস। মনে হলো, হাসছে।

ঠোঁট পুরোপুরি দেখা যায় না তো, ঠিক বোঝা গেল না। 'সরি, তোমাদের সাহায্য করতে পারলাম না। মিস কারমাইকেলকে আমার সালাম জানিও।'

জানাবে, বলল কিশোর। মূল্যবান সময় নষ্ট করে তাদের কথা শোনার জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল মিস্টার হ্যারিসকে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ফুটপাথে তুলে রাখা সাইকেলগুলো স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল। সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বসিয়ে বাঁধছে মুসা। মোড়ের ওপাশ থেকে বেরোল একটা কালো গাড়ি, ওদের পাশ দিয়ে গেল।

সাইকেলে চড়তে যাচ্ছিল মুসা আর কিশোর, থামাল রবিন। ইশারা করল অলঙ্কারের দোকানের দিকে।

'কি?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'ওই লোকটা,' আবার দোকানের দিকে হাত তুলল রবিন, 'রিচার্ড হ্যারিস। হয় কবুতরের ক-ও জানে না সে, কিংবা মিছে কথা বলেছে।'

'কেন? মিছে বলবে কেন?' মুসা বলল।

'জানি না। সকালে লাইব্রেরি থেকে যে বইটা এনেছি, তাতে লেখা আছে, পুরুষ-মেয়ে নিয়ে কোন কথা নেই, ট্রেনিং পেলে সব হোমারই রেসার হতে পারে। বেশ কয়েকবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেয়ে কবুতর।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ডিনারের সময় হয়ে গেছে। চলো বাড়ি যাই। খাওয়ার পর হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করব।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলাল মুসা, 'আগে খাওয়া, তারপর অন্য সব। কিন্তু এই টমকে যদি রাখতেই হয়...'

'মেয়ে তো,' হেসে বলল রবিন, 'টম আর হয় কি করে? টমনী রাখো।'

'ছেলে হোক মেয়ে হোক, নাম একবার রেখে ফেলেছি, ব্যস। টমই সই। অনেকেই ছেলের নাম রাখে মেয়েদের, মেয়ের নাম ছেলেদের। আমাদের জরজিনা বেগমের কথাই ধরো না, জিনা শুনতে নাকি তার ভাল লাগে না, বলে জর্জ।'

'ঠিক আছে, বাবা টমই, যাও,' হাত তুলল রবিন।

'যা বলছিলাম, টমকে যদি রাখতেই হয়, নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। হেডকোয়ার্টারের ভেতর বড় খাঁচাটা নিয়ে গিয়ে তাতে রাখব। আরামেও থাকবে, নিরাপদও।'

'রেখো,' ফুটপাথ থেকে সাইকেল নামাল কিশোর।

খাওয়ার পর তাদের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা। প্রথমেই কবুতরের বড় খাঁচাটা হেডকোয়ার্টারে ঢোকানোর পালা। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে না। কিন্তু অসুবিধে নেই। আরও অনেক গোপন পথ আছে। মোবাইল হোমের ছাতের স্কাইলাইটের ঢাকনা সরিয়ে সে-পথে ঢোকানো যাবে।

বড় খাঁচাটা নিয়ে জঞ্জালের ওপর দিয়ে উঠে গেল মুসা। অনেক দিন একভাবে পড়ে থেকে থেকে একটার সঙ্গে আরেকটা শক্ত হয়ে আটকে গেছে আলগা জঞ্জাল, মুসার ভারে নড়লও না। কিশোর আর রবিন কবুতর সহ ছোট খাঁচাটা নিয়ে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল। ছাতের ওপর থেকে স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে দড়িতে বেঁধে খাঁচা নামিয়ে দিল মুসা। নিজেও নেমে এল। ভেতর থেকেই আবার লাগিয়ে দিল ঢাকনা।

ছোট খাঁচা থেকে বড় খাঁচায় কবুতর সরানোয় ব্যস্ত হলো মুসা, রবিন তাকে সাহায্য করল। কিশোর এগোল ডেস্কের দিকে। মুখচোখ উজ্জ্বল। ঢুকেই তাকিয়েছে আগে যন্ত্রটার দিকে। সিগন্যাল লাইট জ্বলছে। তারমানে মেসেজ টেপ করেছে যন্ত্রটা।

ব্লিংকি, ভাবল কিশোর। ও-ই ফোন করেছিল। তাহলে সবুজ গাড়িওয়ালাই... ডেস্কে ঘুরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল সে।

'শোনো, শোনো,' টেপটা চালু করে দিয়ে দুই সঙ্গীকে ডাকল সে।

ফিরে তাকাল মুসা আর রবিন।

'সাহায্য!' মহিলা কণ্ঠ। 'সাহায্য চাই। প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে!' কেঁদে ফেলবেন যেন মিস কারমাইকেল। 'খুন! এই মাত্র দেখলাম ওর লাশ...' কান্নায় রুদ্ধ

হয়ে গেল কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত ফোঁপানোর পর আবার শোনা গেল, 'হীরা! হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে। আরও একটা লাশ পেয়েছি। আমার সুন্দর একটা বাজ পাখি। প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে। আমার পাখিগুলোকে খুন করছে কেউ।'

পাঁচ

'তোমাদের কার্ডটা পেয়ে মনে হলো হাতে চাঁদ পেয়েছি,' বললেন মিস কারমাইকেল। 'ওই মুহূর্তে তোমাদের মতই কারও কথা ভাবছিলাম। গোয়েন্দা।'

মেসেজ পাওয়ার পরই সাইকেল নিয়ে মিউজিক নেস্ট-এ চলে এসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস কারমাইকেলের সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে কথা বলছে।

'পুলিশকে জানাইনি,' কাঁধে বসা তোতাটাকে আদর করলেন মিস কারমাইকেল। 'ইতিমধ্যেই বার কয়েক ঝামেলা করে গেছে। নালিশ জানিয়েছে, প্রতিবেশীরা নাকি আমার পাখিদের জ্বালায় অস্থির। ভেবেই পাই না, ওদের কি এমন জ্বালাচ্ছে পাখিগুলো।'

আমি আপনার প্রতিবেশী হলে নালিশ জানাতাম না, বহু আগেই তল্লাট ছেড়ে পালাতাম, মনে মনে বলল মুসা।

মহিলার কথা কিশোরের কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। গভীর মনোযোগে লাশ পরীক্ষা করছে। টেবিলে বিছানো সাদা কাপড়ের ওপর রাখা হয়েছে মৃত পাখি দুটোকে। দোয়েলের মাথা থেঁতলে দেয়া হয়েছে, বোধহয় লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে। বাজটার গায়ে কোন ক্ষত নেই। বিষ খাইয়ে মেরেছে, মনে হয়।

'বাজটাকে কি খাওয়ান?' ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাংস,' বললেন মিস কারমাইকেল। 'জানো নিশ্চয়, ওরা মাংসাশী। সাংঘাতিক ধূর্ত শিকারী। ইঁদুর, খরগোশ, ছোট ছোট পাখি, যা পায় ধরে খায়। খাওয়ার জন্যেই শিকার করে তো, দোষ দিতে পারি না। তবু একেক সময় মনে হয় বড় বেশি নিষ্ঠুর ওরা।'

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল কাঁধে বসা তোতা, 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

এই একটা শব্দই শিখেছে নাকি, ভাবল মুসা।

মাথা নেড়ে লাশ দুটো দেখিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, 'পেয়েছেন কোথায়, মানে, কোথায় পড়েছিল?'

'হীরা পড়ে ছিল লনের ধারে। বেচারাকে তোলার কথা ভাবছি, এই সময় চোখ পড়ল...' রুমাল বের করে চোখ মুছলেন মিস কারমাইকেল। 'দেখলাম, স্টীল পড়ে আছে গাছের তলায়।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। কোনমতে বললেন, 'ওর খাওয়া...যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। খায়নি। পাথর হয়ে ও পড়ে আছে গাছতলায়...আর কোন দিন উড়বে না...' শব্দ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

সহানুভূতি দেখিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। মহিলার উচ্ছ্বাস থামার সময় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা দেখাবেন?'

'নিশ্চই,' জানালা দিয়ে তাকালেন মিস কারমাইকেল। অন্ধকার হয়ে গেছে।

'দাঁড়াও, একটা টর্চ বের করি।'

'লাগবে না,' বলল কিশোর। 'আমাদের সাইকেলে লাইট আছে, খুলে নেব। চলুন।'

সূর্য ডোবার পর নীরব হয়ে গেছে পাখির দল। মিস কারমাইকেলের পেছনে আলো হাতে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা। মাঝেসাঝে পেঁচার কর্কশ ডাক কানে আসছে। তার জবাবেই যেন অন্ধকার ডাল থেকে হেসে উঠছে কোন কাকাতুয়া, বুড়ো মানুষের খসখসে হাসির মত।

'ওই যে, ওখানে পড়েছিল হীরা,' ভাঙা গলায় বললেন মিস কারমাইকেল।

জায়গাটায় আলো ফেলল কিশোর। নিচু হয়ে একটা রক্তাক্ত পালক তুলল।

কেঁপে উঠলেন মিস কারমাইকেল। 'বাজপাখিটা পড়ে ছিল ওই গাছতলায়।...কিছু যদি মনে না করো, আমি যাই। একটু শোব। ভাল লাগছে না।'

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি চেপে ধরে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হলেন মিস কারমাইকেল।

মহিলার অবস্থা দেখে দুঃখই হলো কিশোরের, একই সঙ্গে দুই সন্তান মারা গেছে যেন তাঁর। তবে তিনি চলে যাওয়ায় খুশিও হয়েছে, কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছিল।

বাজটা যেখানে পড়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। একটা পালকও নেই। মাংসের টুকরোও না। বিষ খেয়েই যদি মারা গিয়ে থাকে বাজটা, হয় অন্য কোথাও থেকে খেয়ে এসেছে, কিংবা ওটার খাওয়া শেষ হওয়ার পর এসে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে যে খাইয়েছে।

আশেপাশের অনেকখানি জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখল কিশোর। 'খুব খারাপ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো তার।

'কি খারাপ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শক্ত মাটি,' এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার মনে করল না আপাতত কিশোর, সময়ও নেই, কাজ রয়েছে। 'রবিন, তুমি ওদিকের বনে ঢোকো। মুসা, তুমি এদিকে। মাঝের জায়গাটায় আমি ঢুকছি। ঠিক আছে?'

'তা আছে,' মাথা কাত করল মুসা। 'কিন্তু কিশোর, একটা কথা বলবে?'

'কি?'

'খুঁজছ কি তুমি?'

'পায়ের ছাপ,' আবার মাটিতে আলো ফেলল কিশোর। 'পড়েনি, বেশ শক্ত মাটি। তবে দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়েছে, বনের কোথাও কোথাও নরম মাটি আছেই। ভিজে নরম হয়ে আছে। মিস কারমাইকেলের প্রতিবেশীদের কথা যা শুনলাম, মনে হয় না কেউ তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। তাই, যদি কারও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, ধরে নিতে হবে সেটা খুনীর।'

'চমৎকার,' অনেকটা টিটকারির সুরে বলল মুসা। 'যদি পেয়ে যাই, তো কি করবে? প্লাসটার কাস্ট করে ল্যাবোরেটরিতে পাঠাব?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'এই সহজ কথাটাও বুঝছ না। ব্লিংকির

কথা ভুলে গেছ? ওর জুতো দেখোনি? কত বড়? তাছাড়া চোখা মাথা। এবার বুঝেছ?'

'চোখা হলে তো বুঝলাম ব্লিংকির,' কথা বলল রবিন, 'আর যদি তা না হয়? কি বুঝব?'

'সেটা তখন ভাবা যাবে।'

'ছাপ দেখতে পেলে কি করব?' মুসার প্রশ্ন।

'আলোর সঙ্কেত দেবে। জ্বালবে-নেভাবে জ্বালবে-নেভাবে, তিন বার করে, খানিক বিরতি দিয়ে আবার তিন বার। যতক্ষণ জবাব না পাবে, দিয়েই যাবে।'

তিনজন তিন দিকে রওনা হয়ে গেল।

সামান্য ঝুঁকে পা পা করে এগোচ্ছে কিশোর, বার বার লাইট ঘুরিয়ে দেখছে সামনে আর আশেপাশে। তার মনে হচ্ছে, মাঝের দিকটা বেছে নিয়ে ঠিক করেনি, এদিকে সুবিধে হবে না। ছাপ পাওয়ার আশা নেই। ঘন ঝোপঝাড়, নুড়ি আর বালিতে ঢাকা সরু পথ। এখানে পায়ের ছাপ বসবে না।

মুসা আর রবিনও নিশ্চয় কিছু দেখতে পায়নি, পেলে সঙ্কেত দিত। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় চোখে পড়ল ডানের ঝোপে কালোমত কি যেন। থমকে গেল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। হঠাৎ করেই নড়ে উঠল, প্রায় দৌড়ে এসে বসে পড়ল ওটার কাছে।

অন্ধকারে কাছেই কোথাও কর্কশ চিৎকারে নীরবতা ভাঙল একটা পেঁচা। কিশোরের মনোযোগ ছিন্ন করতে পারল না বটে, কিন্তু পেছনে নড়াচড়ার শব্দটা ঢেকে দিল পাখির ডাক।

হালকা খসখস শব্দটা বড় বেশি দেরিতে কানে এল কিশোরের। গোড়ালিতে ভর করে বসা অবস্থায়ই পাঁই করে ঘুরল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, পারল না, তবে মাথাটা বাঁচল। শক্ত লাঠির আঘাত কান ছুঁয়ে শিস কেটে এসে লাগল কাঁধে।

তীব্র বেদনার পর পরই মনে হলো অবশ হয়ে গেছে ডান হাত। আঙুলগুলো কোনমতে ধরে রইল লাইটটা। এক পাশে কাত হয়ে পড়ল সে, গড়ান দিয়েই চিত হলো, লাইটটা বুকের ওপর ধরে লেন্সটা ফেরাল কোণাকুণি ওপর দিকে।

কালো অয়েলস্কিন পরা একজন মানুষের মুখে পড়ল আলো।

মুখ না বলে বলা যায় দাড়ির জঙ্গল। নাক দেখা যাচ্ছে, ঠোঁট অস্পষ্ট। চোখ দুটোও এখন দেখা যায় না, কালো চশমায় ঢাকা।

চোখে আলো পড়ায় স্থির হয়ে গেল লোকটা, পরক্ষণেই ঘুরে এক দৌড়ে ঢুকে গেল পাশের ঘন জঙ্গলে। পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না কিশোর। উঠে দাঁড়াল। শরীর কাঁপছে। বাঁ হাতে ডলতে শুরু করল কাঁধ। শুরু হলো তীব্র ব্যথা; অবশ ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাইটের লেন্স একটা বিশেষ দিকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে ঢাকল, সরাল, আবার ঢাকল, আবার সরাল,পর পর তিনবার করল এরকম। সাড়া এল না। আবার একই রকম করল। থামল। আবার সঙ্কেত দিল।

সঙ্কেতের জবাব দিল মুসা। ছুটে আসতে শুরু করল।

'কিশোর?'

'এই যে, এখানে আমি।'

ঝোপের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে দাঁড়াল মুসা। একটু পরেই উল্টো দিক থেকে এসে পৌঁছল রবিন।

কাঁধ ডলেই চলেছে কিশোর। ব্যথা একটু কমছে মনে হচ্ছে।

কি হয়েছে, কিশোর?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল রবিন।

'রিচার্ড হ্যারিস,' বলল কিশোর। 'ব্যাটা আমাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। কপাল ভাল মাথায় লাগেনি, তাহলে গেছিলাম। মুখে আলো পড়তেই চমকে গেল, ছুটে পালাল। ওই যে ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল। 'কোন শব্দ শোনোনি? দেখেছ ওকে?'

'নাহ্। ঝোপঝাড় খুব বেশি। আর গেটের দিকে গিয়ে থাকলে আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার কথা না।'

'পিছু নেব নাকি?' বলল বটে মুসা, কিন্তু অন্ধকারে একটা বাজে লোককে অনুসরণের কথা ভাবতেই জানি কেমন লাগছে, তাছাড়া লোকটার হাতে রয়েছে মোটা লাঠি, অন্যের মাথায় বাড়ি মারার প্রবণতাও আছে।

'না,' মুসার মত একই কথা ভাবছে কিশোরও। 'একটা কিছু আছে এখানে, ও-ব্যাটার জন্যে দেখতে পারিনি ভালমত।' আলো ফেলল ঝোপের কিনারে। কালোমত বস্তুটার কাছে এসে বসল আবার, তার পাশে বসল রবিন আর মুসা।

'খাইছে!' মুসা চেঁচিয়ে উঠল 'এ-যে দেখছি, এ-যে দেখছি...'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর, 'ঠিকই দেখছ। মরা কবুতর।'

কবুতর না বলে বলা উচিত কবুতরের অবশিষ্ট। মাথাসহ শরীরের ওপরের অংশ নেই, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বাকি রয়েছে লেজের কাছের অতি সামান্য চামড়া আর মাংস, পালকগুলো গেঁথে রয়েছে তাতে। একটা ডানার খানিকটা আর পা দুটোও আছে।

হাত বাড়িয়ে একটা পা তুলে নিল কিশোর। গোড়ালিতে অ্যালুমিনিয়মের পাতলা আংটা পরানো। নিজের লাইট মাটিতে রেখে রবিনের লাইটের আলোয় পা থেকে জিনিসটা খুলল সে, পাতলা মোড়কের ভেতর ছোট একটা ভাঁজ করা কাগজ। সাবধানে মোড়কের জোড়া ছুটিয়ে সোজা করল, ভেতরের কাগজ বের করে মেলল। সমান করল হাত দিয়ে ডলে।

বকের মত গলা বাড়িয়ে দুপাশ থেকে কাগজটার ওপর ঝুঁকে এল অন্য দুজন।

'হায় হায়, এটা কি ভাষা?' বলে উঠল মুসা। 'চীনা নাকি?'

ছাপার অক্ষর হলে হয়তো বোঝা যেত, কিন্তু হাতে লেখা, তাই প্রথমে রবিনও চিনতে পারল না। 'চীনাই বোধহয়,' বিড়বিড় করল সে। 'না না, জাপানী পাঠকও আছে, বই নিতে আসে। চিনি কয়েকজনকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, কাগজটা যত্ন করে রেখে দিল পকেটে। তারপর ঝুঁকে আবার দেখতে লাগল কবুতরের দেহাবশেষগুলো।

'দেখো দেখো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে, 'বাঁ পা-টা দেখো!'

মুসা আর রবিনও দেখল।

যে-ই মেরেছে পাখিটাকে, কোন কারণে পা-দুটো নষ্ট করেনি, নিচের অংশ অক্ষত রয়েছে। বাঁ পায়ে তিনটের জায়গায় রয়েছে দুটো আঙুল।

ছয়

'আজ মুক্তো নেই,' সাইকেল চালাতে চালাতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। তার পাশে পাশে চলেছে রবিন আর মুসা।

সকাল বেলায়ই বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। রবিনের পরিচিত একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিল। লাইব্রেরিতে বই নিতে আসেন তিনি প্রায়ই। তাঁকে দিয়ে মেসেজটা পড়িয়েছে, মর্মোদ্ধার করেছে। তিনটে শব্দ শুধু লেখা ঃ আজ মুক্তো নেই।

ভাবনার ঝড় বইছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। মুক্তো। কবুতর। মৃত দোয়েল। মৃত বাজ পাখি। আর রিচার্ড হ্যারিস।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখা গেল, উত্তেজিত হয়ে আছেন মেরিচাচী। ভারি ভারি অনেক মালপত্র নিয়ে এসেছেন রাশেদ চাচা। সেগুলো গোছাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইয়ার্ডের দুই বিশালদেহী কর্মচারী, দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস ও রোভার।

তিন কিশোরকে দেখে এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'এই যে, তোরা এসেছিস। ভালই হয়েছে। তোর চাচার কাণ্ড দেখ কিশোর, কি সব নিয়ে এসেছে। বাঁকাচোরা এসব লোহার পাইপ দিয়ে হবেটা কি? বিক্রি হবে ওজন দরে ছাড়া? আর তাতে লাভ তো কিছু হবেই না, লোকসান যাবে প্রচুর।'

'ভেব না চাচী, লোকসান যাবে না,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'কোন একটা উপায় হয়ে যাবেই।'

অফিসের বাইরে ছায়ায় বসে পাইপ টানছিলেন রাশেদ পাশা, মুখ থেকে সরিয়ে খুকখুক করে কাশলেন, মস্ত গোঁফের ডগায় আলতো মোচড় দিয়ে উঠে এলেন। 'বোঝা তুই, কিশোর, আমি তো পারলাম না। তখন থেকে চেঁচামেচি করছে।'

'কি করে বিক্রি হবে শুনি?' কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।

'হবে হবে,' আবার পাইপ মুখে দিলেন রাশেদ পাশা, কিশোরের দিকে তাকালেন, ইচ্ছে, বুদ্ধিটা বাতলে দিক কিশোর।

'হবে হবে তো বলছই শুধু, কি করে হবে?'

'এই কিশোর, বলে দে না,' ভাতিজার ওপর গভীর আস্থা রাশেদ চাচার, তাঁর স্থির বিশ্বাস আইনস্টাইন কিংবা নিউটনের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না কিশোর, একটা উপায় বের করে ফেলবেই।

'চাচী, তুমি খামোকা ভাবছ। বাজারে পাইপের যা দাম এখন,' বলল কিশোর, 'ডবল দামে বিক্রি করতে পারব। গত বছর পাইপ ঢালাইয়ের একটা বাতিল মেশিন এনেছিল না চাচা, যেটা পড়ে আছে এখনও, সেটা মেরামত করে নেব। তারপর

জন্য দুই ঢালাই মিস্ত্রিকে ভাড়া করে নিয়ে এলেই হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। মেশিনটাও বিক্রি হবে, পাইপগুলোও ডবল দর...'

'হোহ্ হোহ্ হো,' মুখ থেকে পাইপ খসে পড়ল রাশেদ পাশার, তোলার চেষ্টা করলেন না, হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মত। 'মেরি বেগম, এবার কি বলবে?' আঞ্চলিক বাংলায় টেনে টেনে বললেন, 'কইছিলাম না, আমাগো কিশোর থাকতে কোন চিন্তা নাই। অই মিয়ারা, খাড়ায়া খাড়ায়া কি দেখতাছো, তোলো তোলো, তুইল্লা রাখো পাইপগুলান।' শেষ কথাগুলো দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, কিন্তু কিছুই বুঝল না ওরা, হাঁ করে চেয়ে আছে রাশেদ পাশার মুখের দিকে।

হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেরিচাচীর সারা মুখে। 'কিশোর, আজ তোদের আমি ফ্রুট কেক খাওয়াব।'

'কেক না চাচী, আইসক্রীম...'

'দুটোই বানাতে যাচ্ছি,' হেলেদুলে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন মেরিচাচী।

পুরো দুই ঘণ্টা লাগল পাইপগুলো গোছগাছ করতে। কাজ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে, খেয়ে, ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা।

দুই সুড়ঙ্গের মুখের ধাতব পাত সরিয়ে প্রথমে ঢুকল কিশোর, তার পেছনে রবিন, সব শেষে মুসা।

পাইপের অন্য মুখের ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। প্রথমেই তাকাল জবাব-দেওয়া মেশিনটার দিকে। আলো জ্বলছে না, তারমানে কোন ফোন আসেনি। হতাশ হলো। উঠে এসে বসল নিজের চেয়ারে।

পুরানো একটা রকিং চেয়ারে বসে ফাইলিং কেবিনেটের ড্রয়ারে পা তুলে দিল মুসা। রবিন বসল একটা টুলে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

চিরাচরিত নিয়মে আলোচনার সূত্রপাত করল কিশোর। 'মুক্তা। এই কেসের প্রধান রহস্য।'

'কবুতরও,' খাঁচার ভেতরে বসা পায়রাটাকে দেখিয়ে বলল মুসা। 'দু-আঙুলে কবুতর, তিন আঙুলে কবুতর, জ্যান্ত কবুতর, মরা কবুতর।'

'মুক্তো,' আবার বলল কিশোর। 'মেসেজ লেখা : আজ মুক্তো নেই। মিস কোরিন কারমাইকেলের মুক্তোপ্রীতি। তাঁর একটা দোয়েল ছিল, যেটা মুক্তো এনে দিত।'

'হীরা,' মাথা ঝোঁকাল রবিন, নোট বই বের করছে পকেট থেকে। 'ঠোঁটে করে মুক্তো নিয়ে এল। মিস কারমাইকেল বললেন : এই নিয়ে তিনটে হলো।'

'তারপর কেউ খুন করল হীরাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে চলল কিশোর। 'হতে পারে রিচার্ড হ্যারিস। তার গহনার দোকান আছে, মুক্তো বিক্রি করে। এই রহস্যের প্রধান বিষয়বস্তু যদি মুক্তো হয়...' মাঝে মাঝে দুর্বোধ করে কথা বলা তার স্বভাব, আসলে মনে মনে না ভেবে জোরে জোরে ভাবে সে তখন, তাই এমন মনে হয় কথাগুলো, 'মুক্তোই যদি আসল কথা হয়, তাহলে এর মাঝে কবুতর আসছে কি

করে? কবুতর ডিম পাড়ে, মুক্তো পাড়ে না। যোগাযোগটা কোথায়?'

'হয়তো পাড়ে। সোনার ডিম-পাড়া রাজহাঁসের কিচ্ছা পড়নি···' বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

ফোন বেজে উঠেছে।

লাইনের সঙ্গে যুক্ত স্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। 'হ্যালো তিন গোয়েন্দা।'

'হ্যালো, কিশোর পাশা?' পরিচিত কণ্ঠ, উদ্বিগ্ন। 'কিশোরকে চাই।'

'বলছি।'

'কিশোর,' এক মুহূর্ত নীরবতা, থমকে গেছে বোধহয় লোকটা, কিংবা দ্বিধা করছে, 'আমাকে চিনতে পারছ? আমি, আমি, ওই যে দুই দিন আগে রেস্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল। ভুলে বাক্সটা ফেলে গেছিলাম। পরে ফিরে গিয়ে ওয়েইট্রেসকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তোমরা নিয়ে গেছ। নানা ঝামেলায় আর খোঁজ নিতে পারিনি।'

মাউথ পীসে হাত চাপা দিল কিশোর, ফিসফিস করে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ক্লিংকি।'

'হ্যালো?' নার্ভাস মনে হচ্ছে ওপাশের লোকটাকে। 'হ্যালো। শুনছ?'

'শুনছি, বলুন,' জবাব দিল কিশোর। 'বাক্সটা নিয়ে এসেছি আমরা, ঠিকই বলেছে ওয়েইট্রেস।'

দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত নীরবতা।

'হ্যালো, আছে তো এখন তোমাদের কাছে? আমার বাক্সটা?'

'আছে। চারকোণা বাক্স, চীজক্লথে মোড়া, সে-ভাবেই আছে। আপনি ফেলে গেছেন দেখে নিয়ে এসেছিলাম, জানি ফোন করবেনই।'

'খুব ভাল করেছ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্লেটার। 'তোমাদের একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে। বাক্সটা যদি নিয়ে আসো, পঞ্চাশ ডলার পাবে।'

'থ্যাংক ইউ। কোথায় আনব?'

'আমি জানি তুমি কোথায় থাকো···মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? তাহলে ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পারকিং লটে সুবিধে বেশি।'

'ঠিক আছে। কখন আসব?'

'আজ রাত নটার দিকে?'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে রাত ন'টায় দেখা হচ্ছে,' আবার নার্ভাস হয়ে পড়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে সেটা স্পষ্ট।

লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

'খাইছে,' বলে উঠল মুসা, 'একটা কবুতরের জন্যে পঞ্চাশ ডলার!'

জবাব দিল না কিশোর। জোরে জোরে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় মগ্ন।

'চীজক্লথটা রেখে দিয়েছি,' বলতে বলতে ফাইলিং কেবিনেট খুলল রবিন। 'টমকে ছোট খাঁচায় ভরে আবার মোড়াবে?'

পুরো এক মিনিট কোন কথা বলল না কিশোর, তারপর মাথা নাড়ল।

'ব্লিংকির কথাগুলো পর্যালোচনা করে দেখি আগে,' জোরে জোরে ভাবতে শুরু করল সে, বলল, 'আমি জানি তুমি কোথায় থাকো...তারপর শুধরে নিয়ে বলল, মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? এটা জানা আর অনুমানের মধ্যে তফাতটা কোথায়? আমাদের কার্ডে তো রয়েছে কোন নম্বর, ঠিকানা জেনে নেয়াটা কোন ব্যাপারই না। দ্বিধা করেছে, তারমানে মিথ্যে কথা বলেছে, খুব ভালমতই জানত আমরা কোথায় থাকি, অনুমান-টনুমান কিচ্ছু না।'

'তাহলে সে-ই কবুতর বদল করেছে,' বলল রবিন।

'তাই তো মনে হয়। আমি মিছে কথা বলেছি, জানে সে। কিন্তু চেপে গেছে। আবার চীজক্লথে মুড়ে যদি খাঁচাটা নিয়ে যাই, হাতে নিয়ে বলবে "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ..." '

'এবং পঞ্চাশ ডলার দেবে,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'এবং ভাব দেখাবে, খাঁচার ভেতরে আগের কবুতরটাই আছে, সেভাবেই নিয়ে চলে যাবে। তারপর আর কোন দিন তার দেখা পাব না আমরা। এই কেসের মহামূল্যবান একটি মাত্র সূত্রও হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কি করতে বলো তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চূড়ান্ত কিছু একটা করতে হবে। না মুড়েই খাঁচা নিয়ে তার সামনে হাজির হব, তাকে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করব। তোমার কি মনে হয় মুসা?'

মাথা চুলকাল সহকারী-গোয়েন্দা। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো। পঞ্চাশ ডলার হারাতে রাজি নই আমি। মেলা টাকা। তবে একটা কথা ঠিকই বলেছ, এই রহস্যের সমাধান করতে চাইলে ব্লিংকির মুখ খুলতে হবে আমাদের।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মা-বাবা নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করছেন, রাতে আবার বেরোনোর আগে তাদের সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করে আসা দরকার। ইয়ার্ডে আর ফিরবে না। ট্রাসটি ব্যাংকে পারকিংলটে চলে যাবে যার যার মত, নটার মিনিট দশেক আগে মিলিত হবে ওখানে।

সাড়ে আটটায় টমকে ছোট খাঁচায় ভরে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল কিশোর। শহরের দিকে রওনা হলো।

ব্যাংকটা মেইন স্ট্রীটে, হ্যারিসের দোকান থেকে দূরে নয়। বিশাল সাদা বাড়িটার পেছনে পার্কিংলটে সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, অল্প কয়েকটা গাড়ি আছে এখন লটে। পারকিঙের জায়গাটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে বিল্ডিং। আধো অন্ধকার সেখানে।

দেয়াল ঘেঁষে সাইকেলটা রেখে আলো নিভিয়ে দিল কিশোর, ক্যারিয়ার থেকে খুলে নিল খাঁচা।

চারপাশে তাকাল। অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছয়-সাতটা গাড়ি। কোনটাতেই প্রাণের সাড়া নেই।

ঘড়ি দেখল কিশোর। পৌনে নটা। আর পনেরো মিনিট পরে ব্লিংকির আসার কথা। মুসা আর রবিন আসতে আর পাঁচ মিনিট। পার্কিংলটের প্রবেশ মুখে ওদের অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওখানে আলো আছে যথেষ্ট, রাস্তার লাইটের আলো। পা বাড়াল।

'এই ছেলে, থামো,' পেছনের অন্ধকার ছায়া থেকে বলে উঠল কেউ।

যা বলা হলো করল কিশোর। যেখানে ছিল সেখানেই অনড় হয়ে গেল, খাঁচাটা দু-হাতে পেটের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

'আস্তে করে ঘোরো,' আবার আদেশ হলো।

যতখানি আস্তে পারল ঘুরল কিশোর।

বিষণ্ণ ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাত। কিছু একটা ধরে রেখেছে। আধো অন্ধকারেও চমকাচ্ছে জিনিসটা।

আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব নল চিনতে কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। চোখ সরাতে পারল না ওটার ওপর থেকে।

'খাঁচাটা রাখো তোমার সামনে, মাটিতে,' আদেশ দিল লোকটা।

ঝুঁকে রাখল কিশোর।

আরেকটু কাছে এল লোকটা। কিশোরের দিক থেকে নল না সরিয়েই উবু হলো, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কবুতরটা রয়েছে খাঁচার ভেতরে।

'গুড।'

সোজা হলো লোকটা। চকিতের জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর। উজ্জ্বল কালো অয়েলস্কিন পরনে, চোখে কালো চশমা, মুখ ঢেকে আছে দাড়িগোঁফ। রিচার্ড হ্যারিস।

'ঘোরো,' বলল লোকটা। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো মাটিতে।'

লোকটার কণ্ঠস্বর অবাক করল কিশোরকে। নিচু পর্দা, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, যেন জোর করে বলছে। আমার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না ব্যাটা—ভাবল কিশোর, এবং সেটা লুকাতে চাইছে।

শাসানোর ভঙ্গিতে নল নাড়ল লোকটা।

আর দ্বিধা করল না কিশোর, যা বলা হলো, করল। শুয়ে পড়ল।

'দুই হাত পেছনে, পিঠের ওপর তুলে আনো।'

তুলল কিশোর। কানে এল ছেঁড়ার শব্দ, টেনে কাপড় ছেঁড়া হচ্ছে···নাকি, রোল থেকে অ্যাডেসিভ টেপ হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়াচ্ছে? মুহূর্ত পরেই বুঝল, কি জিনিস। টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো তার হাত, দড়ি কিংবা কাপড়ের ফালির চেয়ে অনেক শক্ত বাঁধন।

নড়ল না কিশোর। চকমকে নলের চেহারাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বল। চুপচাপ শুয়ে অনুভব করল, পা-ও বাঁধা হচ্ছে।

শুনল, চলে যাচ্ছে লোকটার পদশব্দ। পেছনে কোথাও গুঞ্জন তুলল গাড়ির

এঞ্জিন, হেড লাইট জ্বলল। হাত-পা এমনভাবে বাঁধা, মাথা তুলতেও অসুবিধে হচ্ছে। তবু যতখানি পারল তুলল, সাবধানে, ঘুরে তাকাল।

চলতে শুরু করেছে গাড়ি। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না গাড়ির বডি, চেনা না অচেনা বোঝা যাচ্ছে না। বিশ গজ দূর দিয়ে চলে গেল গাড়ি, টায়ারের কর্কশ শব্দ তুলে মোড় নিয়ে নামল রাস্তায়, অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুয়ে শুয়ে নিজেকে দোষারোপ করছে কিশোর। পারকিংলটে ঢোকার আগে মুসা আর রবিনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অন্ধকারে বোকার মত ঢুকে পড়েছে একা একা, লোকটাকে সুযোগ দিয়েছে···

গেটের দিক থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সাইকেলের লাইট দেখা গেল।

'মুসা,' ডাকল কিশোর। 'রবিন।'

দুপাশ থেকে কিশোরের ওপর ঝুঁকে বসল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কব্জি আর গোড়ালি থেকে টেপ তুলতে শুরু করল। চড়চড় করে রোম ছিঁড়ে নিয়ে উঠে আসছে টেপ, জ্বালা করছে চামড়ায়।

আহত জায়গা ডলতে ডলতে জানাল কিশোর কি ঘটেছে।

নরম শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'পিস্তল?'

'তাই তো মনে হলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'গুলি ভরা ছিল কিনা জিজ্ঞেস করিনি, যদি আমার ওপরই প্রমাণ করে দেখাতে চায়।' প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'তোমরা কিছু দেখেছ?'

মাথা ঝোকাল রবিন। 'গাড়ি দেখলাম একটা, কালো। ব্লিংকিরটার মতই মনে হলো। লাইসেন্স প্লেটে দেখলাম এম ও কে লেখা। ঠিক···'

'ব্লিংকির গাড়ির প্লেটে যে রকম লেখা ছিল,' বলল কিশোর। 'যেটাতে করে "স্ন্যাকস" রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল। যেটা···' নিশ্চিত নয়, তাই বাক্যটা শেষ করল না সে। রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান থেকে বেরিয়ে সেদিন যে গাড়িটা দেখেছে সেটার কথাই বলতে যাচ্ছিল। লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার পুরোটা পড়তে পারেনি, তবে শুরুতে এম লেখাটা দেখেছে বলে মনে পড়ছে।

'তো, এখন কি করা?' মুসা বলল। 'টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিস, ব্লিংকি···'

'হ্যাঁ,' মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন, 'ব্লিংকি এলে তাকে কি জবাব দেব?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। নটা বাজতে দুই মিনিট বাকি। 'কিছুই না, কারণ তার জন্যে আর অপেক্ষাই করছি না আমরা। চলো কেটে পড়ি। যার যার বাড়ি চলে যাব। সকালে হেডকোয়ার্টারে আলোচনা হবে।'

সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি পারকিংলট থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সে রাতে ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। মনে ভাবনার বোঝা। টমকে হারিয়েছে ওরা, চূড়ান্ত কিছু একটা করা সম্ভব হয়নি ব্লিংকির সঙ্গে, তাকে প্রশ্ন করা যায়নি। মিস কারমাইকেলকে বলার কিছু নেই। তাঁকে গিয়ে বলা যাবে না, তাঁর বন্ধু রিচার্ড হ্যারিস পাখিগুলোকে খুন করেছে। প্রমাণ করতে পারবে না সেটা। যদি মিস

কারমাইকেল জিজ্ঞেস করেন, সাধারণ দুটো পাখিকে খুন করে রিচার্ডের কি লাভ, জবাব দিতে পারবে না কিশোর। জবাব তার নিজেরই জানা নেই। আর সত্যি কি রিচার্ডই খুন করেছে পাখিগুলোকে?'

এবারের কেসটায় বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না তিন গোয়েন্দা। সূত্র একটা যা-ও ছিল হাতে, তা-ও খুইয়ে এসেছে। এখন একমাত্র ভরসা ব্রিংকি, যদি সকালে ফোন করে কৈফিয়ত চায়। অর্থাৎ যদি সে যোগাযোগ করে। তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদিও ফোন করার সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ।

পারকিংলটে অপেক্ষা করাই বোধহয় উচিত ছিল, চলে এসে ভুল করলাম না তো? মনে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। যতগুলো প্রশ্ন মনে নিয়ে ঘুমিয়েছিল, একটারও জবাব মেলেনি।

ইদানীং তার হয়েছে আরেক বিপদ, মেরিচাচীর হঠাৎ করেই খেয়াল হয়েছে, আজকাল খাওয়ার প্রতি কিশোরের বিশেষ আগ্রহ নেই। ফলে সকালে উঠেই গাদা গাদা গিলতে হয়। মেরিচাচী সামনে বসে থাকেন, ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। কিশোরের ধারণা, এতে তার চিন্তাশক্তি ব্যাহত হচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠেই দেখল কিশোর, নাস্তা রেডি। টেবিলে বসে কাগজ পড়ছেন চাচী, কিশোরকে দেখেই কাগজটা সরিয়ে রেখে প্লেট চামচ টানাটানি শুরু করলেন।

ডিম, মাংস, মাখন, পনির, রুটি, আপেল আর দুই গ্লাস দুধ খাওয়ার পর মনে হলো কিশোরের, আগামী এক বছর আর কিচ্ছু খাওয়ার দরকার হবে না। এরপরও যখন কয়েকটা আঙুল মুখে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন চাচী, রেগে গেল কিশোর। মুখের ওপর বলে দিল, যদি এ-রকম করে, তাহলে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়বে বিছানায়, বাঁকাচোরা পাইপের ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করবে না। এত ভারি পেট নিয়ে না নড়তে পারে মানুষ, না কাজ করতে পারে?

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললেন চাচী, 'এখন থাক। ঘন্টাখানেক পরেই খাস।'

গটমট করে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। সোজা রওনা হলো ওয়ার্কশপে। ঢুকেই থমকে গেল। একটা বাক্সের ওপর বেশ আরাম করে বসে আছে পাখিটা। তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে তাকাল।

কাছে গিয়ে পাখিটাকে তুলে নিল কিশোর। ডানা আর লেজের চকচকে পালকগুলো দেখল। না, কোন ভুল নেই। সাদা ফুটকিগুলো অবিকল এক। তাছাড়া পাখিটাও চিনতে পেরেছে তাকে, নইলে ধরা দিত না।

টম। ফিরে এসেছে।

সাত

'টমই,' মুসা বলল, 'কোন সন্দেহ নেই। এই যে লেজের সাদা ফুটকি, কয়েক বছর পর দেখলেও ঠিক চিনতে পারতাম। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে। পারিসনি, টম?'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। আবার আগের জায়গায়, বড় খাঁচায় ফিরে গেছে টম। দানা ঠুকরে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে।

'রিচার্ড হ্যারিস ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে,' নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটছে কিশোর, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না কথাগুলো। 'কয়েক ঘণ্টা পর ছেড়ে দিল কবুতরটাকে, ফিরে এল ওটা আবার আমাদের কাছে। কেন?'

'আমাদের কাছে ফিরে আসবে হয়তো ভাবেনি হ্যারিস,' বলল রবিন।

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'বইতে পড়লাম,' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসেজ বহন করত রেসিং হোমার। মিলিটারি যখন অ্যাডভান্স করত, কবুতরগুলোকে খাঁচাশুদ্ধ বয়ে নিত, নতুন জায়গায় আটকে রাখত কয়েকদিন, তারপর ছাড়ত। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়লে আগের জায়গায় ফিরে যেত পাখিগুলো। এই কবুতরের স্বভাব হলো, পুরানো আশ্রয়ের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, দু-তিন দিন অন্য কোথাও থাকলে সেটার কথাই মনে রাখে। সেখান থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে দু-তিন দিন রাখলে, এর আগেরটার কথা আবার ভুলে যায়। হয় ভোলে, কিংবা যেতে চায় না, যেটাই হোক...'

'হুঁ, এজন্যেই তাহলে ফিরে এসেছে টম,' মাথা দোলাল কিশোর। 'বলে ভালই করেছ, রবিন। পাখিটার মালিক বোধহয় রিচার্ড হ্যারিস নয়। আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তার ধারণা ছিল, বাড়ি ফিরে যাবে টম। তা না গিয়ে চলে এসেছে এখানে, স্বভাবের কারণে।'

'এটাই এখন তোর বাড়ি, না টম?' খাঁচার ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পায়রাটার মাথায় ছোঁয়াল মুসা, আদর করল। 'তাই ফিরে এসেছিস। খুব খুশি হয়েছি...'

কথায় বাধা পড়ল। লাউডস্পীকারে বেজে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ। 'কিশোর। কিশোর।'

কিশোরের এটা আরেকটা নতুন সংযোজন। ওরা হেডকোয়ার্টারে থাকলে দরকার পড়লে ডাকেন চাচী। অনেক কারণে সব সময় সে ডাক স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে শোনা যায় না। তাই ওয়ার্কশপে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিয়েছে সে, হেডকোয়ার্টারে স্পীকারের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে।

'এই কিশোর, শুনছিস?' আবার ডাক শোনা গেল।

ডাকের ধরন বিশেষ সুবিধের মনে হলো না মুসার কাছে। বলেই ফেলল, 'মাল্লাহরে! কি জানি নিয়ে এসেছে রাশেদ-চাচা! এবার হয়তো বেঁকাবুঁকা ইলেকট্রিকের খাম্বা, দেড় টন করে ওজন একেকটার...' বলতে বলতে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।

'ওদিকে না,' বাধা দিল কিশোর। 'স্কাইলাইট দিয়ে বেরিয়ে ওয়ার্কশপের পেছনে গিয়ে নামব,' মিটিমিটি হাসছে সে।

জঞ্জালের ওপর দিয়ে নেমে এল ওরা। মেরিচাচী ওদের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়ার্কশপে।

আস্তে গিয়ে চাচীর কাঁধে হাত রাখল কিশোর।

চমকে উঠলেন চাচী। ফিরে তাকালেন। 'এই দেখো শয়তান ছেলের কাণ্ড। এই বেরোলি কোত্থেকে তোরা? ওদিকে তো সব জায়গা খুঁজে এলাম...'

'জঞ্জালেতে বাসা আমার, আকাশ দিয়ে পথ,' হেঁড়ে গলায় গান ধরল কিশোর, 'বলো শুনি,লক্ষ্মী চাচী, তোমার কি বিপদ?'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে চেয়ে রইলেন চাচী। চোখে শঙ্কা, ছেলেটার মাথা-টাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো!'

'ভয় নেই, চাচী,' হেসে আশ্বস্ত করল রবিন। 'ওটা দা হাইমস অভ দ্য ব্যাটলের সুর। মিস কারমাইকেলের কাছ থেকে শিখে এসেছে।'

কিন্তু শঙ্কা গেল না মেরিচাচীর । তাঁর মনে হতে লাগল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সকালে বেশি খেয়ে ফেলায় কিশোরের পেটে পাচক রসের ক্ষরণে বিঘ্ন ঘটেছে হয়তো, সেটা প্রতিক্রিয়া করেছে মাথায়। বললেন, 'কিসের সুর বললি?'

'ব্যাটল্ অভ দা হাইমস,' আবার বলল রবিন।

'এই কিশোর, খবরদার, আর কক্ষনো গাইবি না। যার গলায় যেটা মানায় না...'

'বেশ গাইব না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবে কথা দিতে হবে, আর কক্ষনো তুমিও খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করবে না।'

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছি,' এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন মেরিচাচী, 'দুজন লোক দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে,' বলেই আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। থাকলেই আবার কোন ফাঁদে ফেলে দেয় কিশোর। দ্রুত ভাগলেন।

সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল কিশোর। 'চলো,' হাত নাড়ল দুই সহকারীর দিকে চেয়ে।

গেটের বাইরে রাস্তায় পার্ক করা একটা ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। দুজনেরই বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, গায়ে টী-শার্ট, পরনে নীল জিনসের প্যান্ট। দুজনেই জাপানী।

'তোমরা তিন গোয়েন্দা?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল একজন। 'কিশোর, মুসা আর রবিন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মিস্টার মিটসুশিতাকে চেনো?'

'চিনি,' জবাব দিল রবিন। ওই ভদ্রলোকের কাছেই মেসেজ অনুবাদ করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

ফিরে সঙ্গীকে কি বলল লোকটা। জাপানী ভাষা, অনুমান করল কিশোর। একই ভাষায় জবাব দিল সঙ্গী।

'ও আমার বন্ধু,' দ্বিতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল প্রথমজন, 'নাম হ্যারিকিরি। ওর কয়েকটা প্রশ্ন আছে, জবাব দিলে খুব খুশি হবে। ইংরেজী জানে না। ওর হয়ে আমিই প্রশ্ন করছি, কেমন?'

সম্মতি জানাল কিশোর।

'গুড,' বলল লোকটা। 'জাপানীতে লেখা একটা মেসেজ নিয়ে গিয়েছিলে মিস্টার মিটসুশিতার কাছে। উনি হ্যারিকিরিকে বলেছেন সেকথা। তার হাতের লেখা চিনতে পেরেছেন।'

প্রশ্ন নয়, কাজেই চুপ করে রইল কিশোর।

'মেসেজটা কোথায় পেয়েছ?' এবার প্রশ্ন।

ভাবছে কিশোর, জবাব না দিলেও পারে সে, তবে দিলে হয়তো তার কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও মিলতে পারে। বলল, 'একটা মরা কবুতরের পায়ে আটকানো ছিল।'

হাসল লোকটা। হ্যারিকিরির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভ্যান থেকে খানিক দূরে।

চেয়ে আছে রবিন, জাপানী ভাষায় কথা বলছে লোকগুলো। তার মনে হলো, দুজনেরই এক চেহারা, একই রকম কালো চুল, ঠেলে বেরোনো চোয়াল, হালকা বাদামী চামড়া। রাস্তায় হঠাৎ আরেকদিন দেখলে বলতে পারবে না, কে হ্যারিকিরি আর কে অন্য লোকটা।

হয় এ-রকম। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চেহারায় বিশেষ তফাৎ দেখতে পায় না—সব ক্ষেত্রে হয় না এটা। তবে সব চেয়ে বেশি হয় আফ্রিকান ও ককেশিয়ানদের, রবিনের তাই ধারণা।

কিশোরও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুজনের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'সেই সবুজ ভ্যানটা, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে যেটা দেখেছিলাম। এটাকে অনুসরণ করতে পারলে...' জাপানী দুজন এখনও আলাপরত, সেদিকে চেয়ে থেকেই বলল সে, 'রবিন বীপারটা আনতে পারবে? ওরা যাতে সন্দেহ করতে না পারে।'

'দেখি চেষ্টা করে,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন। কিশোরের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। পেছনে চেয়ে কান পেতে কি যেন শোনার ভঙ্গি করল, তারপর লোক দুজনকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'কিশোর, মনে হচ্ছে ডাকছেন। যাই, শুনে আসি।'

অপেক্ষা করল না রবিন, ঘুরে রওনা হয়ে গেল।

আবার ফিরে এল দুই জাপানী। হ্যারিকিরির সঙ্গী কিশোরকে বলল, 'আরেকটা প্রশ্ন, কোথায় পেয়েছ কবুতরটা?'

এটাও ভেবে দেখল কিশোর। মিথ্যা বলতে বাধে তার, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি এমনই একটা কাজ, সময়ে না বলেও পারা যায় না। এ-ক্ষেত্রে মিছে কথা বলার দরকার আছে কিনা, ভাবল। সেটা কি অন্যায় হবে? বোধহয় না। কারণ, তার মক্কেলের সপক্ষে বলতেই হবে তাকে, আর মিস কারমাইকেল তার মক্কেল।

'পথের ওপর পেয়েছি,' মিছে বলল না কিশোর, কিন্তু খোলাসাও করল না।

'কোন পথে?'

'শহরের পুব ধারের একটা পথ।'

আবার হাসল লোকটা। 'তৃতীয় প্রশ্ন, কি করে মারা গেছে কবুতরটা, জানো?'

'না,' সত্যিই জানে না কিশোর। তবে জানতে পারলে ভাল হত।

'দেখে কি মনে হয়েছে? গুলি-টুলি করে মেরেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, রবিন আসছে। 'আর যেভাবেই মারা হোক, গুলি নয়, এটা ঠিক।'

'গুড। থ্যাংক ইউ,' বলে হ্যারিকিরিকে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো লোকটা।

পৌঁছে গেল রবিন।

দুই লাফে এগিয়ে গিয়ে প্রথম লোকটার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'আমি তো আপনার কথার জবাব দিলাম, এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, প্লীজ?'

এইবার লোকটার ভাবনার পালা। ভেবে নিয়ে বলল, 'কি প্রশ্ন?'

'মেসেজে লেখা ছিল ঃ আজ মুক্তো নেই। মিস্টার মিটসুশিতা অনুবাদ করে তো তাই বললেন।'

'হ্যাঁ।'

আড়চোখে রবিনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর, ছোট্ট যন্ত্রটা আছে। লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'এর মানে কি?' বোকার অভিনয় খুব ভাল করতে পারে কিশোর, এ-মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে তার মত হাঁদারাম, মাথামোটা ছেলে দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। 'কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কিসের মুক্তো, কিসের আজ?' বোকার মতই হাত নাড়ল সে।

হ্যারিকিরির দিকে তাকাল লোকটা, এই সুযোগে পাশে দাঁড়ানো রবিনের গায়ে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।

ফিরল লোকটা, হাসল। 'খুব সহজ। আমার বন্ধু হ্যারিকিরি তরকারির চাষ করে। খেত আছে। জাপানী পাড়ায় বাজারে বিক্রি করে সেই তরকারি। খেতগুলো বাজার থেকে দূরে, উপকূলের কাছে। দোকানদাররা জানতে চায়, কি তরকারি আছে তার কাছে···'

হাঁ করে আছে কিশোর, বোকা বোকা দৃষ্টিতে সামান্যতম পরিবর্তন নেই। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে, ভ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রবিন।

পৌঁছল রবিন। পেছনের বাম্পারের কাছে দাঁড়িয়ে চট করে একবার নিচু হয়েই সোজা হলো।

'···কাজেই খবর জানাতে হয় হ্যারিকিরিকে,' বলে যাচ্ছে লোকটা। 'কবুতর দিয়ে মেসেজ পাঠাতে পয়সা লাগে না, তাছাড়া তাড়াতাড়িও হয়, তাই পুরানো পদ্ধতিই বেছে নিয়েছে আমার বন্ধু। লিখে দেয় ঃ আজ শালগম আসছে, আজ বাঁধাকপি কিংবা গাজর।'

হাত নাড়ল রবিন। দু-হাতের মুঠোই খোলা, তারমানে কাজ হয়ে গেছে।

'তাই নাকি?' খুব অবাক হয়েছে কিশোর। 'আপনার বন্ধু কি মুক্তোও ফলায় নাকি? ওগুলো সব্জি না ফল?'

জোরে হেসে উঠল লোকটা। মনে মনে 'আস্ত গর্দভ' ভাবছে কিশোরকে, বুঝল

কিশোর। 'মুক্তো সব্জিও না, ফলও না। সাগরে হয়, ঝিনুকের পেটে, একধরনের মূল্যবান পাথর। আমার বন্ধু যে মুক্তোর কথা লিখেছে, সেটা পেঁয়াজ। মুক্তো-পেঁয়াজ বলে।'

'অ। থ্যাংক ইউ,' বলল কিশোর। 'আপনার কাছে অনেক কিছু জানা গেল।'

কিশোরকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল লোকটা। তার পাশে বসল হ্যারিকিরি। স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

গাড়িটা মোড়ের কাছে পৌঁছতেই লাফিয়ে উঠল কিশোর। 'রবিন, জলদি, ট্র্যাকারটা।'

বুদ্ধি করে নিয়েই এসেছে রবিন, গেটের ভেতরে এক জায়গায় রেখে এসেছে। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। ছোট একটা বাক্স মত, তাতে অ্যান্টেনা লাগানো। পুরানো আমলের একটা রেডিওকে পরিবর্তন করে বীপারের সিগন্যাল ধরার যন্ত্র বানিয়েছে কিশোর। সুইচ টিপে ডায়াল ঘোরাল সে।

বীপ। বীপ। বীপ।

স্পষ্ট শব্দ ভেসে এল যন্ত্রটার স্পীকারে। কাজ করছে ভ্যানের বাম্পারে লাগানো বীপার, চুম্বকের সাহায্যে ওটাকে আটকে দিয়েছে রবিন।

অ্যান্টেনাটা দক্ষিণে ঘোরাল কিশোর।

আরও স্পষ্ট হলো বীপ-বীপ।

'উপকূলের দিকে যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'চলো, আমরাও যাই।'

বলতে হয়নি, ইতিমধ্যেই এক এক করে তিনটে সাইকেল গেটের বাইরে নিয়ে এসেছে মুসা।

দ্রুত প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে ওরা। নিজের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ট্র্যাকারটা বেঁধে নিয়েছে কিশোর। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে অ্যান্টেনার মাথা ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। শব্দের কম-বেশি শুনে অনুমান করছে, কোনদিকে গেছে ভ্যান।

গাড়ির খুব বেশি কাছে যাওয়ার দরকার নেই, এক মাইল দূর থেকেও সঙ্কেত দেবে বীপারটা। সহজেই অনুসরণ করতে পারছে কিশোর। গাড়ি এখন স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে না গেলেই বাঁচি—মনে মনে বলল সে।

আট

কয়েক মিনিট পুরোদমে প্যাডাল ঘোরানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সবুজ ভ্যানটা স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে না, এমনকি সান্তা মনিকার দিকেও নয়। সোজা শহরের দিকে।

সিগন্যালের শব্দ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে কোনদিকে কখন মোড় নিচ্ছে গাড়িটা। রকি বীচের মেইন স্ট্রীট দিয়ে চলেছে এখন। ইশারায় গতি কমানোর নির্দেশ দিল দুই সহকারীকে কিশোর। সিগন্যাল অনেক জোরাল, তারমানে খুব কাছেই রয়েছে গাড়ি। ট্র্যাফিক পোস্টে লাল আলো দেখে থেমেছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি চলে

ওটার একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়তে চায় না সে। রিয়ার ভিউ মিররে তাদের দেখে ফেলতে পারে হ্যারিকিরি বা তার সঙ্গী।

রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান আর ট্রাসটি ব্যাঙ্ক পেরোল ওরা। হঠাৎ থেমে গেল বীপ-বীপ। হাত তুলে মুসা আর রবিনকে থামার নির্দেশ দিল কিশোর। এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাইকেলেই বসে রইল। এদিক ওদিক ঘোরাল ট্র্যাকারের অ্যান্টেনা। বাঁয়ে ঘোরাল, শব্দ নেই। পুরো ডানে ঘোরাতেই আবার শোনা গেল বীপ-বীপ।

সামনে পথটাকে আড়াআড়ি কেটেছে আরেকটা পথ, শহরের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। সে-পথেই এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

রাস্তায় মোড় আর ঘোরপ্যাচ এত বেশি এখন, সিগন্যাল শুনে ভ্যানটাকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই আছে জোরাল বীপ-বীপ, পরক্ষণেই কমতে কমতে একবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সিগন্যাল ধরার জন্যে বার বার অ্যান্টেনা ঘোরাতে হচ্ছে, তবে বিশেষ ভাবছে না কিশোর। আন্দাজ করে ফেলেছে, কোথায় যাচ্ছে ভ্যান।

রকি বীচের উত্তর-পশ্চিমে নিচু পাহাড়শ্রেণীর ঢালের গায়ে আর পাদদেশে বেশ কিছু বাড়িঘর আছে। জায়গাটা লিট্‌ল্ টোকিও নামে পরিচিত, রকি বীচের জাপানী পল্লী।

লিট্‌ল্ টোকিওর সীমানায় পৌঁছেই আবার থামার নির্দেশ দিল কিশোর। শ-খানেক গজ দূরে একটা একতলা বাড়ির গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ভ্যান।

পথের ধারে সাইকেল রাখল তিন গোয়েন্দা, গাছের সারির আড়ালে লুকিয়ে চোখ রাখল বাড়িটার ওপর।

'হ্যারিকিরির বাড়ি নাকি?' বলল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে।

গাড়িবারান্দায় একজন লোক, গাড়িটার পাশ কাটিয়ে আসছে। বাড়ির ভেতরে থেকেই বেরিয়েছে মনে হয়। রাস্তায় এসে নামল লোকটা। আরেকটা লাল গাড়ি পার্ক করা ওখানে, তাতে চড়ে চলে গেল।

'হ্যারিকিরি?' শিওর হতে পারছে না রবিন। সব জাপানীর চেহারাই এক রকম লাগে তার কাছে।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'তার সঙ্গী।'

কিশোরের দৃষ্টিশক্তির ওপর পুরো আস্থা রয়েছে রবিনের, তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'কি করে বুঝলে?'

'সহজ। ওর হাঁটা, ওর চোখ, ওর কান। কেন, আরেকটা জিনিস খেয়াল করোনি? কোমরের বেল্ট, আর প্যান্টে লেগে থাকা গ্রিজের দাগ?'

খেয়াল করেনি রবিন। অতি সাধারণ জিনিস বলেই।

'তাহলে, ধরে নিতে অসুবিধে নেই, ওটা হ্যারিকিরিরই বাড়ি,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'কিন্তু এই *ধরে নেয়ার* ব্যাপারটায় মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। শিওর হওয়া দরকার। ডাকবাক্সটায় নাম দেখলে বোঝা যাবে কার বাড়ি।'

ডাকবাক্স দেখতে হলে বাড়ির কাছে যেতে হবে। বাক্সটা এপাশে আছে না ওপাশে, বলা যাচ্ছে না, ওপাশে থাকলে বাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

'রবিন তুমি যাও,' বলল কিশোর। 'মুসা বেশি লম্বা। আমারও চুল বেশি কোঁকড়া, দূর থেকেই চোখে পড়ব দুজনে। জানালার কাছে যদি হ্যারিকিরি থাকে, সহজেই আমাদের চিনে ফেলবে। তোমার উইণ্ডচীটারটা খুলে চুলগুলো এলোমেলো করে নাও। আর দশজন আমেরিকান ছেলের সঙ্গে তোমার তফাত বুঝতে পারবে না সে, তুমি যেমন জাপানীদের আলাদা করে চিনতে পারো না।'

'ও-কে,' আর দশটা সাধারণ ছেলের মতই দেখতে, জেনে খারাপ লাগছে রবিনের। তবে সে চোখে পড়ার মত নয় বলে গোয়েন্দাগিরিতে উন্নতি করতে পারবে ভেবে ভালও লাগছে। চিঁয়াত করে চেন টেনে উইণ্ডচীটার খুলে কিশোরের হাতে দিয়ে রওনা হলো রবিন।

গাড়িবারান্দার ধারেই রয়েছে সাদা রঙ করা ডাকবাক্স। দেখেও থামল না রবিন, সোজা হেঁটে গেল আরও খানিকটা—যেন এখানকার কোন কিছুর প্রতি কোন আগ্রহই নেই তার—তারপর থেমে ফিরে তাকাল।

লেখা রয়েছে ঃ এম হ্যারিকিরি।

সাদা বাক্সে উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে রয়েছে। পড়তে কোন অসুবিধে হলো না। ঘুরে আবার পা বাড়াতে যাবে, এই সময়েই জাগল সন্দেহটা। মনে হলো, হ্যারিকিরির আগে আরেকটা নাম লেখা ছিল ঠিক ওই জায়গাটাতেই।

নিশ্চিত হতে হলে ভালমত দেখা দরকার। তার জন্যে আরও কাছে যেতে হবে। ঝুঁকিটা নেবে সে ঠিক করল।

ঠিকই সন্দেহ করেছে রবিন। সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আগের লেখা, তবে তেমন যত্ন নেয়নি, নইলে চোখে পড়ত না। কখন রঙ করা হয়েছে? সতর্ক দৃষ্টিতে বাড়ির দিকে তাকাল সে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরও এগোল, চলে এল বাক্সের একেবারে কাছে। ছুঁয়ে দেখল, আঠা আঠা লাগে। হুঁ, বেশিক্ষণ হয়নি, তাই এমন চকচকে। বাড়িও কি এই কিছুক্ষণ আগে বদলাল নাকি হ্যারিকিরি?

কাজের কাজ করেছি একটা, নিজের প্রশংসা না করে পারল না রবিন। কিশোরও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত কিনা সন্দেহ। বন্ধুদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে তাড়াতাড়ি ঘুরে রওনা হলো সে।

দুই কদম এগিয়েই শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রবিন, স্থির হয়ে গেল পাথরের মত। গাড়িবারান্দার ওধার থেকে আসছে একজন লোক। বেঁটে, কালো কোট গায়ে, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল। কালো চশমা নেই এখন চোখে।

'এই ছেলে, শোনো, এই,' ডাকল রিচার্ড হ্যারিস।

দৌড়ে পালাতে চাইল রবিন। পারল না। পা কথা শুনছে না। অনেক সময় দুঃস্বপ্নে যেমন প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাত-পা নাড়ানো যায় না, অনেকটা যেন সেই রকম।

কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারিস। লোকটার হাতে লাঠি নেই, কিন্তু তাতে কি? পকেটে পিস্তল তো থাকতে পারে।

'ভালই হলো,' বলল হ্যারিস, 'তোমাদেরকেই খুঁজছি মনে মনে।'

ঠোঁট ভালমত দেখা যায় না, ফলে হাসছে কি না বোঝা গেল না। তবে চোখ দুটো আন্তরিকতা মাখানো বলে মনে হলো রবিনের।

'অন্যেরা কোথায়? তোমার বন্ধুরা?'

ভেবেছিল হাতও নড়াতে পারবে না, কিন্তু পারল, হাত তুলে দেখাল রবিন রাস্তার দিকে। হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বাঁধা ট্র্যাকারটা রবিনের উইণ্ডচীটার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে কিশোর।

'লিট্‌ল্ টোকিওতে প্রায়ই আসো তোমরা?' জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।

'জাপানী রেস্টুরেন্টে খেতে আসি,' জবাব দিল কিশোর। 'জাপানী খাবার মুসার খুব পছন্দ।'

'হ্যাঁ, ভাল খাবার। বিশেষ করে ফুজিয়ামা, আমিও যাই মাঝেমধ্যে,' বলল হ্যারিস। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রবিন। 'চলো না আজও যাই। আমি লাঞ্চ খাওয়াব তোমাদের?'

দ্বিধা করছে কিশোর, কি জবাব দেবে? শেষবার যখন হ্যারিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছিল। তার আগের বার লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই লোকই এখন লাঞ্চের দাওয়াত দিচ্ছে, ঘটনাটা কি?

'ঠিক আছে, খাইয়ে যদি খুশি হন,' অবশেষে বলল কিশোর। 'আমাদের আপত্তি নেই। থ্যাংক ইউ।'

'চলো তাহলে,' হাঁটতে শুরু করল হ্যারিস। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা, যার যার সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে।

কিশোরের কাছাকাছি রইল রবিন। ফিসফিস করে বলল, কি কি দেখে এসেছে।

নীরবে মাথা নোয়াল শুধু কিশোর।

রেস্টুরেন্টের বাইরে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল ওরা।

ছেলেদেরকে নিয়ে কোণের একটা বড় টেবিলে এসে বসল হ্যারিস।

ওয়েইটার এসে জাপানী ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল, হ্যারিসও একই ভাষায় জবাব দিল।

বাহ্ গহনার দোকানের মালিক দেখছি আবার ভাষাবিদও—মনে মনে বলল মুসা। তা অর্ডার কি দিল? সাপ-ব্যাঙ না হলেই বাঁচি এখন।

'জাপানে ছিলাম কয়েক বছর,' ছেলেদেরকে জানাল হ্যারিস। 'মুক্তোর ব্যবসা করতাম। সেখানেই ভাষাটা শিখেছি।'

শুরুতেই চা নিয়ে এল ওয়েইটার। সবার কাপে কাপে ঢেলে দিল হ্যারিস। আবার চেয়ারে বসে বলল, 'জানালাম, তোমরা গোয়েন্দা।'

এইবার হাসিটা দেখতে পেল রবিন। কিছু বলল না। অন্য দুজনও চুপ।

'মিস কোরিন কারমাইকেল তোমাদের মক্কেল,' আবার বলল হ্যারিস। 'পাখি খুনের তদন্ত করছ।'

মাথা নোয়াল কিশোর।

'হ্যারিকিরি বলল একটা মরা কবুতরের পায়ে বাঁধা একটা মেসেজ পেয়েছ তোমরা।'

আবার মাথা নোয়াল কিশোর, মুখে কিছু বলল না।

'বাজারে যে তরকারী সাপ্লাই দেয়, সে ব্যাপারে নাকি কিছু লেখা ছিল।'

'হ্যাঁ, মুক্তো-পেঁয়াজ,' বলল কিশোর।

ওয়েইটার ফিরে আসায় আলোচনায় বাধা পড়ল। ছোট ছোট ডজনখানেক ডিশ টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

নীরবে খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।

'কবুতরটা কি মিস কারমাইকেলের বাগানে পেয়েছ?' মুখ তুলল হ্যারিস।

'না,' কিশোরের মুখভর্তি সরু চালের ভাত, স্যামন মাছ, বাঁশের কোঁড় আর নোনা সালাদ, চমৎকার খাবার। গিলে নিয়ে বলল, 'রাস্তায় পেয়েছি।' হ্যারিকিকে যা যা বলেছে, হ্যারিসকেও ঠিক তাই বলবে।

আবার নীরবে খেয়ে চলল হ্যারিস। শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল। তারপর হাত ঢোকাল পকেটে।

স্থির হয়ে গেছে মুসা, মুখের সামনে থেমে গেল কাঁটাচামচে গাঁথা মাছের টুকরো। পিস্তল বের করবে না তো লোকটা? এই প্রকাশ্য জায়গায় সাহস পাবে?

মানিব্যাগ বের করল হ্যারিস।

'ব্যাপার হলো কি জানো মিস কারমাইকেল আমার খুব ভাল বন্ধু, খুব দামী কাসটোমার,' ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হলো তার চোখ। 'পাখি কি-রকম ভালবাসে জানি, ওগুলো মারা পড়লে কতখানি দুঃখ পায় তা-ও জানি। ওকে সাহায্য করতে চাই আমি, যতটা পারি,' মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, এটা রাখো। তোমাদের ফিসের কিছুটা, আগাম। তদন্ত চালিয়ে যাও। দরকার হলে আরও দেব। কে পাখিগুলোকে খুন করেছে,' ব্যাগটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'জানার চেষ্টা করো।'

'থ্যাংক ইউ,' নোটটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল কিশোর। 'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমতই করব,' বাইরে বেরিয়ে সাইকেলের তালা খুলতে খুলতে আরেকবার বলল কিশোর, চোখ হ্যারিসের দিকে, চলে যাচ্ছে গহনার দোকানের মালিক।

'নিশ্চয় করব,' বলল মুসা, 'পঞ্চাশ ডলার···' থেমে গেল কিশোরের দিকে তাকিয়ে।

চিন্তায় মগ্ন গোয়েন্দাপ্রধান, তার কথা শুনছে বলে মনে হলো না।

'ওর দোকানে টমকে নিয়ে গেলাম,' বিড় বিড় করল কিশোর। 'পায়রাটা তার প্রয়োজন হলে সে বলত ঃ হ্যাঁ, চিনেছি। জানি, কার। রেখে যাও, মালিকের কাছে

ফিরিয়ে দিয়ে আসব।' মাথা নাড়ল সে, যেন কিছু একটা ব্যাপার বিশ্বাস হচ্ছে না। 'তা না করে বলল ঃ জীবনে দেখিনি। পায়রাটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, তা-ও কিছু বলল না। তারপর, পিস্তল দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।' থামল এক সেকেণ্ড, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আবার মাথা নাড়ল। 'মিস কারমাইকেলের বাগানে রাতের অন্ধকারে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। সবশেষে, আজ ডেকে এনে লাঞ্চ খাওয়াল...' ভ্রুকুটি করল। 'হ্যাঁ, লাঞ্চ খাওয়াল। টাকাও দিল। পাখির খুনীকে ধরে দিতে পারলে আরও টাকা দেবে বলল। অবাকই লাগছে, এতগুলো পরস্পর বিরোধী কাণ্ড। কিন্তু সব চেয়ে অবাক করেছে রিচার্ড হ্যারিস,' হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল সে।

'কি?' খেই ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। 'বলো না, কি? কেন অবাক করল রিচার্ড হ্যারিস?'

'শুধু রাতের বেলা কালো কাচের চশমা পরে।'

নয়

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা, মাথা নেড়ে বারণ করছে কিশোর। কথা বলা বৃথা এখন। চেঁচামেচির জন্যে বোঝা যাবে না ঠিকমত, অযথা চেঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে।

হ্যারিস যেদিন লাঞ্চ খাইয়েছে তার পরদিন শেষ বিকেলের ঘটনা। সাইকেল নিয়ে মিস কারমাইকেলের বাড়ি এসেছে তিন গোয়েন্দা।

লিট্‌ল্ টোকিও থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েই মহিলাকে ফোন করেছিল কিশোর, পরদিন সকালে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। পেয়েছিল অনুমতি, কিন্তু সকালে বেরোতে পারল না। কোথা থেকে জানি বিশাল এক পুরানো রেফ্রিজারেটর আর কতগুলো বাতিল পুরানো আমলের লোহার চুলা নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা। বরাবরের মতই চাচী গেছেন রেগে। তাঁদের ঝগড়া থামাতে হয়েছে কিশোরকেই, এরপর কাজে লাগতে হয়েছে। তার ওপর আগের রাতে হয়েছে বৃষ্টি। বাইরে চত্বরে ফেলে রাখা কিছু জিনিস মুছে গোছগাছ করতে করতে দুপুর। খেয়ে ইয়ার্ডের আরও কিছু জরুরী কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে একেবারে বিকেল।

আজ আর রাত করবে না, ভাবল কিশোর। কাজ শেষ করে রাতের আগেই ফিরে যাবে। কে জানে, আজ কি নিয়ে ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করছে রিচার্ড হ্যারিস। হয়তো ইয়া বড় এক রাম দা। ঘাড়টা নাগালে পেলেই দেবে কোপ মেরে।

বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন মিস কারমাইকেল। কালো মখমলের লম্বা হাতাওয়ালা পোশাক পরেছেন, শোক প্রকাশের জন্যে। বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে।

'দেখো,' আর কিছুই বলতে পারলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন টেবিলের দিকে।

সাদা কাপড়ের ওপর পড়ে আছে আরেকটা বাজ পাখি।

টেবিলের দিকে এগোচ্ছে মুসা, কি মনে করে মিস কারমাইকেলের কাঁধ থেকে উড়ে এসে মুসার মাথার ওপর এক মুহূর্ত ফড়ফড় করল তোতাটা, তারপর কাঁধে বসে পড়ল।

'কি নিষ্ঠুর!' রীতিমত ফোঁপাচ্ছেন এখন মিস কারমাইকেল।

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল তোতাটা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

মরা বাজটাকে পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। অন্য বাজটার মত এটাকেও বোধহয় বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

'কখন পেয়েছেন এটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

সামলে নেয়ার চেষ্টা করলেন মিস কারমাইকেল, ফোঁপানী বন্ধ হয়েছে, তবে বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মোছা থামেনি। 'এই তো, খানিক আগে।'

'কোথায়?'

'আগের জায়গায়,' ঢোক গিললেন, আঙুল বোলালেন মুক্তোর হারে। 'স্টীলকে যেখানে পেয়েছিলাম সেখানেই।'

'বাজের খাবার যেখানে রেখে আসেন?'

নীরবে মাথা ঝোঁকালেন মিস কারমাইকেল।

মহিলার অবস্থা দেখে খারাপই লাগছে কিশোরের, সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'আপনার এখন মনের অবস্থা কেমন, বুঝতে পারছি। তবু দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব যদি দেন…'

নীরবে মাথা কাত করলেন মিস কারমাইকেল। মুক্তোর হারে আঙুল বুলিয়েই চলেছেন, বোধহয় বেদনা কিছুটা লাঘব হচ্ছে এতে।

'চেষ্টা করব,' বললেন তিনি।

'আগের বার যখন এসেছিলাম,' বলল কিশোর, 'আপনার পোষা দোয়েল, হীরা…' থেমে গেল সে, আবার না পুরানো শোক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মহিলার, কেঁদে ফেলেন, তাহলে তার প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আর আশা নেই।

কিন্তু কাঁদলেন না মিস কারমাইকেল, মাথা ঝাঁকালেন শুধু।

'আপনি বলেছেন, পাখিটা নাকি নানারকম জিনিস কুড়িয়ে আনার ওস্তাদ ছিল।'

'মুক্তো,' প্রিয় অতীতের কথা মনে করে মলিন হাসি ফুটল মিস কারমাইকেলের ঠোঁটে। 'তিন তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল আমাকে।'

'বলেছিলেন, দুটো দোয়েল আছে আপনার। আরেকটার নাম কি?'

'পান্না।'

'সে-ও কি জিনিস এনে দেয়?'

'মাঝেমধ্যে,' রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন মিস কারমাইকেল, আর কাঁদবেন না স্থির করেছেন বোধহয়, 'কিন্তু হীরার তুলনায় পান্না কোন কাজেরই না। যত সব অকাজের জিনিস কোত্থেকে গিয়ে নিয়ে আসে, একেবারেই বাজে।'

মরা বাজটার দিকে চেয়ে আনমনে ঠোঁট কামড়াচ্ছে কিশোর। 'কখনও কোন মেসেজ এনে দিয়েছে?'

'মেসেজ?'

'এই, কাগজের টুকরো। তাতে লেখা-টেখা কিছু?'

'না আনেনি। তেমন কিছু কখনও আনলে মনে থাকত। এই তো, আজ সকালে···দেখো না, কি এনেছে। দেখতে চাও?'

অবশ্যই দেখতে চায়, জানাল কিশোর।

সাইড টেবিলের ওপর থেকে একটা কাঁচের অ্যাশট্রে নিয়ে এলেন মিস কারমাইকেল। বাড়িয়ে ধরলেন কিশোরের দিকে।

দেখল কিশোর। চুল দিয়ে পাকানো খুদে একটা বল। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল সে। খসখসে, কালো কোঁকড়ানো চুল দিয়ে তৈরি। দোয়েল পাখির আজব খেয়াল, অনেক সময় নিয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আশ্চর্য নৈপুণ্যে বানিয়েছে বলটা। মিস কারমাইকেলের অনুমতি নিয়ে যত্ন করে বলটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'আচ্ছা, কোথায় পেয়েছে এটা, বলতে পারবেন?'

'না,' অ্যাশট্রেটা আবার আগের জায়গায় রেখে এলেন মিস কারমাইকেল। 'হীরা ও মুক্তোগুলো কোত্থেকে এনেছিল, জানি না।'

জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। বেলা শেষ, তবে আঁধার হতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকি। মুসা আর রবিনকে বলল, 'চলো যাই, আরেকবার ঘুরে দেখিগে বাগানে।' মিস কারমাইকেলের দিকে ফিরল, 'আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না না, আপত্তি থাকবে কেন? তোমরা যা করছ আমার জন্যে, কে কার জন্যে করে? মিস্টার হ্যারিসের কাছেও আমি ঋণী। কিন্তু বাবা, কিছু মনে কোরো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। সইতে পারব না,' রুমাল বের করলেন তিনি। 'আবার যদি কিছু দেখি···' গলা কেঁপে উঠল তাঁর।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি থাকুন,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কিশোর।

বিশাল জানালা দিয়ে কোলাহলের মধ্যে বেরিয়ে এল ওরা। তোতাটা বসে আছে মুসার কাঁধে। ওদের সঙ্গে বাগানে ঘোরার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। মুসা থাকতে দিল পাখিটাকে, টমের মতই তোতাটাকেও পছন্দ হয়েছে তার।

লনের প্রান্তে খোয়া বিছানো পথের ধারে এসে থামল ওরা। খানিক দূরে গাছ, যেটার তলায় মরে পড়ে ছিল দুটো বাজপাখি। আজ জায়গাটা পরিষ্কার। মাংসের টুকরো পড়ে নেই, পায়ের ছাপ নেই।

'চলো,' বনের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'আলাদা হওয়ার দরকার নেই। এক সঙ্গে যাই।'

'সেটাই ভাল,' গলা ফাটিয়ে জবাব দিল মুসা। 'রিচার্ড হ্যারিসের লাঠির বাড়ি খেতে চাই না। তার মেজাজ আজ ভাল না মন্দ কে জানে।'

এক ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করল তিন গোয়েন্দা, বনের ভেতর, ঝোপের ধারে, সরু পথে। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি নরম হয়ে আছে কোথাও কোথাও। আজ আর কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ হলো না।

অবশেষে বনের ধারে ঘাসে ঢাকা ছোট একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। আশ্চর্য নীরবতা এখানে। কোলাহলকারী পাখিরা যেন এড়িয়ে চলে

জায়গাটাকে, ওদের কলরব অনেক পেছনে।

শুকনো জায়গা দেখে বসে পড়ল কিশোর। হাঁপিয়ে উঠেছে, জিরিয়ে নেবে।

মুসা পা ছড়িয়ে বসল তার পাশে। খানিকদূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসল রবিন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক গেল। একটা রবিন এসে বসেছে তাদের কয়েক গজ সামনে, ভেজা মাটি থেকে ঠুকরে কেঁচো বের করে খাচ্ছে। আনমনে পাখিটাকে দেখছে মুসা।

নাহ, এবার ওঠা দরকার। উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় একসঙ্গে তিনটে ঘটনা ঘটল, চোখের পলকে।

আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে তোতাটা উড়ে গেল মুসার কাঁধ থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়েই চমকে গেল রবিনটা। কালো একটা ছায়া পাথরের মত এসে পড়ল তার ওপর। পালানোর কোন সুযোগই পেল না পাখিটা। ভয়ানক এক শিকারী বাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ধারাল নখ আর ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে রবিনের শরীরটা নিমেষে ছিঁড়ে ফেলে, যা যা খাওয়ার বের করে নিল বাজ। মাংসটা নখে ঝুলিয়ে নিয়ে উড়ে চলে গেল রকেটের মত। মাটিতে পড়ে রইল শুধু রবিনের মাথা, পা দুটো আর কয়েকটা রক্তাক্ত পালক।

পুরো এক মিনিট কোনও কথা বলতে পারল না তিন কিশোর। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে যেন ওরা।

গাছের ডাল থেকে ফিরে এসে আবার মুসার কাঁধে বসল তোতাটা। 'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

'ঠিকই বলেছিস,' পাখিটার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'তবে রবিনটা জীবন দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল আমাদের, দু-আঙুলে পায়রাটাকে কে খুন করেছে।'

'এবং কেন বাজ মারছে কেউ,' যোগ করল রবিন। 'রেসিং হোমারদের খুন করে বলেই তো বাজ মারে, নাকি?'

'হ্যাঁ,' পকেট থেকে কাগজে মোড়া চুলের বলটা বের করল কিশোর। মোড়ক খুলে তাকাল। 'কিন্তু কে বিষ খাওয়াচ্ছে জানি না এখনও। হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে কে, তা-ও জানি না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'পায়ের ছাপ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, মাটি জায়গায় জায়গায় এখনও ভেজা, ছাপ থাকতে বাধ্য। আমরা খুঁজে পাইনি, কিন্তু আছেই।' আকাশের দিকে তাকাল। 'এসো, যাই। আরও এক ঘণ্টা আলো থাকবে। এবার ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাব, ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব। মুসা, তুমি এদিকে যাও, রবিন তুমি ওদিকে। মাটিতে প্রতিটা ইঞ্চি দেখবে, বিশেষ করে কাদামাটি যেখানে আছে।'

'কিছু দেখলে কিভাবে জানাব?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কি সঙ্কেত?'

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'জোরে জোরে গাইবে।'

'দি হাইমস অভ দা ব্যাটল?'

'না। অন্য সুর। এসো, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও। আমার সোনার বাংলা...'

কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে বার কয়েক গেয়ে প্র্যাকটিস করে নিল মুসা আর রবিন। তারপর নিজে নিজে গাইল. কিশোরের চেয়ে গলা ভাল দুজনেরই, রবিন তো চমৎকার গাইল।

পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। মুসা খুঁজে পেল, মিনিট পনেরো পরে। সরু পথ ধরে এগিয়ে গেছে একজোড়া বুটের ছাপ, ভেজা নরম মাটিতে বেশ গভীর হয়ে বসেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। আলো নিভে আসছে দ্রুত। রাতের সাড়া পেয়েই কলরব কমিয়ে দিয়েছে পাখির দল, শব্দ এখন অনেক কম। আবছা অন্ধকার বনপথে দাঁড়িয়ে অকারণেই গা ছমছম করে উঠল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে, মাথায় ডাণ্ডা মারতে আসছে না-তো আবার কেউ?

গান গাওয়ার জন্যে মুখ খুলল মুসা।

কিন্তু সুর ভুলে গেছে। অথচ তখন বেশ গেয়েছিল, এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেল? গেছে, কি আর করবে। চেষ্টা করল, 'আ-আমার সোনার···দূর হচ্ছে না।' আবার চেষ্টা করল। হলো না।

'আমার সোনার বাংলা,' গেয়ে উঠল কাঁধে বসা তোতাটা, চমৎকার শিখে নিয়েছে, সুরও বেশ হয়েছে।

'ধন্যবাদ, তোতামিয়া,' হেসে আলতো চাপড় দিয়ে পাখিটাকে আদর করল মুসা। 'সাধনা করলে ওস্তাদ হতে পারতে।' গলা চড়িয়ে গাইল, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

কাছাকাছিই রয়েছে কিশোর আর রবিন, সাড়া মিলল সঙ্গে সঙ্গেই।

মিনিটখানেক পরই আবার একসাথ হলো তিনজনে।

গভীর মনোযোগে বুটের ছাপগুলো দেখল কিশোর। পকেট থেকে আবার বের করল চুলের বল। 'তাড়াতাড়িই পেয়েছ, মুসা, গুড। এগুলো হ্যারিসের নয়। গতকাল ওর সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় ভালমত দেখেছি ওর জুতো। অনেক ছোট পা, জুতোর নাক ভোঁতা। সুতরাং,' চুলের বলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা হ্যারিসের দাড়ি নয়। কাঁটা ঝোপে আটকে তার দাড়ি ছেঁড়েনি, যেটা খেলার সময় পেয়ে গিয়ে বল বানিয়েছে পান্না।'

আপাতত আর কিছু দেখার নেই। বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, যেখানে সাইকেল রেখেছে সেখানে।

দোতলায় মিস কারমাইকেলের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। কিশোর অনুমান করল, তিনি শুয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে শোক ভুলতে চাইছেন।

'তাঁকে জানানোর মত এখনও কিছু আবিষ্কার করিনি আমরা,' কারও উদ্দেশে কথাগুলো বলছে না কিশোর। 'যা জানি, শুধুই অনুমান।'

'ব্লিংকির পায়ের ছাপ সন্দেহ করছ?' রবিনের মনে পড়েছে, কিশোর বলেছিল, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে চোখা মাথাওয়ালা বুট পরা ছিল স্লেটারের পায়ে।

'তাকে পয়লা সন্দেহ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। 'দ্বিতীয় সন্দেহ হ্যারিকিরি। আমার ধারণা, সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি ওই জাপানীটা।'

'কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'মেসেজটা হ্যারিকিরিই লিখেছে ঃ আজ মুক্তো নেই,' এক আঙুল তুলল কিশোর। দুই আঙুল তুলে বলল, 'লিট্‌ল্ টোকিওর হ্যারিকিরির বাড়িতেই গিয়েছিল রিচার্ড হ্যারিস।' তিন আঙুল তুলল, 'আর স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে হ্যারিকিরির জন্যেই অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'পরিষ্কার হচ্ছে।'

'রবিনের সৌজন্যে জেনেছি, কেন অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি, আর কেনই বা ছুটে গিয়েছিল সবুজ ভ্যানকে অনুসরণ করার জন্যে।'

'আমার সৌজন্যে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'হ্যাঁ, তাই তো। তুমিই তো দেখে এসেছ, হ্যারিকিরির ডাকবাক্সে নতুন রঙ করা হয়েছে, তারমানে নতুন বাড়ি বদলেছে জাপানীটা। এটাই জানতে চেয়েছিল ব্লিংকি কোথায় নতুন বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।'

'কেন?'

'সেটাই জানতে হবে আমাদের। হ্যারিকিরির সঙ্গে ব্লিংকির কি সম্পর্ক, আর মুক্তোরই বা কি সম্পর্ক।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, 'সবুজ ভ্যানটাকে আবার অনুসরণ করতে হবে আমাদের। জানার এটাই একমাত্র উপায়।'

'বীপার তো লাগানোই আছে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওটা দিয়ে আর কাজ হবে না। নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। হ্যারিকিরির বাড়ি গিয়ে ব্যাটারি বদলে দিয়ে আসা খুব ঝুঁকির ব্যাপার।'

'তাহলে?'

'কাজটা তোমাকেই করতে হবে, মুসা,' গোয়েন্দা-সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। দু-হাত নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই ভয়ই করছিলাম। কপালই খারাপ। যত কঠিন আর ঝুঁকির কাজ, সব এই মুসা আমানের ঘাড়ে। কি আর করব, মাথায় তো আমারই সইবে...,' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা জনাব, কাজটা কি?'

'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তোতা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

'দূর ব্যাটা!' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'চুপ থাক!'

তোতাটাও বলল, 'দূর ব্যাটা! চুপ থাক!'

দশ

পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল মুসা। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জীনসের প্যান্ট পরে নিল। ধূসর সোয়েটার গায়ে দিল। তারপর স্নীকার পায়ে দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এল নিচে, রান্নাঘরে, যা-ই পাওয়া যায় কিছু মুখে দিয়ে

বেরোবে।

রান্নাঘরের টেবিলে পড়ে আছে একটা কালো সানগ্লাস, গতরাতে নিশ্চয় তার বাবা ফেলে গেছেন। চশমাটা নেবে কি নেবে না ভাবতে ভাবতেই গিয়ে ফ্রিজ খুলল। ঠাণ্ডা কেক ছাড়া আর কিছু নেই, তা-ই বের করে নিল গোটা দুয়েক, তারপর একটা গ্লাসে দুধ ঢেলে নিয়ে এসে বসল টেবিলে।

চশমা পরলে কি তার চেহারা বদলে যাবে? তাকে দেখলে তখন চিনতে পারবে হ্যারিকিরি?

চশমাটা নেবে ঠিক করল মুসা। দরকার হলে পরতে পারবে। খাপসুদ্ধ চশমাটা নিয়ে বেরিয়ে এল সে। ছাউনির তলায় রাখা আছে দুটো সাইকেল। তার মধ্যে একটা দশ গীয়ারের ইংলিশ রেসার, মুসার খুব প্রিয়, গত জন্মদিনে বাবা উপহার দিয়েছেন। সাইকেলটাকে খুব যত্ন করে সে। পুরানো সাধারণ সাইকেলটা সব সময় ব্যবহার করে, অন্যটা বের করে বিশেষ দরকার পড়লে। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে সহজেই চলতে পারে ইংলিশ রেসার, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ।

আদর করে সাইকেলটার গায়ে চাপড় দিল মুসা, ঘোড়াপ্রেমিক যেমন তার প্রিয় ঘোড়ার গায়ে চাপড় দেয়। ছাউনি থেকে বের করে চড়ে বসল।

দশ মিনিটেই পৌঁছে গেল লিট্‌ল্ টোকিওর সীমান্তে। রাস্তার ধারে গাছপালার আড়ালে সাইকেলটা পার্ক করে একটা শেকড়ে বসল সে, চোখ রাখল হ্যারিকিরির বাড়ির দিকে।

ঠিক সময়েই এসেছে মনে হচ্ছে। গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ভ্যান, পোর্টিকোর আলো জ্বলছে।

পুব পাহাড়ের মাথায় সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য, এই সময় নীল একটা সেডান এসে থামল বাড়ির সামনে। একজন লোক নেমে হেঁটে গেল গাড়িবারান্দার দিকে। কালো কোট, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, লোকটা রিচার্ড হ্যারিস ছাড়া আর কেউ না, মুসা শিওর। আলো খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এতবার এই পোশাকে দেখেছে লোকটাকে, ভুল হতে পারে না তার।

কালো চশমা পরেনি হ্যারিস, হাতে একটা বাক্সমত জিনিস, সম্ভবত খবরের কাগজে মোড়া। ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে প্যাকেটটা ভেতরে রাখল সে।

পোর্টিকোর আলো নিভে গেল।

ভ্যানের দরজা বন্ধ করে ফিরে এল হ্যারিস, সবুজ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

আবার গাছে হেলান দিল মুসা। মিনিট দশেক পর হ্যারিকিরির বাড়ি থেকে একজন জাপানী বেরিয়ে সবুজ ভ্যানের দিকে এগোল।

রবিনের মতই দ্বিধায় পড়ল মুসা, কে লোকটা? হ্যারিকিরি না তার সঙ্গী দোভাষী সেই জাপানী?

মনে পড়ল, কিশোর বলেছে, দোভাষীর পরনে ছিল চওড়া বেল্ট, জীনসের প্যান্টে গ্রীজের দাগ। ভালমত দেখল মুসা, কিন্তু বেল্ট পরেনি এ-লোকটা, প্যান্টেও দাগ নেই। তারমানে, হ্যারিকিরি। মোটা সুতীর রঙ চটা পোশাক পরেছে, হাতে একটা ধাতব বাক্স, লাঞ্চ বক্স।

গাছের আড়াল থেকে সাইকেল বের করে পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হলো মুসা।

পেছনের দরজা খুলল না হ্যারিকিরি, এমনকি পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরেও চেয়ে দেখল না। ড্রাইভিং সীটে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে বের করে আনতে শুরু করল।

রাস্তায় সাইকেল নামাল মুসা।

গাড়ি পথের শেষ মাথায় এসে ডানে মোড় নিল ভ্যান, তারপর সোজা ছুটে এল মুসার দিকে। এটা আশা করেনি সে, তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল আবার গাছের আড়ালে।

সাঁ করে ছুটে চলে গেল ভ্যান।

আস্তে আস্তে দশ পর্যন্ত গুণল মুসা, তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিছু নিল গাড়ির।

পাহাড়ী পথ ধরে শহরের দিকে ছুটে চলেছে ভ্যান, অনুসরণ করতে কোনই অসুবিধে হলো না মুসার। মেইন স্ট্রীটে পড়ে আরও সুবিধে হয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পিছে পিছে চলল সে।

কোস্ট রোডের দিকে মোড় নিল ভ্যান। গতি বাড়ছে ওটার, মুসাও বাড়াচ্ছে সাইকেলটার গতি এভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি আগে, খুশিই হলো সে, গাড়ির একশো গজ পেছনে থেকে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে দ্রুত, আরও দ্রুত।

স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টকে যখন পাশ বাড়াচ্ছে···তিরিশ···পঁয়তিরিশ···চল্লিশ, টপ গীয়ারে চলছে এখন সাইকেল।

কয়েক মিনিট পর উইলস বীচ পেরোল ওরা। এখানকার সৈকতে ক্যাম্প করার অনুমতি আছে, তবে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ। ঝকঝকে বালিতে কয়েকটা তাঁবু খাটানো। একটা তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। মুসার দিকে হাত নাড়ল। কি ব্যাপার? পরিচিত কেউ নাকি? কিন্তু ভালমত খেয়াল করার সময় এখন নেই তার।

উইলস বীচের মাইল দুয়েক দূরে সাগরের দিকে মোড় নিয়েছে রাস্তাটা। দূরে সাগরের দিকে তাকাল সে তৃষিত নয়নে। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে। গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল।

চোখ ফিরিয়েই চমকে গেল। সহসা ব্রেক চেপে ধরায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলল সাইকেলের টায়ার, কর্কশ আর্তনাদ করে পিছলে গেল কয়েক গজ, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়াল।

ভ্যানের পেছনের লাল লাইট জ্বলছে আর নিভছে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে পেছনের যানবাহনকে।

হ্যান্ডেল চেপে ধরে সীটেই বসে রইল মুসা। সামনে থেমে গেল ভ্যান। মনে পড়ল, হ্যারিকিরির সদাসতর্ক দৃষ্টির কথা। জাপানীরাই কারাতে নামক ভয়ঙ্কর 'মারপিটের' আবিষ্কর্তা, কথাটা মনে হতেই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। তৈরি হয়ে গেল পালানোর জন্যে। একটু এদিক ওদিক দেখলেই ছুটে পালাবে। লজ্জা কিসের, কেউ যদি না দেখল? এখানে তার বন্ধুরা কেউ নেই, টিটকারি মারার মত

শক্রও নেই। শুঁটকি টেরির কথা মনে পড়ল হঠাৎ করেই। সেই যে করে নিউ ইয়র্ক গেছে টেরিয়ার ডয়েল, আর দেখা নেই, ফেরেনি রকি বীচে। কড়া শাসনে রেখেছে বোধহয় তার বাবা। শুঁটকিকে পছন্দ করে না তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ও না থাকলে জমেও না।

চলতে শুরু করেছে সবুজ ভ্যান। ধীরে ধীরে এগিয়েই মোড় নিল বাঁয়ে।

সাগরের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ, এতক্ষণ দেখেনি মুসা, খেয়ালই করেনি। সাবধানে প্যাডাল ঘোরাল সে। থেমে গেল মোড়ে এসে। গজ তিরিশেক দূরে একটা পার্কিং লটে গিয়ে শেষ হয়েছে সরু পথ। তারপরে মোটা কাঁটাতারের বেড়া, গেট। তার ওপাশে কাঠের একগুচ্ছ কুঁড়ে।

পার্কিং লটে থামল সবুজ ভ্যান।

বড় রাস্তার ধারে বনতুলসীর ঝাড় ঘন হয়ে জন্মেছে, সাইকেলটা তার মধ্যে শুইয়ে নিজেও ঝাড়ের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। দেখল, ভ্যান থেকে নেমে লাঞ্চ বক্স হাতে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যারিকিরি, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বন্ধ করে দিল আবার দরজা।

ব্যাপার কি, বেরোচ্ছে না কেন লোকটা? এত দেরি? করছে কি ভেতরে? কাপড় বদলাচ্ছে?

না বদলায়নি, আগের পোশাকেই বেরিয়ে এল হ্যারিকিরি। হাতে লাঞ্চ বক্স। দু-হাতে ধরে সেটা সামনে বাড়িয়ে রেখে এগোল গেটের দিকে।

কাঠের একটা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। পুলিশ নয়, সিকিউরিটি গার্ড গোছের কিছু হবে, আন্দাজ করল মুসা। কাঁটাতারের পাল্লা খুলে দিল গার্ড, ভেতরে ঢুকল হ্যারিকিরি। আবার পাল্লা লাগিয়ে তালা আটকে দিল গার্ড।

গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল মুসা, বড় রাস্তা ধরে ছুটে আসছে একটা পিকআপ। আরও ঘন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল সে, যাতে গাড়ির লোকের চোখে না পড়ে। মোড় নিয়ে সরু রাস্তায় নেমে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগুলো পিকআপটা। পার্কিং লটে থামল। সামনে থেকে নামল দুজন, পেছন থেকে দুজন, চারজনই জাপানী। সবার হাতেই একটা করে লাঞ্চবক্স। এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

তালা খুলে চারজনকেই ভেতরে ঢুকতে দিল গার্ড।

কি ধরনের এলাকা এটা?—অবাক লাগছে মুসার। এত কড়াকড়ি কেন? কয়েকটা কাঠের কুঁড়ে ছাড়া আর তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। কুঁড়েগুলোর পরে বেশ অনেকখানি ছড়ানো সমভূমি সাগরে গিয়ে মিশেছে। কোন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না ওখানে।

আরে না, সমভূমি তো নয়, ভালমত লক্ষ্য করতেই বুঝল মুসা। বিশাল এক কৃত্রিম হ্রদ, খুদে উপসাগরও বলা চলে। খাল কেটে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছে, খালে পাথরের নিচু বাঁধ। হ্রদের পানির কয়েক ইঞ্চি ওপরে কাঠের অনেকগুলো সাঁকো, একটার ওপর আরেকটা আড়াআড়ি ফেলে তৈরি হয়েছে অগুণতি চারকোণা খোপ, অনেক ওপর থেকে দেখলে মনে হবে চেককাটা বিছানার

চাদরের মত।

ওই সাঁকোতে উঠল গিয়ে জাপানীরা, একেকজন একেকদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খোপের কিনারে উবু হয়ে বসে টেনে তুলল দড়িতে বাঁধা খাঁচা, একের পর এক। খাঁচায় কি আছে, দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে জাপানীরা যে গভীর আগ্রহে দেখছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। খাঁচার ভেতর থেকে কিছু বের করছে ওরা, তারপর কিছু একটা করছে।

হ্যারিকিরিকে চেনা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে ওই পাঁচজনেরই কোন একজন সে, তাতে সন্দেহ নেই।

আধ ঘণ্টা ঝোপের ভেতর পড়ে রইল মুসা, কিছুই ঘটল না। কিছুই বদলাল না। বেড়ার ভেতরে তিনজন গার্ড দেখা যাচ্ছে, টহল দিচ্ছে। জাপানীরা তাদের খাঁচা নিয়ে ব্যস্ত। খানিক পর পর একটা করে খাঁচা নামিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটা টেনে তুলছে।

ওদের মাথার ওপর ঘনঘন চক্কর দিচ্ছে সীগাল আর পায়রার ঝাঁক। এটা স্বাভাবিক দৃশ্য। এদিককার উপকূলে ওই পাখি না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কিশোরকে জানানো দরকার। আসার সময় দেখেছে, মাইল খানেক দূরে একটা পেট্রল স্টেশন আছে। ঝোপ থেকে সাইকেল বের করে চড়ে বসল মুসা।

একবার বাজতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। খুলে বলল সব মুসা। জানাল, এখন উইলস বীচের মাইলখানেক দূরে রয়েছে। কিশোর আর রবিনের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবে সে।

'সাইকেলটা দারুণ।'

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ফিরে চাইল মুসা। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা ছেলে চকচকে চোখে দেখছে ইংলিশ রেসারটাকে। স্টেশনেরই কর্মচারী।

ধন্যবাদ জানাল মুসা।

পাশে বসে পড়ল ছেলেটা। মুসার মতই সাইকেলের ভক্ত, বোঝা গেল কয়েকটা কথা বলেই। বেশ ভালই জমল ওদের আলোচনা। সাইকেল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছেলেটার, বকবক করে চলল একনাগাড়ে।

এক সময় মুসার মনে হলো, তাই তো, খালি সাইকেল কেন, আরও তো কিছু জানা যেতে পারে ছেলেটার কাছে? জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?

'আচ্ছা,' মুসা বলল, 'মেইন রোড থেকে একটা সরু পথ নেমে গেছে না সাগরের দিকে, এই তো মাইলখানেক দূরে, কাঁটাতারের বেড়া, গার্ড। ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

'শুনেছি, ঝিনুকের খামার। কয়েক বছর আগে এক ধনী জাপানী করেছে ওটা। বিরাট দীঘি খুঁড়ে তাতে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। ওখানে নাকি ঝিনুকের চাষ করে।'

আর কিছু জানা গেল না ছেলেটার কাছে, জানে কিনা জিজ্ঞেস করার সুযোগও অবশ্য হলো না মুসার। গাড়ির ভিড় বেড়েছে, পেট্রল নিতে ঢুকছে, সবারই তাড়া।

দিতে একটু দেরি হলেই রেগে যাচ্ছে। হাত থেকে পাম্প রাখারই সময় পাচ্ছে না ছেলেটা।

কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল। পরিশ্রমে লাল দুজনের মুখ, ঘামছে, হাঁপাচ্ছে। আরও দুটো কোকাকোলার টিন আনতে গেল মুসা, ইতিমধ্যে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ-মাথা ভিজিয়ে নিল কিশোর। তিনজনেই গিয়ে বসল আবার ছায়ায়। পেট্রল স্টেশনের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেছে, কিশোরকে জানাল মুসা।

'ঝিনুকের খামার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সিকিউরিটি গার্ড। রিচার্ড হ্যারিস। বাদামী কাগজে মোড়া বড় প্যাকেট। কাজের কাজ করেছ, মুসা।'

'তাই নাকি? তা কি করেছি বলো না শুনি। আমি তো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান। উঠে দাঁড়াল। 'চলো, যাই। লুকানোর ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ওরা কি করে দেখব।'

এক সারিতে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা।

কয়েক মিনিট পরে পৌঁছে গেল সরু রাস্তা আর বড় রাস্তার মিলনস্থলে। এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল যেখানে তুলসীর ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সরু পথ, বড় রাস্তা আর ঝিনুকের খামারের ওপর এক সঙ্গে চোখ রাখা যায়।

বিনকিউলার নিয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলল কিশোর। 'তারের বেড়ার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঝিনুক নিয়ে ওরা কি করছে বোঝা যায় না। ঝিনুকগুলো খুলছে মনে হচ্ছে।'

অনেক ওপরে উঠেছে সূর্য, কড়া রোদ। পেট্রল স্টেশন থেকে আরও কয়েক টিন কোকাকোলা নিয়ে আসা উচিত ছিল, ভাবল মুসা। সানগ্লাস বের করে চোখে লাগাল। তারপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ছায়া ছায়া ঝাড়ের ভেতরে। কালো কাচের জন্যে আলো কম লাগছে চোখে।

দুপুরের দিকে গার্ডের বাঁশি বাজল। শ্রমিকদের খাবার সময়। সাঁকোতে রোদে বসেই টিফিন বাক্স থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করল ওরা।

মাথার ওপর, আশেপাশে কবুতর আর সীগালের ভিড় জমে গেল, খাবারের উচ্ছিষ্টের লোভে। হেই, যাহ্, হুস্স্ এমনি নানারকম শব্দ করে ওগুলোকে দূরে রাখার চেষ্টা করল শ্রমিকেরা। অবশেষে খাওয়ার আশা ছেড়ে একে একে উড়ে চলে গেল বেশির ভাগ পাখি।

বিনকিউলার চোখ থেকে নামাল কিশোর। জাপানীদের খেতে দেখে তারও খিদে লেগে গেল। জোর করে খাওয়ার ভাবনা দূর করে রহস্য সমাধানে মনোনিবেশের চেষ্টা চালাল সে। আনমনে চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।

ধূসর কাগজে মোড়া প্যাকেটটা ভ্যানের পেছনে রাখল হ্যারিস। কি ছিল তাতে মুসা দেখেছে, প্যাকেটটা গাড়িতে রেখে শুধু লাঞ্চ বক্স হাতে নিয়ে বেড়ার ভেতরে ঢুকেছে হ্যারিকিরি।

মুসার গায়ে ঠেলা দিল কিশোর। 'হ্যারিকিরি ভ্যানের পেছনের দরজায় তালা

লাগিয়েছে?'

মাথা তুলল মুসা। 'না,' ঘুম জড়ানো কণ্ঠ, 'লাগায়নি। কেন?' জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার শুয়ে পড়ল।

যাবে নাকি, ভাবল কিশোর, গিয়ে দেখবে প্যাকেটটায় কি আছে? সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। শ্রমিকেরা খেতে বসেছে বটে, কিন্তু গার্ডরা সতর্ক। গেটের কাছে রয়েছে একজন সারাক্ষণই।

কয়েক মিনিট পর আবার বাঁশি বাজল। টিফিন বাক্স রেখে আবার কাজে লাগল শ্রমিকেরা।

চোখ খোলা রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। কোন কিছুই আর দেখার নেই, বিনকিউলারের ভেতর দিয়েও না। স্তব্ধ গরম, নীরবতা, ক্ষুধা সব কিছু মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে যেন, চোখ খোলা রাখতে পারছে না কিছুতেই। অবশেষে মুসার পাশেই গড়িয়ে পড়ল সে।

স্বপ্ন দেখছে কিশোর, আপেলের হালুয়া খাচ্ছে, তাতে প্রচুর কাঁচা মাখন মেশানো। এক চামচ খেয়ে আরেক চামচ তুলে নিতে গেল...

বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। জাপানীরা খাঁচাগুলো নামিয়ে রাখছে পানিতে।

আজকের মত ছুটি। গেটের দিকে এগোল শ্রমিকেরা।

ঘুমিয়ে নেয়ায় মাথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে কিশোরের। তাই বোধহয় মুসার কালো চশমার দিকে চেয়ে চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। মিস কারমাইকেলের বাগানে আর ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পার্কিং লটে সানগ্লাস পরেছিল রিচার্ড হ্যারিস। দুবারই রাতে। কালো কাচ শুধু আলোই ঠেকায় না, চোখও ঢেকে রাখে অন্যের নজর থেকে। এই তো, এত কাছে থেকেও মুসার চোখ দেখতে পাচ্ছে না সে। বুঝতে পারছে না, খোলা না বন্ধ।

তারের বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। গেটের কাছে আসেনি জাপানী শ্রমিকেরা, একটা কুঁড়েতে ঢুকেছে। গার্ডদেরও কেউ বাইরে নেই, ওরাও ঢুকেছে শ্রমিকদের সঙ্গে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। ছুটল সরু পথ ধরে পার্কিং লটের দিকে।

চোখ মেলল রবিন। পাশে কেউ নেই। কিশোর গেল কোথায়? পার্কিং লটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সবুজ ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ঢুকে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। বন্ধ হয়ে গেল আবার দরজা।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'করছে কি?'

'চুপ!' হুঁশিয়ার করল রবিন। 'আমরা এখন কি করি?'

কিছু তো বলে গেল না। তোমার কি মনে হয়? হ্যারিকিরির গাড়িতে লুকিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'কিন্তু আমাদের কিছু করতে হবে মনে করলে বলেই যেত। নাকি?'

'তা ঠিক। ভ্যানটা খুঁজে দেখতে গেল না তো? দেখি, কি করে? হ্যারিকিরির

হাতে ধরা না পড়লেই হয়...' কিশোরের ফেলে যাওয়া বিনকিউলারটা তুলে নিল রবিন। সাঁকো, বেড়ার আশপাশ আঁতিপাতি করে খুঁজল। নির্জন একটা কুঁড়ের জানালায় চোখ পড়তেই থেমে গেল হাত।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা গেল ঘরটাতে শ্রমিক আর গার্ডে গিজগিজ করছে। শ্রমিকেরা সব কাপড় খুলে ফেলেছে। মনে হচ্ছে তল্লাশি চালাচ্ছে গার্ডেরা, শ্রমিকদের কাপড়-চোপড় খুঁজছে, লাঞ্চ বাক্সের ভেতরে দেখছে।

বিনকিউলার নামাল রবিন। দৌড়ে আসছে কিশোর। ধপাস করে এসে বসে পড়ল পাশে। মুখ লাল, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চোখে উত্তেজনা।

জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'গার্ডরা ওদের সার্চ করছে, না?'

'তাই তো মনে হলো,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তুমি জানলে কি করে? কি খুঁজছে ওরা?'

'দেখে এসেছি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর, 'প্যাকেটে কি আছে। মুসা, আলো তখন কম ছিল তো, বুঝতে পারোনি। ধূসর জিনিসটা খবরের কাগজ নয়, চীজক্লথ।'

'চীজক্লথ,' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'মানে, ব্লিংকির প্যাকেটটার মত?'

'অবিকল এক জিনিস। ছেঁড়া খাঁচাটা পড়ে আছে। খালি। তবে বাজি রেখে বলতে পারি, সকালে রিচার্ড হ্যারিস যখন রেখে গেছিল, তখন খালি ছিল না। কারণ, এই জিনিস পেয়েছি ভেতরে,' মুঠো খুলে দেখাল কিশোর, কি পেয়েছে।

'পায়রা,' চোখ ছোট হয়ে গেছে মুসার। 'খাঁচার মধ্যে কবুতর ছিল...'

'এবং সেটাকে লাঞ্চ বক্সে ভরে গেট পার করে নিয়ে গেছে। দারুণ ফন্দি। ঢোকার সময় শ্রমিকদের টিফিন বক্স পরীক্ষা করে না গার্ডরা, বেরোনোর সময় করে।'

ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেছে রবিনের। 'কেন করে? কি খোঁজে?'

'মুক্তো,' শান্তকণ্ঠে বোমাটা ফাটাল কিশোর।

এগারো

'মুক্তো,' আবার বলল কিশোর। 'মুক্তো এবং রেসিং হোমার কবুতর।'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। বিকেলে অসময়ে ফিরে এসে মেরিচাচীর বকাঝকা আর তাঁর হাতে তৈরি অনেকগুলো স্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেট ভরেছে মুসা আর কিশোর।

দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলেছে কিশোর, হতাশা চেপে রাখতে পারেনি, মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেছে, 'দূর, নেই।'

'এই, কি নেই রে?' কাছেই বসা ছিল চাচী।

'আপেলের হালুয়া। বেশি করে কাঁচা মাখন দেয়া।'

'হঠাৎ করে হালুয়া খাওয়ার শখ হলো কেন? অন্য সময় তো সাধাসাধি করেও গেলাতে পারি না।'

'দুপুরে স্বপ্নে খেলাম তো, তখন থেকেই খেতে ইচ্ছে করছে।'
'স্বপ্ন দেখলি? কোথায় ঘুমিয়েছিলি?' উঠে দাঁড়াচ্ছেন মেরিচাচী।
চুপ হয়ে গেল কিশোর। অনেক বেশি বলে ফেলেছে।
'তুলসীবনে, চাচী, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,' ঢাকতে গিয়ে আরও ফাঁস করে দিল মুসা।
প্রমাদ গুণল কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল, 'ওই পাহাড়ের ধারে, চাচী তুলসী গাছ ছিল কাছে, তার ছায়ায়। সাইকেল চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে জিরোতে বসেছিলাম, কখন যে তন্দ্রা এসে গেল...হি-হি...তো চাচী, হালুয়া...'
'কোথায় যে কবে মরে পড়ে থাকবি,' চাচীর মুখের মেঘ সরছে না। 'এই, তুলসীবন থেকে যদি সাপ বেরোত? যদি...'
'দূর, চাচী, তুমি কিছু জানো না,' হাত তুলল কিশোর। 'তুলসীবনে সাপ থাকে না।'
'তবে কি থাকে?'
'কিছুই থাকে না। হ্যাঁ, চাচী, হালুয়া...আপেল আছে তো, নাকি বাজার থেকে এনে দেব?'
'আছে আছে, রাতে খাস, বানিয়ে রাখব। তবে কথা দিতে হবে, তুলসীবনে...'
'ঠিক আছে, চাচী, আর যাব না, যাও,' এক চুমুকে বাকি দুধটুকু খেয়ে মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে কিশোর, চাচী আর কিছু বলার আগেই। সোজা এসে ঢুকেছে দুজনে হেডকোয়ার্টারে।
রবিন পরে এসেছে। কিশোরের অনুরোধে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল দুটো বই আনতে,পথে রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসেছে।
'হ্যাঁ,' রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মুক্তো চাষের ব্যাপারে কি লিখেছে বইতে?'
মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা বইটা খুলল রবিন। ভেতরে এক পাতা আলগা কাগজ, তাতে নোট লিখেছে সে। 'হ্যাঁ, মুক্তোর চাষ।...স্প্যাট, মানে শিশু ঝিনুক জোগাড় করে খাঁচায় ভরে পানিতে ডুবিয়ে রেখে দেয়া হয়। ওগুলোর বয়েস যখন তিন বছর হয়, তুলে ফাঁক করে ভাঙা এক কণা মুক্তো ফেলা হয় ভেতরে। তারপর ঝিনুকগুলোকে আবার খাঁচায় ভরে ডুবিয়ে রাখা হয় পানিতে। শক্ত পাথর অন্ত্রের কাছের বিশেষ থলিতে আটকে খুব যন্ত্রণা দেয় ঝিনুককে, আপনা আপনি এক ধরনের রস বেরিয়ে তখন লাগতে থাকে কণাটার সঙ্গে, শক্ত হয়ে জমতে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে কণাটা, পূর্ণাঙ্গ মুক্তোয় রূপ নেয় এক সময়। তিন থেকে ছয় বছর লাগে একটা মুক্তো তৈরি হতে।'
'কণাটার চারপাশে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে যায় রস, না?' মুসা বলল। 'খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। বছরের পর বছর প্রাণীগুলোকে এভাবে জ্যান্ত রেখে কষ্ট দেয়া...'
'মানুষের কাজই তো এরকম। ওই যে, জোর যার মুল্লুক তার। হ্যাঁ,' আবার নোট পড়ায় মন দিল রবিন। 'মুক্তো বড় হলে ঝিনুকের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে পাঠানো হয় বাজারে। কালচার্ড মুক্তোর ব্যবসা জাপানেই বেশি, বড় বড় ফার্ম গড়ে

উঠেছে। কালচার্ড হলে কি হবে, দাম কম না, কোন কোনটা কয়েকশো ডলারও ওঠে।'

'আচ্ছা, কালচার্ড বলে কেন এগুলোকে?' জিজ্ঞেস না করে পারল না মুসা। 'সভ্য কিংবা সাংস্কৃতিমনা ঝিনুকের ভেতরে জন্মায়?'

মুসার মোটা বুদ্ধি দেখে হতাশ ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালো কিশোর।

'না না,' অধৈর্য হলো না রবিন। 'কৃত্রিম বলে এই নাম রাখা হয়েছে।'

'অ,' মাথা দোলাল মুসা, 'মুক্তোর ফার্মেই কাজ করে তাহলে হ্যারিকিরি,' পেছনে বাগবাকুম শুনে ফিরে দেখল, তার দিকেই চেয়ে আছে টম। জালের ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাখিটাকে আদর করল সে। 'এজন্যেই ওখানে গার্ডের এত কড়াকড়ি, মুক্তো যাতে চুরি হতে না পারে, তাই না, কিশোর?'

'তাই,' চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'ঢোকার সময় শ্রমিকদের তল্লাশি করা হয় না। তাতেই আইডিয়াটা খেলেছে হ্যারিকিরি আর হ্যারিসের মাথায়। সহজ ফন্দি, মজাটাই ওখানে, বেশি সহজ হওয়াতেই ধোঁকা খাচ্ছে গার্ডেরা। খাঁচায় ভরে একটা রেসিং হোমারকে ভ্যানে রেখে দিয়ে আসে হ্যারিস। ফার্মে ঢোকার আগে খাঁচা থেকে পাখিটাকে বের করে লাঞ্চ বক্সে ভরে নেয় হ্যারিকিরি,' চুপ করল সে।

অপেক্ষা করছে অন্য দুজন।

'ঝিনুকে ভাল মুক্তো পেলে সেটা রেখে দেয় হ্যারিকিরি,' আবার বলল কিশোর, 'লাঞ্চের সময় বাক্স থেকে কবুতরটাকে বের করে তার পায়ে ঝিনুক বেঁধে দেয় কোনভাবে, হয়তো ছোট থলিটলিতে ভরে বা অন্য কোনভাবে। আশেপাশে এত পাখির ছড়াছড়ি, বিশেষ কবুতরটাকে খেয়ালই করে না গার্ডেরা। উড়ে সোজা বাড়ি চলে যায় ওটা, তখন খুলে নেয় রিচার্ড হ্যারিস।'

'বুঝলাম,' বলল রবিন, 'লাঞ্চের আগে ভাল মুক্তো পাওয়া না গেলে একটা মেসেজ বেঁধে কবুতর ছেড়ে দেয় হ্যারিকিরি। জাপানী ভাষায় মেসেজটাতে লেখা থাকে, আজ মুক্তো নেই, যে রকম পেয়েছি আমরা দু-আঙুলা কবুতরটার পায়ে বাঁধা। কিন্তু,' থামল সে, কিছু একটা ভেবে অবাক হচ্ছে, খাপে খাপে মেলাতে পারছে না বোধহয়। আবার বলল, 'কিন্তু...'

'কিন্তু ওটা রিচার্ড হ্যারিসের নয়,' রবিনের কথাটা শেষ করল কিশোর, 'ব্লিংকির, এই তো? অন্তত স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে তার কাছে ছিল ওটা। খাঁচাটাও হ্যারিসের কবুতরের খাঁচার মত, একই ধরনের চীজক্লথে মোড়া,' হাত বাড়াল সে, 'দেখি, অন্য বইটা দাও।'

দ্বিতীয় যে বইটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছে রবিন ওটা আসলে ম্যাপ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার রোড অ্যাটলাস। পাতা উল্টে স্মল-স্কেলের একটা ম্যাপ বের করল কিশোর, তাতে রকি বীচ আর সান্তা মনিকার বিভিন্ন পথ দেখানো রয়েছে। অন্য দুই গোয়েন্দাও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপের ওপর।

'এই যে, এটা উইলস বীচ,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'ঝিনুকের খামারটা হবে এখানে। আর রিচার্ড হ্যারিসের বাড়ি,' উপকূল বরাবর ধীরে ধীরে আঙুল সরাল কিশোর, রকি বীচে এসে থামল। 'এই যে, এখানে। ফোন

গাইডে তার ঠিকানা পেয়েছি। এটা হলোগে শহরের পশ্চিম সাইড।'

ড্রয়ার থেকে একটা রুলার বের করে ফার্ম আর রিচার্ডের বাড়ি, এই দুটো পয়েন্টের ওপর রাখল কিশোর, 'কি বোঝা যায়?'

'সরাসরি আকাশ পথ বেশির ভাগটাই সাগরের ওপর দিয়ে,' বলে উঠল মুসা। 'ফার্ম থেকে হ্যারিসের বাড়ি ছয় মাইল!'

'রেসিং হোমারের জন্যে বড় জোর ছয় মিনিটের পথ,' মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। 'দুপুরে বাড়ি গিয়ে হ্যারিসকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় না, মুক্তো কিংবা মেসেজ পেয়ে যায়।'

'কিন্তু তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানে কবুতর মরে কি করে, মানে রেসিং হোমারের লাশ পাওয়া যায় কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল মুসা। 'তাঁর বাড়ি তো শহরের পুবধারে।' ম্যাপে আঙুল রাখল, 'এই যে, এখানে। রিচার্ডের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। কোর্স থেকে এতখানি সরে গিয়েছিল দু-আঙুলা?'

'হ্যারিসের বাড়িতে যায় ভাবলে সেটা মনে হবে,' রুলার সরিয়ে ফার্ম আর মিস কারমাইকেলের বাড়ির ওপর রাখল কিশোর। 'কিন্তু যদি এখানে যায়?' ম্যাপের আরেক জায়গা নির্দেশ করল সে।

'সান্তা মনিকা,' বিড় বিড় করল রবিন।

'ব্লিংকির বাড়িতে?' মুসা বলল।

'হতে পারে,' রবিনের মনে পড়ল, 'ব্লিংকি বলেছিল সে সান্তা মনিকায় থাকে...'

'সুতরাং,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'দু-আঙুলার মালিক যদি ব্লিংকি হয়, আর বাড়ি যেতে চায় কবুতরটা তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানের ওপর দিয়ে যেতে হবে। ধরে নিতে অসুবিধে নেই, বাজের কবলে পড়েছে ওটা তখনই।' টেবিলে বার দুই টোকা দিল সে। 'আর, আমার মনে হয় দু-আঙুলাই প্রথম মারা পড়েনি, ব্লিংকির আরও কবুতর মারা পড়েছে মিস কারমাইকেলের বাগানে। মহিলা বলেছেন, এক মাসে তাঁকে তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল হীরা। পেল কোথায় পাখিটা? নিশ্চয় বাগানে, মরা কবুতরের পায়ে বাঁধা, ঠুকরে ঠুকরে কোনভাবে খুলে নিয়ে গেছে মনিবকে উপহার দিতে।'

'মিলছে,' একমত হলো মুসা।

ম্যাপ বই বন্ধ করল কিশোর, ভুরু কোঁচকাল। 'মেলে, যদি হ্যারিস আর ব্লিংকি পার্টনার হয়। তাহলে একদিন হ্যারিসের কবুতর ব্যবহার করবে, আরেক দিন ব্লিংকির। আর তা হলেই শুধু হ্যারিসের আজব ব্যবহারের একটা অর্থ করা যায়। ব্লিংকির পাখি মারা পড়ায় পার্টনার হিসেবে সে-ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, রাতের বেলা তদন্ত করতে গিয়েছিল মিস কারমাইকেলের বাগানে। আমাকে দেখে ভেবেছিল আমিই খুনী, তাই রাগ সামলাতে না পেরে বাড়ি মেরে বসেছে।'

মাথা নাড়ল সে, নিজের কথাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তারপর মিস কারমাইকেলের কাছে শুনল, আমরা তাঁকে সাহায্য করছি। তখন খাতির করার চেষ্টা করল আমাদের সঙ্গে। ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল, পাখির খুনীকে ধরে দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করল। ধরে নিতে হয়, সে চাইছিল, মিস কারমাইকেলের পাখি

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ব্লিংকির কবুতর কিভাবে মারা গেছে সেটা বের করি আমরা।' আবার মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু ব্লিংকি আর হ্যারিস বন্ধু হতে পারে না।'

'কেন?' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল রবিন । 'পারে না কেন?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'পারে না এই জন্যে, ব্লিংকি আর হ্যারিকিরিকেও তাহলে পার্টনার হতে হয়। তাহলে ব্লিংকির জানার কথা হ্যারিকিরির নতুন বাসার খবর। জানা থাকার কথা, হ্যারিকিরি নতুন বাড়ি নিয়েছে। স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে বসে থেকে অনুসরণ করার দরকার পড়ত না। সবুজ ভ্যানের পিছু নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসার দরকার পড়ত না কোথায় বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'বাড়ি যাও তোমরা। রাতে বাইরে কাটানোর অনুমতি নিয়ে এসো। দু-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে। স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে আসবে সঙ্গে করে।'

'কেন?' রবিন আর মুসা, দুজনেই জানতে চাইল।

'কাল সকালে হ্যারিকিরির জন্যে তৈরি থাকতে পারব আমরা।'

'আবার কি করতে হবে,' প্রশ্ন করল মুসা। 'অনুসরণ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কেসটার সমাধান করব। খুব সহজ উপায়ে।' খাঁচার দিকে তাকাল সে। 'টমকে দিয়ে ফাঁদে ফেলব ব্লিংকিকে।'

বারো

ব্যাগের ভেতরে নড়েচড়ে উঠল কিশোর। সারারাত খোলা আকাশের নিচে শক্ত মাটিতে পড়ে থেকে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। দূর, সৈকত না কচু, বালি এত শক্ত! চোখ মিটমিট করল, পাতার ওপর থেকে ঝরে পড়ল কয়েক কণা বালি, বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলেছে। শুকনো ঠোঁট চাটতেই জিভের সঙ্গে মুখের ভেতরে চলে গেল ঠোঁটের বালি। বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল।

ঘড়ি দেখল সে, ছটা বাজে। যাওয়ার সময় হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাগের ভেতর থেকে।

অন্য দুই গোয়েন্দা আগেই উঠেছে। টমকে দানা খাওয়াচ্ছে মুসা। রবিন নাস্তা সাজাচ্ছে। কয়েকটা কেক ও এক ব্যাগ দুধ ঠেলে দিল কিশোরের দিকে।

কেকে কামড় দিয়েই আবার মুখ বাঁকাল কিশোর। দাঁতে কিচকিচ করছে বালি। দুধের ব্যাগের কোণা ছিঁড়ে পাইপ ঢুকিয়ে চুমুক দিল, আস্তে আস্তে টেনে তুলে দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখের ভেতরটা, বালি সব পেটে চলে গেল। এইবার কেক খেতে আর কোন অসুবিধে নেই।

দশ মিনিটেই মালপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে গেল ওরা। টমের খাঁচা চীজক্লথ দিয়ে মোড়াতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর। নিজের সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল সে। ক্যারিয়ারে মালপত্র বেঁধে নিল মুসা, হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিল প্ল্যাসটিকের একটা শপিং ব্যাগ।

রওনা হলো ওরা। মাইলখানেক দূরের পেট্রল স্টেশনে এসে থামল। সেই অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটাই ডিউটিতে আছে, মালপত্রগুলো সেখানে রাখার অনুরোধ

জানাল মুসা। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে মাল পাহারা দিতে রাজি হলো ছেলেটা।

বেশির ভাগ মাল পেট্রল স্টেশনে রেখে আবার সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল আধ মাইল, ঝিনুকের ফার্মের দিকে। আগের দিনেই সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে রেখেছে কিশোর। বড় রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে, তার পাশে ঘাসে ঢাকা চওড়া এক ফালি জমি আছে, তাতে তুলসী গাছের বড় বড় ঝোপঝাড়।

ঝোপের ভেতরে সাইকেল শুইয়ে রাখলে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। লুকিয়ে ফেলল মুসা আর রবিন। ক্যারিয়ার থেকে খাঁচাটা খুলে নিয়ে কিশোরও সাইকেল লুকাল। তিনজনে এসে বসল তুলসীবনে। সাইকেল পাম্প আছে সবার সাইকেলেই, খুলে নিয়েছে। মুসার হাত থেকে শপিং ব্যাগটা নিয়ে খুলল রবিন। মুঠো মুঠো বেলুন বের করে ভাগ করে দিতে লাগল। নানা আকারের উজ্জ্বল রঙের বেলুন—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। বেলুনের মুখ বেঁধে ফেলতে লাগল ওরা। দেখতে দেখতে পথের ধারে বেলুনের ছোটখাট একটা পাহাড় গড়ে উঠল।

খুব সকালে লোকজন বেরোয়নি, এতক্ষণে একটা গাড়িকেও যেতে দেখা যায়নি ওপথে। খুশিই হলো কিশোর, নিরাপদে কাজ করা যাচ্ছে। বাতাসও নেই আজ, ভালই হয়েছে, বেলুন উড়িয়ে নিচ্ছে না। দিনের শুরুটা বেশ ভালই।

ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা এক টুকরো সাদা কাপড় বের করল রবিন। গতরাতে কিশোরের নির্দেশে তৈরি করেছে ব্যানারটা। ভাঁজ খুলে ছড়িয়ে লম্বা করে দুটো গাছের সঙ্গে কাপড়ের কোণগুলো বেঁধে দিল ওরা। লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা হয়েছেঃ

আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের
রক্ষা করুন
একটা বেলুন কিনুন

পথের তীক্ষ্ণ মোড়ের গজ বিশেক দূরে তাকাল কিশোর, খুদে একটা পাহাড় আছে ওখানে, মেসকিট আর তুলসী গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা।

'রবিন,' নির্দেশ দিল কিশোর, 'ওখানে গিয়ে লুকাও। আমার আর মুসার ওপর চোখ রাখতে পারবে। রুমাল আছে তোমার কাছে?'

'আছে,' জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করল রবিন। 'মুসা, এভাবে নাড়ব, সামনে-পেছনে। তাহলে বুঝবে, কাজ হয়ে গেছে।'

নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানাল মুসা। এসব ভাল লাগছে না তার। হ্যারিকিরিকে না রাগিয়ে পারবে তো কাজ সারতে? এখন তার মনে হচ্ছে, কারাতে ফাইটে নিশ্চয় ব্ল্যাক বেল্ট আছে জাপানীটার। যদি মুসাকে চিনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত দিয়ে কোপাতে শুরু করবে।

বাবার কালো চশমাটা নিয়ে এসেছে মুসা, বের করে পরল। 'কি করে জানছি সে আসছে?' গলা কাঁপছে মৃদু।

'তিনবার শিস দিলে বুঝবে গাড়ি দেখা যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'আমাকে পেরিয়ে যাওয়ার পর আরও দুবার শিস দেব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

মুসার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা বুঝতে পারল কিশোর। খারাপ লাগছে তার, সব চেয়ে কঠিন কাজটা করতে হচ্ছে মুসাকে। সে নিজে পারলে ভাল হত। কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে তাতে, সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতদূর এগিয়ে সব গণ্ডগোল করে দিতে চায় না। তাকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলবে হ্যারিকিরি, ইয়ার্ডে তার সঙ্গেই কথা বলেছে।

'মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন?' বন্ধুকে ভরসা দিল কিশোর। 'হাসো, হাসি হাসি করে রাখো। কথা বলবে সহজ ভাবে। গোমড়ামুখ লোককে চাঁদা দেয় না কেউ।'

'কি বলব?'

'যা মুখে আসে। ব্যাটা ইংরিজি বোঝে না।'

'আচ্ছাহ্,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'সময় হয়ে গেছে।'

ছোট পাহাড়টায় উঠে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল রবিন।

কিশোর গিয়ে ঢুকল তুলসীবনে, সাইকেলগুলো যেখানে রেখেছে। মুসা যেখানে আছে জায়গাটা তার চেয়ে উঁচু। কবুতরের খাঁচাটায় হাত রেখে তৈরি হয়ে রইল।

বেলুনের পাহাড়ের পাশে ধপ করে বসে পড়ল মুসা, বিড়বিড় করল, 'আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন। জাহান্নামে যাক ডানাওলারা···হুঁহ্! আমাকে রক্ষা করে কে?'

রোদ চড়েনি, আবহাওয়া ঠাণ্ডা, কিন্তু দরদর করে ঘামছে কিশোর। জুলফির কাছ থেকে ঘাম গড়িয়ে গাল বেয়ে এসে জমা হচ্ছে চিবুকে, সেখান থেকে টুপ করে পড়ছে তুলসী পাতায়। তুলসীর নেশা ধরানো গন্ধ ভোরের বাতাসে, কিন্তু উপভোগ করার সময় এখন নেই। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভাবছে আবল-তাবল, নিজেকে ধমক লাগাল সে। চোখ ফেরাল বাঁয়ে, পথের দিকে, যেখান দিয়ে আসবে সবুজ ভ্যানটা।

এক মিনিট গেল···পাঁচ মিনিট···দশ···আসবে তো? নাকি আজ হ্যারিকিরির ছুটি? কোথাও কোন কারণে আটকে গেল? না আসুক, সে-ই ভাল, তাহলে খারাপ কিছু ঘটা থেকে বেঁচে যাবে মুসা।

ঠিক এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

মুখে আঙুল পুরে তিনবার তীক্ষ্ণ শিস দিল কিশোর।

গাড়িটা গোঁ গোঁ করে বেরিয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। আরও দুবার শিস দিল সে।

গাড়িটা বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই খাঁচাটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তুলসীবন ভেঙে দুপদাপ করে এসে পড়ল রাস্তায়, দৌড় দিল গাড়ির পেছনে।

শিসের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়িয়েছে মুসাও। সবগুলো বেলুনের মুখে বাঁধা লম্বা সুতোর মাথা এক করে ধরে রেখেছে, হ্যাঁচকা টানে সব নিয়েই এসে নামল রাস্তায়।

দ্বিতীয়বার শিস যখন দেয়া হলো, একগাদা বেলুনের মাঝে শুধু বেরিয়ে আছে তার চশমা পরা মুখটা।

দেখা গেল গাড়ি। গতি কমছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে গেল বেলুনের ব্যারিকেডের কয়েক গজ দূরে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলল হ্যারিকিরি, জাপানী ভাষায়।

শুনতেই যেন পায়নি মুসা, ভাব দেখাল বেলুন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। আসলে ব্যারিকেড আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে সুতোয় ঝাঁকুনি দিয়ে, গাড়ি বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। হালকা বাতাসে রঙিন একটা দেয়াল গজিয়েছে যেন পথের ওপর।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল হ্যারিকিরি। মুসার দিকে চেয়ে বিস্ময় ফুটল চোখে। সব চেয়ে কাছের বেলুনটা সই করে ধাঁ করে এক লাথি চালাল। বাতাসে দোল খেল বেলুনটা, আলতো করে গিয়ে লাগল তার নিজেরই নাকে। থাবা দিয়ে চোখের সামনে থেকে ওটা সরিয়ে আবার কিছু বলল সে।

জোর করে হাসল মুসা। 'আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন, একটা বেলুন কিনুন।'

জাপানীতে বিড়বিড় করল হ্যারিকিরি।

হাসি বজায় রাখল মুসা। 'যা খুশি বলবে,' বলে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু যা-খুশিও মুখে আসছে না এখন মুসার। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে রেগে গেল সে। 'চুলোয় যাক ডানাওলার বাচ্চারা। নাক ভোঁতা জাপানীর বাচ্চা জাপানী, চোরের গুষ্টি চোর, ব্যাটা মুক্তো চুরি করে এখন আমাকে ফেলেছিস বিপদে। বেলুন কিনবি তো কেন, নইলে···' গাল দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে পেরে এতক্ষণে সত্যি সত্যি হাসি ফুটল তার মুখে। 'দুঃখিত, চোরা সাহেব, আপনাকে জায়গা দিতে পারছি না। কিশোর, নিষেধ করেছে। আপনি এখানে আটকে থাকলে আমাদের বিশেষ সুবিধে। আপনার হাতে হাতকড়া পরিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দিতে চাই তো, তাই এই ব্যবস্থা। না, বেশিক্ষণ আটকাব না,' চোখের কোণ দিয়ে দেখল, কিশোর দৌড়ে আসছে, গাড়ির দশ গজ দূরে রয়েছে। পায়ে স্নীকার পরা থাকায় শব্দ হচ্ছে না।

সব চেয়ে শক্ত কাজটা এখন করতে হবে কিশোরকে, হ্যারিকিরির অলক্ষে খুলতে হবে ভ্যানের পেছনের দরজা। কোন রকম শব্দ করা যাবে না। ভ্যানের ইঞ্জিন চালু রয়েছে, এটাই ভরসা।

'চাইলে তোমার কারাতে এসে পরীক্ষা করতে পারো আমার ওপর,' সাহস ফিরে পেয়েছে মুসা। ভয়ঙ্কর জলদস্যুদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে এসেছে ওরা, আর সামান্য একটা পুঁচকে জাপানীর ভয়ে মচকে যাবে, এ হতে পারে না, নিজেকে বোঝাল সে। 'তুমি দশটা দিলে আমি একটা তো দিতে পারব।' জোরে জোরে বলল কিশোরের কাছে শেখা বাংলা কবিতার একটা লাইন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী···'

পকেটে হাত ঢোকাল হ্যারিকিরি।

'কি খুঁজছে ব্যাটা?' কণ্ঠস্বর আরও চড়িয়ে বলল মুসা, 'আল্লাহরে, ব্যাটা আবার পিস্তল বের করবে না তো? নাহ্ হয়তো পয়সা···'

পৌঁছে গেছে কিশোর। সাবধানে দরজার হাতল ধরে ঘোরাল। খুলে ফেলল দরজা।

পাহাড়ের ওপর থেকে রবিন দেখতে পাচ্ছে ভালমত।

কিশোরকে নিচু হয়ে গাড়িতে ঢুকে যেতে দেখল। হাতের রুমালটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে।

আছে, গাড়ির পেছনে খাঁচাটা আছে। ওটা সরিয়ে টমের খাঁচাটা ওই জায়গায় রেখে দিল কিশোর। কানে আসছে মুসার কণ্ঠ, 'যত ভেলকিই দেখাও বাবা, জায়গা ছেড়ে আমি নড়ছি না···আঁউ!' চমকে গেছে কোন কারণে, থেমে গেল কণ্ঠস্বর। কিশোর জানে না, পয়সা নয়, ছুরি বের করেছে হ্যারিকিরি। লম্বা, বাঁকা, ঝকঝকে ফলা।

দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। ফটাস করে শব্দ হলো, বেলুন ফুটল বোধহয়।

'এগিও না, খবরদার!' জোর নেই মুসার গলায়।

আরও কয়েকটা বেলুন ফুটল ফটাস ফটাস করে।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কিশোর, জলদি করো! আর আটকাতে পারছি না। ছুরি চালাচ্ছে ব্যাটা, বেলুনগুলোর দফারফা, আমারও হবে···'

দরজা খুলে লাফিয়ে নামল কিশোর, নিঃশব্দে। খাঁচাটা দুহাতে ধরে রেখেছে বুকের ওপর। একবারও ফিরে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'ভাগো, কিশোর, জলদি করো!' বেলুনগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে মুসা, এদিক ওদিক উড়ছে আর রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ওগুলো। তার ভেতরে একবার এদিকে লাফ দিয়ে পড়ছে সে, একবার ওদিক, হ্যারিকিরির ছুরির পোঁচ থেকে বাঁচার জন্যে। বার বার তাকাচ্ছে ছোট পাহাড়টার দিকে। ইস্, এত দেরি হচ্ছে কেন?

ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে মুসা, এই সময় দেখতে পেল রবিনকে। পাগলের মত রুমাল নাড়ছে সামনে-পিছনে।

এগিয়ে আসছে হ্যারিকিরি।

দু-হাত সামনে তুলে তাকে বলল মুসা, 'যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি, সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজ শেষ। জাহান্নামে যেতে পারো এবার তুমি।' বলেই ঘুরে দিল দৌড়, সরে চলে গেল রাস্তা থেকে।

গাড়িতে ফিরে গেল হ্যারিকিরি। চলে গেল শাঁ করে। চাকার নিচে পড়ে ফাটল আরও কয়েকটা বেলুন।

ধপ করে বসে পড়ল মুসা তুলসীবনের ধারে। হাঁপাচ্ছে।

খাঁচা হাতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কাছে এসে মুসার কাঁধে হাত রেখে শুধু বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

রবিনও এসে দাঁড়াল। 'মুসা, তোমার হয়নি তো কিছু? পোঁচটোঁচ লাগেনি?'

ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। 'না, বেলুনগুলোর ওপর দিয়ে গেছে। তবে আমার বুকের ধড়ফড়ানি বোধহয় আর কোনদিন যাবে না। পারমানেন্ট রোগ বাধালাম।'

তেরো

'যাই হোক,' জিরিয়ে নিয়ে বলল কিশোর, 'কাজ হয়েছে। গাড়িতে করে টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিকিরি।'

'তা গেছে,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা। 'কিন্তু এরপর কি?'

খাঁচার চীজক্লথ খুলছে কিশোর। 'আমাকে একটু সাহায্য করবে, রবিন?'

চীজক্লথ ছিঁড়ে খাঁচার দরজা খুলে পায়রাটাকে বের করল দুজনে।

'ধরো, শক্ত করে ধরে রাখো,' বলল কিশোর।

রবিন ধরে রাখল।

পকেট থেকে একটা অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাতের আঙটা বের করে লাগিয়ে দিল কিশোর কবুতরের পায়ে, তাতে কায়দা করে লাগিয়ে দিল তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড। কার্ডটা ভাঁজ করে শক্ত করে গুঁজে দিয়েছে আঙটার ভেতরে, কেউ না খুললে আপনা-আপনি খুলে পড়বে না। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পায়ের সঙ্গে শক্ত করে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিল।

'মুসা,' বলল কিশোর, 'পায়রাটাকে ছাড়ার সম্মান তোমারই প্রাপ্য।'

খুশি হলো মুসা। কবুতরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ধরে রেখে আরেক হাত ওটার পিঠে বুলিয়ে আদর করল। বলল, 'বাড়ি যাও, খোকা,' বলে উড়িয়ে দিল।

কয়েক সেকেণ্ড মাথার ওপর ফড়ফড় করল পাখিটা, তারপর কোণাকুণি উড়ে শাঁ করে উঠে গেল রকেটের মত, তীব্র গতিতে উড়ে গেল উপকূলের দিকে।

দুই ঘণ্টা পর ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'এসেছ,' ওদের দেখেই এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'আমি তো ভাবলাম, দিনটাও কাটিয়ে আসবে···কিশোর, একগাদা মাল নিয়ে এসেছে তোর চাচা। বোরিস আর রোভার মাল আনতে গেছে আরেকখানে, তোরা একটু হাত লাগাবি?'

মাথা কাত করল কিশোর। কাজ করতে অসুবিধে নেই। দুপুরের দেরি আছে এখনও আরও দু-ঘণ্টা। তাছাড়া অপেক্ষার মুহূর্তগুলো হয় বড় দীর্ঘ। কাজ করলে বরং দ্রুতই কাটবে সময়।

হাত চালাচ্ছে বটে, কিন্তু কাজে মন নেই ওদের। বার বার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। কান খাড়া করে রেখেছে ডানার ঝটপট শব্দের জন্যে।

সাড়ে এগারোটার দিকে চাচাকে ড্রাইভার বানিয়ে নিয়ে চাচী গেলেন বাজার করতে। দুটোর আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। চাচীর সামনে কবুতরটা নামলে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যেত ওর। সেদিক থেকে আপাতত নিশ্চিন্ত।

দুপুরের আগে কাজ থামিয়ে দিল ওরা। ওয়ার্কশপের বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশের দিক থেকে চোখ নামাচ্ছে না তিনজনের একজনও।

বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিন্তু বোকা বনে গেল পরমুহূর্তেই। একটা সোয়ালো উড়ে চলে গেল সাঁ করে।

'ঠিক কখন যে ছাড়বে হ্যারিকিরি, জানি না,' বলল কিশোর। 'হয়তো আগে খাওয়া-দাওয়া, তারপর...'

আবার লাফিয়ে উঠল মুসা।

না, এবার আর ভুল করেনি।

কিশোর আর রবিনও দেখল, চকচকে পালক। মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল।

'টম!' হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। 'টম! এই যে, এখানে টম!'

টমও দেখেছে। গোত্তা দিয়ে নেমে পড়ল একেবারে মুসার বাড়ানো হাতের তালুতে। বার দুই ডানা ঝাপটে চুপ হয়ে বসল।

প্রায় ছোঁ মেরে পাখিটাকে ছিনিয়ে নিল কিশোর। প্রথমেই পা দেখল। পাতলা ধাতুর একটা আঙটা পরানো। কাঁপা হাতে আঙটাটা খুলে ফেলতেই টুপ করে মাটিতে পড়ল উজ্জ্বল একটা কিছু।

উবু হয়ে তুলে নিল কিশোর।

অন্য দুজনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে।

কিশোরের খোলা হাতের তালুতে ঝকমক করছে মস্ত একটা মুক্তো।

'যাক, আমাদের অনুমান তাহলে ঠিকই হয়েছে,' বলল কিশোর। 'হ্যারিকিরি, রিচার্ড হ্যারিস, দু-আঙুলা কবুতর...'

'আমাকে দাও ওটা,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল কেউ।

ঝট করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

ওয়ার্কশপের ভেতর থেকে কথা বলেছে লোকটা। জঞ্জালের বেড়া ঘুরে দরজায় বেরিয়ে এল। পরনে কালো অয়েলস্কিন, চোখে কালো চমশা। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মাঝে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা—নাকের ফুটো দুটো।

ডান হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোল লোকটা। শক্ত করে ধরে রেখেছে লম্বা ব্যারেলের একটা পিস্তল।

মুসার মনে হলো নলের কালো ছিদ্রটা তার বুকের দিকেই নিশানা করে আছে। বুক ধড়ফড়ানি শুরু হলো আবার তার। মনে মনে বলল, 'বলেছিলাম না, রোগটা পারমানেন্ট হয়ে গেছে।' আস্তে করে পাশে সরে যাচ্ছে সে, বেড়ার কাছে।

কিশোরের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। 'দাও, মুক্তোটা আমাকে দাও।'

লোকটার পিস্তল বা মুখের দিকে নজর নেই কিশোরের, সে তাকিয়ে আছে পায়ের দিকে, জুতোর দিকে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে মুক্তোটা মুখে পুরে জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে একদিকের গালের কোণায় নিয়ে এল সে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আর এক পা যদি এগোন, মুক্তোটা আমি গিলে ফেলব।'

রাগে কেঁপে উঠল লোকটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। গলা চেপে ধরতে চায়, যাতে গিলতে না পারে কিশোর।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রবিন। লোকটার কাঁধ চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে

নেয়ার চেষ্টা করল।
সরতে গিয়ে একটা ঝাড়ুর ডাণ্ডায় হোঁচট খেল মুসা।
কিশোরের গলা চেপে ধরে আরেক হাতে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে রবিনকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে লোকটা। বুকে বাড়ি খেয়ে ব্যথায় উফ করে উঠল রবিন। কিন্তু লোকটার কাঁধ ছাড়ল না, অয়েলস্কিন খামচে ধরে প্রায় ঝুলে রইল।
ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত ছাড়াতে চাইছে কিশোর। মুক্তোটা গালের কোণে আটকে রেখেছে শক্ত করে।
'সরো, রবিন, সরো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
সাহস ফিরে পেয়েছে আবার গোয়েন্দা-সহকারী। তার এই আরেক গুণ, এমনিতে ভয় পেলেও সত্যিকার বিপদের সময় বাঘের বাচ্চা হয়ে ওঠে সে, রীতিমত দুঃসাহসী বলা যায় তখন।
সরে গেল রবিন।
ঝাঁটার ডাণ্ডা দিয়ে ধাঁ করে লোকটার ঘাড়ে বাড়ি লাগিয়ে দিল মুসা।
কিশোরের গলা ছেড়ে দিল লোকটা, টলে পড়ে যাচ্ছে। হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল, নাকের ওপর থেকে খসে পড়ল চশমা।
কোনমতে সামলে নিল সে আবার, কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পারলাম না আমি। তোমাদেরই জিত হলো।' চোখ টিপল অদ্ভুত ভঙ্গিতে।
পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল কিশোর। 'গুলি আছে?'
'না না, বাতিল, নষ্ট পিস্তল। বন্দুক-টন্দুককে সাংঘাতিক ভয় পাই আমি,' চোখ পিটল লোকটা পর পর দুবার। ইচ্ছে করে করছে না এমন, এটা তার মুদ্রাদোষ। দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।
বাড়ি মারার জন্যে ডাণ্ডা তুলল মুসা।
'মেরো না, মেরো না,' তাড়াতাড়ি দু-হাত নাড়ল লোকটা। 'আর ভাল লাগছে না আমার এসব। কেন যে মরতে এই অকাজ করতে গিয়েছিলাম। সব সর্বনাশের মূল ওই ঘোড়া, বুঝেছ, ঘোড়া। রেস খেলে ফতুর হয়ে গেছি, ধারকর্জ করে করে···লোকজন তাগাদা দিচ্ছে টাকার জন্যে। তাই কিছু টাকা জোগাড় করতে চেয়েছিলাম।'
লোকটার জন্যে এখন দুঃখই হচ্ছে কিশোরের। 'হয়ে যেত জোগাড়, মিস কারমাইকেলের বাজপাখিগুলোর জন্যে পারলেন না।'
মুখ থেকে মুক্তোটা বের করে পকেটে রেখে দিল কিশোর।
চুপচাপ দেখল লোকটা, অসহায় ভাবভঙ্গি।
'ওগুলো আর খামোকা লাগিয়ে রেখেছেন কেন?' বলল কিশোর। 'ওই দাড়িগোঁফ। খুলে ফেলুন। অস্বস্তি লাগছে না?'
'হ্যাঁ, খুলেই ফেলি,' চোখ টিপল ব্লিংকি।
দাড়িগোঁফ আর কালো অয়েলস্কিন খুলে ফেলার পর উলঙ্গ মনে হলো অসকার স্লেটারকে। দেহের আকারও যেন এক ধাক্কায় কমে গেছে অনেক।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ক্রমাগত চোখ টিপে যাচ্ছে লোকটা। রবিন আর মুসাকে পাহারায় রেখে থানায় ফোন করতে চলল কিশোর।

চোদ্দ

'সব স্বীকার করেছে অসকার স্লেটার,' বলল কিশোর। 'তিনজনকেই অ্যারেস্ট করে হাজতে ভরেছিল পুলিশ। ব্লিংকি, রিচার্ড হ্যারিস, হ্যারিকিরি। হ্যারিস আর হ্যারিকিরি জামিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ব্লিংকি ইচ্ছে করেই রয়ে গেছে হাজতে, জামিনে মুক্তি নেয়ার চেষ্টা করছে না। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, গোপনে বলেছে আমাকে একথা। হাজতে থাকলেই নাকি এখন তার ভাল, নিজেকে শোধরাতে বাধ্য হবে। রেস খেলা বন্ধ হবে। তবে আমার ধারণা, আসল কারণটা অন্য, হ্যারিস আর হ্যারিকিরির ভয়েই আসলে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না।'

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তাদের এবারকার কেসের রিপোর্ট দিচ্ছে পরিচালককে।

'ওদের মুক্তো চুরির খবর জানল কি করে ব্লিংকি?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'রিচার্ড হ্যারিসের চাকরি করত সে,' জবাব দিল রবিন। 'কবুতর দেখাশোনা করত, গহনার দোকানেও সাহায্য করত মাঝেসাঝে। তারপর একদিন ক্যাশ চুরি করে ধরা পড়ল। বের করে দিল তাকে হ্যারিস। কিন্তু ততদিনে হ্যারিসের গোপন ব্যবসার অনেকখানিই জেনে ফেলেছে ব্লিংকি, জেনে গেছে বেআইনী পথে মুক্তো আসে।'

'কিন্তু কোন পথে আসে, জানত না,' রবিনের কথার রেশ ধরে বলল মুসা। 'চাকরি যাওয়ার পর পেছনে লাগল সে। বের করে ছাড়ল, কোন পথে মুক্তো আসে।'

'আকাশ পথে,' চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। 'তাতেই মতলবটা মাথায় ঢুকল ব্লিংকির, ওরা যদি কবুতর দিয়ে আনাতে পারে, সে কেন পারবে না। এর জন্যে তার নিজস্ব কয়েকটা রেসিং হোমার দরকার শুধু। তাই না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দুটো সুবিধে ছিল ব্লিংকির। এক, রিচার্ড হ্যারিস একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে যে বিপদ হয়, এটা তার জানা, ফলে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিল সে। হপ্তার নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে কেবল কবুতর রেখে আসত হ্যারিকিরির ভ্যানে, কখনও সকালে, কখনও আগের দিন বিকেলে। হ্যারিকিরির সঙ্গে দেখা করত না সে, খুব হুঁশিয়ার লোক, টাকা দিত মাসে একবার। তা-ও হাতে হাতে নয়, খামে টাকা ভরে খাঁচার সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকে চীজক্লথ মুড়ে রেখে আসত ভ্যানে, কবুতরের সঙ্গে...'

'তবে জরুরী দরকার পড়লে দেখা করতেই হত,' যোগ করল কিশোর। 'তেমন একটা জরুরী অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলাম আমরা, টমকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে। ভয় পেয়ে যায় হ্যারিস, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ছোটে হ্যারিকিরির বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে সেদিনই দেখা হয়েছিল তার।'

'তোমাদেরকে লাঞ্চ খাইয়েছে যেদিন,' মাথা নোয়ালেন পরিচালক। 'কিশোর, দ্বিতীয় সুবিধেটা কি?'

'হ্যারিকিরি জাপানী,' বলল কিশোর। 'মাঝারি উচ্চতা, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফওয়ালা যে কোন আমেরিকানের চেহারা তার কাছে একরকম। দূর থেকে পোর্টিকোর ম্লান আলোয় আলাদা করে চিনতেই পারে না। অয়েলস্কিন পরে, নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে যখন যেত ব্লিংকি, ভ্যানে কবুতর রাখতে, বুঝতেই পারত না হ্যারিকিরি যে লোকটা হ্যারিস নয়। আড়ালে থেকে লক্ষ রাখত ব্লিংকি, হ্যারিস আসে কিনা, যদি না আসত, খাঁচায় ভরা নিজের কবুতর নিয়ে গিয়ে রেখে আসত ভ্যানে।'

'হুঁ, বুদ্ধিটা ভালই,' বললেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, ভালই চলছিল বেশ কিছুদিন। হ্যারিকিরি টের পাচ্ছিল না, ফলে ব্লিংকিও মুক্তো পাচ্ছিল। বাধ সাধল মিস কারমাইকেলের শিকারী বাজ।'

'ব্লিংকিকে নিশ্চয় চেনেন মিস কারমাইকেল, না?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'অনেক দিন হ্যারিসের ওখানে চাকরি করেছে লোকটা, মহিলাও দামী কাস্টোমার, পরিচয় হয়ে যাওয়ার কথা। তারমানে মহিলার বাড়িও চেনে। কবুতর যখন ফিরল না একদিন, নিশ্চয় খোঁজখবর নিতে শুরু করল। সন্দেহ করল, মিস কারমাইকেলের বাজপাখিই এজন্যে দায়ী। ব্যস, গিয়ে শুরু করল বাজগুলোকে বিষ খাওয়ানো, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। আরেকটা গোলমাল হলো, হঠাৎ করে বাড়ি বদল করল হ্যারিকিরি। ওদিকে পাওনাদারেরা চাপ দিতে শুরু করেছে। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ব্লিংকি। হ্যারিকিরিকে অনুসরণ করে তার বাড়ির খোঁজ বের করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না সে। সেদিন সেজন্যেই বসেছিল সে স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে। তাড়াহুড়োয় ভুলে দু-আঙুলার খাঁচাটা ফেলে যায়।'

'হুঁ, এই প্রশ্নটারই জবাব পাচ্ছিলাম না,' ওপরে নিচে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তারপর কি করল? দু-আঙুলাটাকে বদলে আনল কেন আবার?'

'হ্যারিকিরির পিছু নিয়ে তার নূতন বাড়িতে চলে গেল ব্লিংকি,' বলে গেল কিশোর। 'লুকিয়ে রইল দূরে, চোখ রাখল বাড়ির ওপর। সেদিন বিকেলেই এল হ্যারিস, কবুতর নিয়ে। আগের দিন বাড়ি বদলেছে হ্যারিকিরি, ঝামেলা ছিল, ফলে ছুটি নিতে হয়েছে, তাই পরের দিন ছুটির মধ্যে কাজ করে দেয়ার কথা। দুদিন মুক্তো পায়নি, তাই হ্যারিসও সেদিন কবুতর নিয়ে এসেছে। ভ্যানের পেছনে খাঁচা রেখে সে চলে গেল। ব্লিংকির তখন টাকার খুব দরকার। সে গিয়ে খাঁচাটা বের করে নিয়ে এল, তার নিজের কবুতর রাখবে তার জায়গায়। কিন্তু রেস্টুরেন্টে ফোন করে করে জানল, তার খাঁচা নিয়ে গেছি আমরা। ফলে আমাদের খুঁজে বের করতে হলো তাকে। হ্যারিসের কবুতরটা ছাড়তে সাহস হয়নি তার, ওটা ফিরে যাবে বাড়িতে, তাহলে গণ্ডগোল লাগবে। তাই তারটা খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে হ্যারিসেরটা ভরে রেখে গেল।'

'কিন্তু পরদিন দুপুরে তার কবুতর মুক্তো নিয়ে ফেরেনি,' বললেন পরিচালক।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এর আগেও দুটো কবুতর আর মুক্তো খুইয়েছে

ব্লিংকি। তিন নম্বরটা হারিয়ে ভীষণ রেগে গেল সে। মিস কারমাইকেলের বাড়ি গিয়ে বাজপাখিকে বিষ খাওয়াতে শুরু করল। আমাদেরকে ঢুকতে দেখেছে সে। দোয়েলটা যে তার মুক্তো চুরি করেছে, এটাও নিশ্চয় দেখেছে।'

'তাই মাথা আর ঠিক রাখতে পারেনি,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'রাগের মাথায় পিটিয়ে মেরেছে দোয়েলটাকে।'

'আমাদেরকে বেরোতেও দেখেছে সে,' আবার বলল কিশোর, 'টমকে দেখেছে আমাদের সঙ্গে। পিছু নিয়েছে। আমাদেরকে হ্যারিসের দোকানে ঢুকতে দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে।'

'ফুটপাথে বেরিয়ে দেখেছি আমরা কালো গাড়িটাকে,' প্রমাণ দিল রবিন।

'নিশ্চয় দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল ব্লিংকি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'হ্যারিসের সঙ্গে তোমাদের কি কথাবার্তা হয়েছে, জানার কথা নয় তার।'

'হ্যাঁ,' হেলান দিল কিশোর। 'খুব বেশি চালাকি করেছে হ্যারিস আমাদের সঙ্গে। টমকে যেন চিনতেই পারেনি, এমন ভাব দেখিয়েছে। মেয়ে রেসিং হোমার রেস দেয় না, একথা বলে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে।'

'সে তো আর কল্পনা করেনি, কার পাল্লায় পড়েছে,' হাসল মুসা।

'তিন গোয়েন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ভুলই করেছে সে,' স্বীকার করলেন পরিচালক। 'তারপর?'

'ব্লিংকি গেল ভয় পেয়ে,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'সে চাইল, আমাদের সন্দেহ হ্যারিসের ওপর পড়ুক, একই সঙ্গে টমকে ছেড়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে হ্যারিসকেও ঠাণ্ডা রাখতে চাইল, তাই ফোন করল আমাদেরকে। টমকে নিয়ে যেতে বলল। গেলাম। পাখিটা ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে।'

থামল কিশোর। 'আমাকে বোকা প্রায় বানিয়েই ফেলেছিল। আবছা অন্ধকারে এক পলকের জন্যে চেহারা দেখেছি তার। তাছাড়া মিস কারমাইকেলের বাগানে যে চেহারা দেখেছি, ওটা সেই একই চেহারা।'

'সন্দেহ শুরু করলে কখন?'

'বাগানেই সন্দেহ করেছি। সাইকেলের আলো মুখে পড়ায় যখন ঘাবড়ে পালাল। এক বাড়ি মেরে মিস করেছে, আরও তো মারতে পারত। তা না করে দৌড়, ভয় যে পেয়েছে সেটা প্রকাশ করে দিল। তারপর পেলাম পায়ের ছাপ। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছে মুসা…'

'আমি?' সহকারী গোয়েন্দা অবাক।

'হ্যাঁ, তুমি, মানে তোমার বাবার কালো চশমা। সেদিন তুলসীবনে ওটা পরেই ঘুমিয়েছিলে, তোমার চোখ দেখতে পাইনি। শিওর হয়ে গেলাম, কেন চশমা না পরে সামনে আসে না ব্লিংকি। কারণ, তার চোখ মিটমিট করার মুদ্রাদোষ আছে। চশমা ছাড়া লুকায় কি করে?'

'হুঁ,' চেয়ারের হাতলে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন পরিচালক। 'তা, মিস কারমাইকেল কেমন আছেন? তাঁর পাখি খুনের রহস্য তো ভেদ হলো।'

'ভাল,' হেসে বলল মুসা। 'তাঁর বাজ পাখিকে বিষ খাওয়াবে না আর কেউ।

তবে হীরার কথা তুললেই মন খারাপ হয়ে যায়।'

'দোয়েল তো আরেকটা আছে···কি যেন নাম···'

'পান্না। কিন্তু ওটা তো হীরার মত মুক্তো আনে না। আনে যত্তোসব চুলদাড়ি, ভাঙা কাচ···'

'তবে দাড়ি পেয়ে কিশোরের সুবিধে হয়েছে,' বললেন পরিচালক। 'তাই না, কিশোর?'

'হ্যাঁ, স্যার। ব্লিংকির দাড়িগোঁফ যে নকল, বুঝতে পেরেছি।'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল মিস্টার ক্রিস্টোফারের বেয়ারা। এক হাতে কয়েকটা খাবারের বাক্স, আরেক হাতের তালুতে বসে আছে একটা তোতা।

মুসার উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করলেন পরিচালক, 'জানি তো, অনেক কথা থাকবে তোমাদের। তাই আসছ ফোন পেয়েই অর্ডার দিয়ে রেখেছি···' বেয়ারার দিকে ফিরলেন। 'কার তোতা ওটা? কোত্থেকে আনলে?'

'মুসা আমানের সাইকেলে বসা দেখলাম,' জবাব দিল বেয়ারা। 'খালি চেঁচাচ্ছিল। কিচ্ছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, ওনাদেরই কারও,' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। 'আসবে নাকি জিজ্ঞেস করতেই উড়ে এসে বসল হাতে। রেখে আসতে পারলাম না।'

'এটাই মিস কারমাইকেলের সেই তোতা নাকি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল মুসা। 'তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, তোতাটা কিছুতেই ছাড়ল না, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মিস কারমাইকেলকে বলেছি, সন্ধ্যায় ফিরিয়ে দিয়ে আসব।'

'জিম বলছে, কিছু নাকি বলছিল।'

'কি রে, কি বলছিলি?' তোতাটাকে হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

যেন মুসার প্রশ্নের জবাবেই গেয়ে উঠল তোতা, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন পরিচালক। চোখ নাচালেন, অর্থাৎ মানে কি?

'বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, স্যার,' বলল মুসা। 'সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম আমরা, শিখে নিয়েছে।'

'কি মিস্টার,' খাবারের বাক্স খুলতে খুলতে তোতাটার দিকে ফিরে চাইল বেয়ারা, 'বাড়ি আমেরিকায়, থাকো আমেরিকায়, খাও এখানকার, গান বাংলাদেশের কেন? খুব খারাপ কথা।'

'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তোতা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

হেসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সদাগম্ভীর চিত্রপরিচালক পর্যন্ত সব কিছু ভুলে হেসে উঠলেন হো হো করে।

***
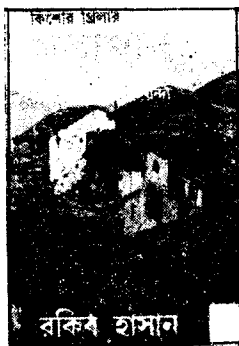
মৃত্যুখনি

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৮

'এই যে, কিশোর,' দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা তুলে উঁকি দিয়েই বলল মুসা আমান, 'জানো, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মুসার পেছনে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল রবিন মিলফোর্ড।

হেডকোয়ার্টার মানে পুরানো বাতিল একটা ট্রেলার—মোবাইল হোম, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের পাহাড় প্রমাণ লোহালক্কড়ের জঞ্জালের তলায় চাপা পড়েছে অনেক দিন আগে, বাইরে থেকে দেখা যায় না। ভেতরে ঢোকার জন্যে কয়েকটা গোপন পথ বানিয়ে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা, তারই একটা 'দুই সুড়ঙ্গ'।

'জানি,' বলল ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসা কিশোর পাশা, 'মেরিচাচী। আজ ভোর ছটায় উঠে নাস্তা খাইয়ে জোর করে রাশেদ চাচাকে পাঠিয়েছে একটা গ্যারেজে, পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ওখানে নাকি অনেক পুরানো মাল বিক্রি হবে, জিনিসপত্রের লিস্ট দেখে খুব পছন্দ হয়েছে চাচীর।'

ঘড়ির দিকে তাকাল সে। 'সোয়া একটা বাজে। এতক্ষণে নিশ্চয় এসে পড়েছে চাচা। ট্রাক বোঝাই করে মালপত্র নিয়ে এসেছে। বোরিস আর রোভার একা পারছে না, নামানোর জন্যে আমাদেরকেও দরকার। তাই ওয়ার্কশপে খুঁজতে এসেছে চাচী, আসার সময় তাকেই দেখে এসেছ।'

'হলো না,' হাসল রবিন। 'ভুল করলে মিস্টার শার্লক হোমস,' চেয়ারে বসতে বসতে বলল সে। 'কিশোর পাশাও ভুল করে তাহলে।'

'চাচী নয়, কিশোর, চাচী নয়,' মুখ টিপে হাসল মুসা। 'অনুমান করো তো, আর কে হতে পারে?'

'উঁ-হুঁ, পারছি না,' অবাক হয়েছে যেন কিশোর। 'তোমরাই বলো।'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে,' খুব মজা পাচ্ছে সহকারী গোয়েন্দা, 'এত তাড়াহুড়ো কেন? এসেছি, দু-দণ্ড বসি, জিরাই, তারপর বলব। এখন কেমন লাগছে? কোন রহস্য যখন বুঝি না, আমাদের ধাঁধায় রেখে খুব তো মজা পাও। এখন?'

'না ভাই, আর থাকতে পারছি না,' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল কিশোর। 'বলো না, বলেই ফেলো।'

'তাহলে ভবিষ্যতে আর ভোগাবে না তো আমাদের?'

'না।'

রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'কি রবিন, বলব?'

মাথা কাত করল রবিন। কিশোরের হাবভাব সন্দিহান করে তুলছে তাকে। এভাবে আগ্রহ প্রকাশ করবে কিশোর পাশা?...নাহ্ ঠিক মানাচ্ছে না স্বভাবের

সঙ্গে…'

'সকালে বাজারে গিয়েছিলাম,' বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে মুসা, এতক্ষণ চেপে রাখতে তারই কষ্ট হয়েছে। 'দেখা হয়ে গেল জিনার সঙ্গে।'

'জিনা?' ঝট করে সোজা হলো কিশোর।

'আরে হ্যাঁ, জিনা। আমাদের জরজিনা পারকার।'

'তাই নাকি? আমি তো জানতাম নিউ মেকসিকোয় ছুটি কাটাচ্ছে ও, চাচার র‍্যাঞ্চে। তার মা-বাবা গেছেন জাপানে, সেখানে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেবেন মিস্টার পারকার।'

'তুমি জানতে? কই বলোনি তো।'

'জিজ্ঞেস তো করোনি। যাকগে, কোথায় এখন জিনা?'

'পারকার হাউসে,' জবাব দিল রবিন। 'মুসার কাছে শুনলাম, কিছু জিনিসপত্র নিতে এসেছে, গুছিয়ে নিচ্ছে হয়তো।'

'জ্বী না, জনাবেরা। আমি এখানে,' পর্দা সরিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল জিনা। পরনে রঙচটা জিনসের প্যান্ট, গায়ে ধবধবে সাদা সিল্কের ওয়েস্টার্ন শার্ট, যেন এই মাত্র নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

হাঁ হয়ে গেল মুসা আর রবিন।

মিটিমিটি হাসছে কিশোর।

'তু-তুমি!' তোতলাচ্ছে মুসা কিশোরের দিকে চেয়ে। 'আমাদের বোকা…দুত্তোর!' নিজের ওপর রেগে গেল সে। ভেবেছিল কিশোরকে জব্দ করবে, উল্টে তাদের দুজনকেই এমন চমকে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। হতাশ চোখে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।

'তুমি বাড়ি যাওনি?' রবিন জিজ্ঞেস করল জিনাকে।

'না, বাজার থেকে সোজা চলে এসেছি। এই তো, আমিও ঢুকলাম, তোমরাও ঢুকলে।'

'তবে না বলেছিলে, বাড়ি যাবে?' ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারল না মুসা, যেন সব দোষ জিনার।

'বলেছিলাম, কিন্তু যাইনি।'

'ইচ্ছে করেই যাওনি, আমাদের জব্দ করার জন্যে।'

'আরে, কি মুশকিল? আমি জানি নাকি, তুমি এসে এ-রকম করবে কিশোরের সঙ্গে। এতই যদি ঠকানোর ইচ্ছে ছিল, আগে বললে না কেন আমাকে?'

'আরে দূর, রাখো তো,' ধমক দিয়ে দুজনকে থামাল রবিন। 'কি ছেলেমানুষী করছ? মুসা, তখনই বলেছিলাম, এসবের দরকার নেই, পারবে না কিশোরের সঙ্গে। ও সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকে।'

'খামোকা লজ্জা দিচ্ছ, রবিন,' বাধা দিল কিশোর। 'এটাতে আমার কোন হাত ছিল না, নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই ঘটে গেছে, জিনা তোমাদের আগে চলে এসেছে…যাকগে, জিনা, বসো। তা কি মনে করে?'

'এমনি। চাচার কাজ ছিল রকি বীচে। জিজ্ঞেস করল আসব নাকি? ভাবলাম,

তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাছাড়া কয়েকটা জিনিস রয়েছে বাড়িতে, নিয়ে যাব।'

'কবে যাচ্ছ? আজই?'

'আগামীকাল।'

'ভালই কাটছে তাহলে ছুটি।'

'দারুণ,' মাথা ঝাঁকি দিল জিনা, মুখের ওপর এসে পড়ল এক গোছা রোদেপোড়া তামাটে চুল, সরালো। 'যা একখান কেস পেয়েছি না।' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বড় বড় তামাটে দুটো চোখের তারা।

'কেস?' মুসার রাগ পানি।

'হ্যাঁ,' ওপরে নিচে মাথা দোলাল জিনা। 'চাচার চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

'কেন বোকা নাকি তোমার চাচা?'

'তুমি যে কি বলো, মুসা, চাচা বোকা হবে কেন? আমার বাপের ফুফাত ভাই কোয়েনটিন উইলসনকে বোকা বলে কার সাধ্য? স্টক মার্কেটে অনেক টাকা কামিয়েছে, নিউ মেকসিকোয় র‍্যাঞ্চ আর জায়গা কিনে এখন ক্রিস্টমাস গাছের ব্যবসা ফেঁদেছে। এমনিতে খুব চালাক। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে একেবারে দিল-দরিয়া, সবাইকেই বিশ্বাস করে, সেজন্যে ঠকেও মাঝে-মধ্যে, তা-ও শিক্ষা হয় না।'

'তুমি তাহলে মানুষ চেনো বলতে চাও,' হাসল মুসা।

'সবাইকে চিনি বলাটা ঠিক হবে না,' রাগল না জিনা, কিন্তু মুসার খোঁচাটা ফিরিয়ে দিল, 'তবে হদ্দ বোকা, আর হারামী লোক দেখলেই চিনতে পারি।' কিশোরের দিকে ফিরল। 'চাচা যে জায়গাটা কিনেছে, সেটা আগে মাইনিং কোম্পানির ছিল। একটা খনি এখনও আছে, নাম ডেথ ট্র্যাপ মাইন।'

'মৃত্যুখনি,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'আরিব্বাবা, সাংঘাতিক নাম তো,' চোখ বড় বড় করল মুসা।

'তা কি পাওয়া যায় ওই খনিতে? ডাইনোসরের হাড়?'

'রূপা,' মুসার কথা গায়ে মাখল না জিনা। 'খনিটা এখন মৃত। রূপাও ফুরিয়েছে। ওরকম নাম দেয়ার কারণ, এক মহিলা ওটাতে পড়ে মরেছিল। টুইন লেকসে খনির আশেপাশে এখনও নাকি মাঝে-সাঝে ওই মহিলার ভূত দেখা যায়। আমি এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না। তবে শয়তানের ছোঁয়া আছে ওখানে। খনি আর তার আশপাশের অনেক জায়গা কিনে নিয়েছে এক ব্যাটা।' রোদে পোড়া গালের চামড়ায় রক্ত জমল তার। 'কিছু একটা কুকাজ করছে হারামীটা, বদমতলব আছে। আরও মজা কি জানো, ব্যাটা জন্মেছেও টুইন লেকসে।'

'সেটা কি অপরাধ নাকি?' অবাক হলো রবিন।

'না। তবে কেউ জন্মের পর পরই যদি কোনও জায়গা ছেড়ে চলে গিয়ে কোটিপতি হয়ে ফিরে আসে, অনেক জায়গা কিনে বসবাস শুরু করে আর ভাব দেখায়, আহা আমার মাতৃভূমি, আমি তোমায় কত ভালবাসি।—তাহলে গা জ্বলে না? আস্ত ভণ্ড! লোকটা র‍্যাটল সাপের চেয়েও বদ। খনির মুখ আবার খুলেছে সে।

লোহার গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল, সে খুলেছে, তারপর খনির মুখে পাহারায় রেখেছে এক বাঘা কুকুর। ওই মরা খনিতে কি পাহারা দেয়? ঝকঝকে নতুন জিনস আর শক্ত হ্যাট পরে ঘুরে বেড়ায় ব্যাটা, একেবারেই বেমানান। মেয়েদের মত নখের যত্ন করে আবার। বলো, ব্যাটাচ্ছেলের এই ন্যাকামি সহ্য হয়?' চুপ করল জিনা। ছেলেরা কেউ কিছু বলছে না দেখে আবার মুখ খুলল, 'খনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। ব্যাপার সুবিধে ঠেকছে না আমার। চাচার ঠিক নাকের সামনে কিছু একটা করছে সে। চাচা বুঝতে পারছে না বটে, কিন্তু আমি সব শয়তানী বের করেই ছাড়ব।'

'আল্লাহ তোমার সহায় হোন,' শান্তকণ্ঠে বলল মুসা।

মুসার ছাল ছাড়ানোর জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল জিনা, এই সময় স্পীকারে ডাক শোনা গেল, 'জিনা?'

উঠে গিয়ে ট্রেলারের ছাতে বসানো পেরিস্কোপ 'সর্বদর্শন'-এ চোখ রাখল রবিন। 'একজন লোক, সাদা চুল, বড় গোঁফ। মেরিচাচীও সঙ্গে আছেন।'

'আমার চাচা,' উঠে দাঁড়াল জিনা। 'বলে এসেছিলাম আমি এখানে থাকব। তোমরা দেখা করবে চাচার সঙ্গে? খুব ভাল মানুষ, আমি খুব পছন্দ করি।'

উঠল কিশোর।

বেরিয়ে এল ওরা চারজনেই।

'এই যে,' দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে শেয়ালগুলো। এত চেষ্টা করলাম, গর্তটার মুখ খুঁজে পেলাম না আজতক।'

'চাচী, কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ভাল। তুমি কেমন?'

শুধু মাথা কাত করে বোঝাল জিনা, ভালই আছে।

এগিয়ে এলেন মিস্টার উইলসন, একে একে হাত মেলালেন তিন কিশোরের সঙ্গে। আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

'তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা। তোমাদের প্রশংসা এত করেছে জিনা...'

'দূর, কই এত বললাম,' লজ্জা পেয়েছে জিনা, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'আমাদের কার্ড। যদি কখনও দরকার লাগে...'

কার্ডটা পড়লেন উইলসন। ভুরু কোঁচকালেন, 'আশ্চর্যবোধকগুলো কেন?'

'আমাদের মনোগ্রাম,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল কিশোর। 'সব রকম আজব রহস্যের কিনারা করতে আমরা প্রস্তুত, এটা তারই সঙ্কেত।'

'হুঁ,' হাসলেন তিনি। 'রহস্য সমাধান করতে তোমাদের দরকার কখনও পড়বে না... তবে হ্যাঁ, অন্য একটা কাজে সাহায্য করতে পারো। মালির কাজ করেছ কখনও?'

'তা বোধহয় করেনি,' হেসে বলল জিনা। 'তবে ইয়ার্ডে জোগালীর কাজ প্রায়ই করে। শুনেছি, তার জন্যে টাকাও নেয় আবার।'

'তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভাল। তোমরা গাছ ছাঁটতে পারবে?'

'গাছ?' রবিন বলল।

'ক্রিস্টমাস গাছ,' বললেন উইলসন। ছেঁটে ছেঁটে ডাল পাতা ঠিক রাখতে হয়, নইলে বড়দিনের সময় মাপমত থাকে না, বেয়াড়া রকম ছড়িয়ে যায় এদিক ওদিক। টুইন লেকসে লোক পাচ্ছি না। এখন তো তোমাদের ছুটি, চলো না কাল আমাদের সঙ্গে। দুই হপ্তায় অনেক উপকার হবে আমার।'

চাচীর দিকে তাকাল কিশোর নীরবে।

ইঙ্গিতটা বুঝলেন উইলসন। মেরিচাচীকে বললেন, 'কোন অসুবিধে হবে না ওদের, মিসেস পাশা। অনেক ঘর খালি আছে আমার, খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কিশোরকে যাওয়ার অনুমতি দিন আপনি, মুসা আর রবিনের মায়ের সঙ্গে আমি নাহয় কথা বলবো।'

'আমি বললেও রাজি হবে,' ভাবলেন মেরিচাচী। 'কিন্তু কথা সেটা না। ইয়ার্ডেও অনেক কাজ। ভাবছিলাম, জঞ্জাল অনেক জমেছে, ওদের স্কুল যখন ছুটি, সাফ করে ফেলত পারত।'

'চাচী,' এগিয়ে গিয়ে চাচীর দুই কাঁধে হাত রাখল কিশোর, 'তোমার কাজ পরেও করে দিতে পারব আমরা। মেকসিকোয় যাওয়ার শখ আমার অনেকদিনের, সুযোগ পাইনি। আঙ্কেল এত করে বলছেন...'

'চাচী, মানা করবেন না, প্লীজ,' জিনাও কিশোরের সঙ্গে সুর মেলাল। 'ওদের খাওয়ার দিকে আমি খেয়াল রাখব, নিজে...'

'ঠিক আছে,' আর অমত করলেন না মেরিচাচী।

কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ টিপল জিনা, মুখে রহস্যময় হাসি।

হঠাৎ বুঝে ফেলল কিশোর, ফাঁদে ফেলেছে ওদেরকে জিনা। বেশ কায়দা করে রাজি করিয়ে নিয়েছে। গাছকাটা না ছাই, আসলে জিনার ইচ্ছে, একবার তিন গোয়েন্দাকে নিউ মেকসিকোয় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে হয়, 'হারামী লোকটার' রহস্য সমাধানে সাহায্য না করে যাবে কোথায়?

নিজের ওপর রেগে গেল কিশোর, এত সহজে ধরা দিল বলে। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই, মেরিচাচীকে রাজী করাতে সে নিজেই চাপাচাপি করছে। তবে অখুশি হওয়ারও কোন কারণ নেই, রহস্যের পূজারী সে, রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে, তাছাড়া রয়েছে নতুন দেশ দেখার উন্মাদনা।

'চাচী,' হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার, 'মাকে আগে আপনি ফোন করে দিন। তারপর আমি গিয়ে বলব।'

'যাই লাইব্রেরিতে গিয়ে ছুটি নিয়ে আসি,' রবিন বলল। 'চাচী, আমার মাকেও বলবেন। বাবাও মনে হয় বাসায় আছে এখন।' সাইকেলের দিকে দৌড় দিল সে।

সেদিকে চেয়ে হাসলেন চাচী।

'হ্যাঁ, মিসেস পাশা,' বললেন উইলসন, 'কিচ্ছু ভাববেন না। বেশি খাটাব না ছেলেদের...'

'মোটেও ভাবি না আমি,' হেসে বললেন মেরিচাচী, 'আদৌ খাটাতে পারেন কিনা দেখেন। কি ভাবে যে ফাঁকি দেবে, টেরই পাবেন না। আপনার কি মনে হয়,

গাছ কাটার জন্যে ওদের এত উৎসাহ? মোটেও না। মস্ত কোন ঘাপলা আছে কোথাও,' জিনার দিকে তাকালেন তিনি।

চট করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল জিনা।

দুই

'ওই যে, টুইন লেকস,' ঘোষণা করলেন মিস্টার উইলসন।

বড় একটা এয়ার-কণ্ডিশনড স্টেশন ওয়াগনে করে অ্যারিজোনা মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে ওরা। দক্ষিণ-পশ্চিমে মাথা চাড়া দিচ্ছে নিউ মেকসিকোর পাহাড়শ্রেণী। পেছনের সীটে বসে উৎসুক হয়ে জানালা দিয়ে দেখছে ছেলেরা। পাকা চওড়া সড়কের শেষ মাথায় রুক্ষ পর্বতের কোলে সবুজে ছাওয়া একটা মরুদ্যান যেন হঠাৎ করে গজিয়েছে। ধুলোয় ধূসর পথের ধারে কাঠের বাড়িঘর চোখে পড়ছে এখান থেকেই।

আরও এগোলো গাড়ি। মেইন রোডের ধারে পথের দিকে মুখ করে রয়েছে মুদী দোকান, ওষুধের দোকান, খবরের কাগজের অফিস, আর ছোট একটা লোহালক্কড়ের দোকান।

শহরের কেন্দ্রে দোতলা একটা পাকা বাড়ি, কোর্টহাউস। বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে পেট্রল স্টেশন, তারও পরে টুইন লেকসের দমকল বাহিনীর অফিস।

'আগুন!' হাত তুলে দেখাল মুসা।

শহরের বাইরে এক জায়গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে কালো হয়ে গেছে বিকেলের আকাশ।

'ভয় নেই,' ফিরে বলল জিনা, সামনে, চাচার সীটের পাশে বসেছে। 'করাত কলের চুলোর ধোঁয়া।'

'এককালে খনিই ছিল এখানকার গরম ব্যবসা,' গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন মিস্টার উইলসন। 'এখন কাঠের কলই ভরসা। কাঠের ব্যবসাই টিকিয়ে রেখেছে শহরটাকে। অথচ, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কি জমজমাট শহরই না ছিল।'

'বেশি হট্টগোল আমার ভাল্লাগে না,' বলল মুসা। 'মন টেকে না। শান্তই ভাল।'

ক্ষণিকের জন্যে ফিরে তাকালেন মিস্টার উইলসন। 'শান্ত? জিনা, গপ্পো দুয়েকখান শোনাও তোমার বন্ধুকে। টুইন লেকস শান্ত, হাহ্‌! আমি বলতে চেয়েছি, আগের টাকার গরম আর নেই এখন শহরটার।'

'আমার গপ্পো এখন একটাই,' সামনের দিকে চেয়ে থেমে গেল জিনা। হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। গাড়ি থামালেন মিস্টার উইলসন, জিনসের প্যান্ট আর লম্বা ঝুলওয়ালা পশমী শার্ট পরা এক মহিলাকে রাস্তা পেরোতে দিলেন।

'একটাই কথা,' আবার বলল জিনা, 'হ্যারি ম্যাকআরথার একটা আস্ত ভণ্ড।'

নাক দিয়ে হাসি আর গোঙানির মাঝামাঝি একটা বিচিত্র শব্দ করলেন মিস্টার উইলসন, ব্রেক চেপে রেখে ফিরলেন ছেলেদের দিকে। 'দেখো, জিনার কথায়

মিস্টার ম্যাকআরথারের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে যেয়ো না। ও আমার পড়শী, আর পড়শীর সঙ্গে মুখ কালাকালি ভাল না। তাছাড়া সুখ্যাতি আছে তার। তার ওপর রয়েছে টাকা, প্রচুর টাকা। টুইন লেকস তার জন্মভূমি, এত বছর পরও তাই ফিরে এসেছে। আমাকে বলেছে, ছেলেবেলায় খনি শহরের অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছে মা-বাবার মুখে, তখন থেকেই তার ইচ্ছে, সুযোগ হলেই সে ফিরে আসবে এখানে। খনিটা কিনেছে, তার কারণ, এককালে তার বাবা কাজ করত ওখানে। ওর কাজকর্ম আমার কাছে তো কই, অস্বাভাবিক ঠেকে না।'

'তাহলে খনির মুখ আবার খুলল কেন?' তর্ক শুরু করল জিনা।

'তাতে তোর মাথাব্যথা কিসের?' বললেন চাচা। 'তার খনির মুখ সে খুলল না বন্ধ করল, তাতে কার কি? খোঁজ খবর নিয়েছি আমি অনেক, লোকটার কোন বদনাম শুনিনি।'

ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন। 'কেন দেখতে পারে না জানো? জিনাকে শার্টের কলার চেপে ধরে বের করে দিয়েছিল ম্যাকআরথার, তারপর থেকেই যত রাগ। তবে অন্যায় কিছু করেনি সে, তাহলে আমিই তো গিয়ে ধরতাম। কয়েক বছর আগে ওই খনিতে পড়ে এক মহিলা মরেছে। দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে। জিনাকে সে-জন্যেই বের করে দিয়েছে সে।'

হেসে ফেলল মুসা, 'কি শুনছি, জিনা? তোমাকে নাকি ঘাড় ধরে…'

'চুপ!' রাগে কেঁপে উঠল জিনার গলা।

জিনাকে কলার ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক, দৃশ্যটা কল্পনা করে কিশোরও হাসি চাপতে পারছে না। বুঝতে পারছে, এ-জন্যেই চাচাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে রকি বিচে নিয়ে গেছে জিনা, তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করে এনেছে। ম্যাকআরথারের ওপর প্রতিশোধ নিতে, এক কুলিয়ে উঠতে পারেনি…

'ব্যাটা আস্ত ভণ্ড!' চেঁচিয়ে বলল আবার জিনা।

'একআধটু পাগলাটে হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কোটিপতিদের কেউ কেউ যেমন হয়।'

'তাতে দোষের কিছু আছে?' বললেন মিস্টার উইলসন, ব্রেক ছেড়ে গাড়ি চালু করে দিলেন আবার। 'জিনা, আমি চাই না ভদ্রলোককে তুমি বিরক্ত করো। তোমাদেরও বলে রাখলাম, কিশোর।'

একটা কাঠের ব্রিজের ওপর উঠল গাড়ি, ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে। নিচে সরু খাল, দুই মাথা গিয়ে পড়েছে দুটো ক্ষুদে হ্রদে, পুকুরই বলা চলে। ছেলেরা অনুমান করল জোড়া হ্রদের জন্যেই নাম হয়েছে টুইন লেকস।

পুলের পরে একটা কাঁচা রাস্তায় নামলো গাড়ি, পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলল। মাইলখানেক দূরে পথের বাঁয়ে সবুজ খেত। আরও পরে একটা খোলা গেট দেখা গেল, তার ওপাশে কয়েকটা বাড়িঘর। একটা বাড়ি নতুন রঙ করা হয়েছে, বাকিগুলো পুরানো, দেখে মনে হয় না মানুষ থাকে।

গতি কমালেন মিস্টার উইলসন, হর্ন বাজালেন একজন লম্বা, হালকা-পাতলা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে, ছোট একটা বাড়ির সামনে বাগানে পানি দিচ্ছেন তিনি।

'মিসেস ফিলটার,' ছেলেদেরকে বলল জিনা।

হেসে হাত নাড়লেন মহিলা। পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে সাদা শার্ট, গলায় নীলকান্তমনি খচিত রুপার একটা বেশ বড়সড় হার। ধূসর চুলে রুপালি ছোপ লেগেছে, বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু হোস নেড়ে যেভাবে পানি দিচ্ছেন, ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হয় না এত বয়েস।

'এই শহরের সুদিন কালে এখানে জন্মেছিলেন মহিলা,' জিনা বলল। 'খনির সুপারিনটেনডেন্টকে বিয়ে করেছিলেন। খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চলে গিয়েছিলেন দুজনেই। স্বামীর মৃত্যুর পর ফিনিক্সে এক দোকানে কাজ নিলেন মহিলা, টাকাটুকা জমিয়ে, চাকরি ছেড়ে এখানে ফিরে এসেছেন বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে। যে বাড়িতে বৌ হয়ে ঢুকেছিলেন, বিক্রি করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটাই কিনে নিয়েছেন আবার। আরও কিছু জায়গা কিনেছেন মহিলা, বোধহয় পুরানো দিনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যেই ভুলেও কখনও ব্যবহার করেন না ওগুলো।'

'ম্যাকআরথারের সঙ্গে মহিলার যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে,' বলল রবিন।

'না না,' জোর গলায় বলল জিনা, 'মহিলা খুব ভাল।'

'আসলে, এখানে যারা ফিরে আসে তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল থাকেই,' বললেন উইলসন, 'টুইন লেকসকে একবার ভালবেসে ফেললে দুনিয়ার আর কোথাও গিয়ে শান্তি নেই, ফিরে আসার জন্যে খালি আনচান করে মন। শেষ বয়েস কাটানোর এত চমৎকার জায়গা কমই আছে।' গেটের সামনে এনে গাড়ি থামালেন। হাত তুলে দেখালেন, পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে পর্বতের উপত্যকায়। ওটা পশ্চিম। তার বাঁয়ে পোয়াটাক মাইল দূরে কালো রঙ করা কাঠের বেড়া। 'ওটাই খনিমুখ। আর ওই যে কেবিনটা, ওটাতে থাকে ম্যাকআরথার। পেছনে যে বিল্ডিংটা, ওটাও তার। আগে ওখানে খনির নানারকম কাজকর্ম হত।'

গেটের ভেতরে গাড়ি ঢোকালেন তিনি। মাটির রাস্তা, তাতে চাকার গভীর খাঁজ। চলার সময় আপনাআপনি চাকা ঢুকে যায় খাঁজের মধ্যে, সরানো কঠিন। পথের দুধারে সারি সারি নবীন ক্রিস্টমাস গাছ। বেড়া দেয়া একটা পশু রাখার খোঁয়াড়ের পাশ কাটিয়ে এল গাড়ি, ভেতরে গোটা চারেক ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, ওগুলোর মাঝে জিনার কমেটকে চিনতে পারল তিন গোয়েন্দা। আরও পরে, বাঁয়ে সুন্দর একটা র‍্যাঞ্চ হাউস, ছোট ছোট গাছ ঘিরে রেখেছে। সীডার-লাল রঙের ওপর সাদা অলঙ্করণ, চার পাশের সবুজের মাঝে ছবির মত লাগছে বাড়িটাকে। পথের শেষ মাথায় ভাঙাচোরা পুরানো একটা গোলাবাড়ি, কতকাল আগে রঙ করা হয়েছিল এখন আর বোঝা যায় না।

র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে এনে গাড়ি রাখলেন উইলসন, হাই তুললেন, আড়মোড়া ভাঙছেন। 'আউফ। বাড়ি এলাম।'

গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা, আশপাশ দেখছে। গোলাবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিকআপ ট্রাক, ধুলোয় মাখামাখি। বাড়ির একপাশে তারের বেড়া দেয়া খানিকটা জায়গা, একাংশ চোখে পড়ছে, ভেতরে কয়েকটা মুরগী।

গাড়ি থেকে নামলেন উইলসন। 'তাজা ডিম পছন্দ আমার,' মুরগীর খোঁয়াড়

দেখিয়ে বললেন। 'সকালে মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার মাঝে এক ধরনের আনন্দ আছে, খুব শান্তি। আমার মোরগটার ধারণা, রাত্রি তাড়ানোর দায়িত্বটা বুঝি তারই ওপর বর্তেছে, ভোর না হতেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। আমার খুব ভাল লাগে।'

মনিবের কথার জবাবেই যেন বাড়ির পেছন থেকে শোনা গেল তার কণ্ঠ, ডাক নয়, উত্তেজিত চিৎকার।

এক সেকেণ্ড পরেই যেন একসঙ্গে খেপে গেল সব কটা মোরগ-মুরগী, বাচ্চা-কাচ্চা সহ। পরক্ষণে শটগানের বিকট শব্দ।

চেঁচিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা, দু-হাতে মাথা ঢাকল। গাড়ির আড়ালে মাথা নুইয়ে ফেলল কিশোর আর রবিন। মুরগীর খামারের ওদিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে একটা বিরাট ছায়া।

পলকের জন্যে কিশোরের চোখে পড়ল একসারি ঝকঝকে ধারাল দাঁত আর কালো দুটো চোখ। পরক্ষণেই ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে গায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল জানোয়ারটা, হারিয়ে গেল পশ্চিমে ক্রিস্টমাস খেতের ভেতরে।

তিন

'শান্তির রাজ্যে স্বাগতম।' বেদম হাসিতে দুলছে জিনা।

বিকেলের শান্ত নীরবতা ধীরে ধীরে নেমে এল আবার র‍্যাঞ্চ হাউসে।

উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করল মুসা। 'খাইছিল! কি ওটা?'

'কিছু না,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল জিনা, 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক জনাব হ্যারি ম্যাকআরথারের শিকারী কুকুর, মুরগী চুরির তালে ছিল।'

কিশোর উঠে দাঁড়াচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বেড়ার নিচ দিয়ে সিঁধ কেটে ঢোকার চেষ্টা করে। কয়েকবারই করেছে এ-রকম। মুরগীগুলো চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, শটগান নিয়ে ছুটে বেরোয় ভিকিখালা। আজও ফাঁকা গুলিই ছুঁড়েছে, কিন্তু এই অত্যাচার চলতে থাকলে কপালে দুঃখ আছে কুত্তাটার। ছররা দিয়ে পাছার চামড়া ঝাঁঝরা করে দেবে।'

'ভিকিখালা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমাদের কাজের লোক,' জানালেন উইলসন।

গোলাবাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল মোটাসোটা এবং মেকসিকান মহিলা, কালো চুল। সুতার পোশাক পরনে, গলা আর হাতার কাছটায় এমব্রয়ডারি করা উজ্জ্বল রঙের বড় বড় ফুল। হাতে একটা শটগান।

'এই যে, সিনর উইলসন,' চেঁচিয়ে বলল ভিকি। 'জিনাও এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। তোমরা না থাকলে কেমন খালি খালি লাগে।'

উইলসন হাসলেন। 'সে-জন্যেই পূর্ণ করে রেখেছ নাকি?'

'ওই কুত্তাটার কথা আর বলবেন না,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল ভিকি। 'আস্ত চোর!'

'স্বভাব বদলে যাবে, ভেব না,' হাসি মুখে বললেন উইলসন। 'আকাশে গোলাগুলি চালিয়ে যাও, চুরি না ছেড়ে যাবে কোথায় ব্যাটা। হ্যাঁ, ভিকি, এরা জিনার বন্ধু। কিশোর পাশা…রবিন মিলফোর্ড…মুসা আমান। হপ্তা দুই বেড়াবে আমাদের এখানে।'

'ওমা, তাই নাকি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভিকির কালো চোখ। 'খুব ভাল, খুব ভাল। বাড়িতে এক দল বাচ্চা-কাচ্চা না থাকলে ভাল লাগে? এসো, আমি খাবার ব্যবস্থা করছি। এতদূর এসেছ, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতরে ঢুকে গেল ভিকি।

'সত্যিই খিদে পেয়েছে তো তোমাদের?' বললেন উইলসন। 'ভিকির সামনে কম খেলে চলবে না, রেগে যাবে।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' অভয় দিল মুসা। আন্তরিক হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'কখনও যাতে না রাগে সেই ব্যবস্থাই করব।'

গাড়ি থেকে স্যুটকেসগুলো নামিয়ে বারান্দায় রাখতে শুরু করলেন উইলসন। তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্য করতে এগোল তিন গোয়েন্দা। কয়েক মিনিট পর খোলামেলা বিশাল লিভিং রুমের ওপরে দোতলার বড় একটা বাংকরুমে জিনিস-পত্র নিয়ে এল ওরা। জিনার ঘর নিচে, চাচার ঘরের পাশে। ভিকির ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টই আছে, রান্নাঘরের পেছনে।

'গোসল করবে তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন। 'বেশি দেরি কোরো না। ডিনারের আগেই আশপাশটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই তোমাদের।'

আলমারিতে কাপড় গোছাচ্ছিল মুসা, উইলসনের কথা শুনে গোছানোর আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেল। টান দিয়ে বড় একটা তোয়ালে নিয়ে বলল, 'পরেও গোছানো যাবে। আগে আপনার সঙ্গেই যাই।' বাথরুমের দিকে রওনা হলো সে।

খানিক বাদে জিনা আর তার চাচার সঙ্গে বেরোল তিন গোয়েন্দা। ওপরে নিউ মেকসিকোর পরিষ্কার নীল খোলা আকাশ। জিনার হাতে ইয়া বড় বড় দুই টুকরো চিনি, গাড়িপথ ধরে প্রায় দৌড়ে চলল ঘোড়ার খোঁয়াড়ের দিকে। ডাকছে, 'কমেট। কমেট?'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল ঘোড়াটা, দৌড়ে এল বেড়ার কাছে। গলা বাড়িয়ে দিল বেড়ার বাইরে। আনন্দে নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে। গলা জড়িয়ে ধরে আদর করল জিনা।

'দেখো না কাণ্ড,' হাসলেন উইলসন, 'দু-দিন মাত্র হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কত যুগ একে দেখেনি। ওরা থাকুক। তোমরা এসো, গাছ ছাঁটার ছুরি দেখবে।'

পিকআপের পাশ কাটিয়ে গোলাবাড়ির কাছে চলে এল ওরা। দরজা খুললেন উইলসন। শুকনো খড়ের গন্ধ লাগল নাকে। উঁকি দিয়ে দেখল ছেলেরা, ঘরের কোণে গাদা করে রাখা আছে খড়ের বোঝা। দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছে হোস পাইপের কয়েল। খন্তা, কোদাল, বেলচা, বড় কাঁচি আর নানা রকম দরকারী যন্ত্রপাতি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটা ওয়ার্কবেঞ্চের পাশে। কাছেই একটা র‍্যাঞ্চে রাখা আছে পাঁচটা বড় বড় ভোজালীর মত ছুরি।

'বাড়িতে বাগানের গাছ তো কাঁচি দিয়েই ছাঁটি,' মুসা বলল।

'সে অল্প কয়েকটা গাছের বেলায় সম্ভব,' বুঝিয়ে বললেন উইলসন। 'কিন্তু হাজার হাজার ক্রিস্টমাস গাছ কাঁচি দিয়ে ছাঁটতে অনেক সময় লাগবে, ছুরি দিয়ে কোপানো ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া ছুরি দিয়ে এক কোপে ওপর-নিচের অনেকগুলো ডাল তুমি ছেঁটে ফেলতে পারছ, তাতে সমান হয় বেশি, কাঁচি দিয়ে সেটা হয় না।' র‍্যাঙ্ক থেকে একটা ছুরি নিয়ে এলেন তিনি। 'আপনা-আপনি সুন্দর হয় না ক্রিস্টমাস ট্রী, নিয়মিত যত্ন লাগে। বছর তিনেক আগে জায়গাটা যখন কিনলাম, তখন ভাবতাম, এ আর কি? কয়েকটা চারা মাটিতে পুঁতে দিলেই হলো, নিজে নিজেই বড় হয়ে সাইজমত হয়ে যাবে। এখন বুঝি কত কঠিন। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়, ডাল পাতা ছাঁটতে হয়, আর রোজ পানি দেয়া তো আছেই। ছুরি চালানো কিন্তু সহজ ভেব না,' কিভাবে চালাতে হয় দেখালেন তিনি। 'এই যে, এভাবে ধরে, ওপর থেকে নিচে এভাবে কোপ মারতে হয়,' সাঁই করে বাতাস কাটল তীক্ষ্ণ ধার ফলা। 'খুব সাবধানে কোপাতে হয়। বেশি নিচে যদি নামিয়ে ফেলো, পায়ে এসে লাগবে। ফেড়ে যাবে। পারবে তো?'

'পারব,' বলল মুসা।

সাবধানে আবার জায়গামত ছুরিটা রেখে দিলেন উইলসন।

গোলাবাড়ির একধারে ফেলে রাখা অনেক পুরানো একটা গাড়ি দেখালেন, নিরেট রবারে তৈরি চাকা, ফাঁপা টায়ার নয়। 'নতুন আরেকটা গোলাঘর বানাব। ওই গাড়িটারও একটা ব্যবস্থা করব তখন।'

কাছে গিয়ে গাড়ির আধখোলা একটা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। কুঁচকে গেছে সীটের কালো চামড়ার কভার, নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আছে কাঠের মেঝে। 'টি মডেলের ফোর্ড, না?' ফিরে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' বললেন উইলসন। 'বাড়িটা যখন কিনি তার আগে থেকেই ছিল, ফাউ পেয়েছি। ওখানেই ছিল ওটা, খড়ের তলায় চাপা পড়ে ছিল। খড় সরিয়েছি, কিন্তু গাড়িটার কিছু করতে পারিনি। সময়ই পাই না। তবে ঠিকঠাক করব, মডেল টি এখন প্রাগৈতিহাসিক জিনিস, সংরক্ষণের বস্তু।'

দরজায় দেখা দিল জিনা, ঘোষণা করল, 'মহামান্য হ্যারি ম্যাকআরথার তশরিফ রাখছেন।'

'আহ্, জিনা, একটু ভদ্রভাবে কথা বল্,' বিরক্ত হলেন উইলসন। 'দেখিস, তার সামনে আবার কিছু বলে বসিস না।'

চুপ করে রইল জিনা।

বাইরে পায়ের আওয়াজ হলো। ডাক শোনা গেল, 'মিস্টার উইলসন?'

'এই যে, এখানে,' সাড়া দিলেন তিনি।

হালকা-পাতলা একজন লোক উঁকি দিল দরজায়। মাথায় সোনালি চুল, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পরনের জিনস এতই নতুন, কাপড়ের খসখসে ভাবও কাটেনি। চকচকে পালিশ করা বুটে মুখ দেখা যাবে যেন। গায়ের ওয়েস্টার্ন শার্টটা যেন এইমাত্র প্যাকেট ছিঁড়ে খুলে পরে এসেছে।

এগিয়ে গেলেন উইলসন। হাত মেলালেন দুজনে।

কুকুরের অসদাচরণের জন্যে ক্ষমা চাইল ম্যাকআরথার।

লোকটার পরিচ্ছদ আর কথাবার্তায় একটা ব্যাপারে শিওর হলো কিশোর, মেকি একটা ভাব রয়েছে তার মধ্যে। একেবারে বানিয়ে বলেনি জিনা। কিন্তু আরেকটা প্রশ্নও জাগছে কিশোরের মনে, টুইন লেকসের মত জায়গায়, এই সুন্দর বিকেলে এছাড়া আর কি পোশাক পরতে পারত ম্যাকআরথার? এমনও তো হতে পারে, এখানে আসার আগে ওরকম কাপড় আর কোনদিন পরেনি সে, আসার সময় নতুন কিনে নিয়ে এসেছে। ওগুলো পুরানো হতে তো সময় লাগবে।

'শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি শয়তানটাকে,' বলল ম্যাকআরথার। 'আর জ্বালাবে না আপনাকে।'

'আরে না না, এটা কিছু না.' তাড়াতাড়ি বললেন উইলসন। 'পোষা জন্তু-জানোয়ার থাকলে ওরকম একআধটু অত্যাচার করেই। সেটা নিয়ে মাইণ্ড করে বসে থাকলে চলে নাকি।'

ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন উইলসন।

ম্যাকআরথারের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল জিনা।

ব্যাপারটা লক্ষ করল ম্যাকআরথার, হাসি হাসি পরিষ্কার নীল চোখের তারা কঠিন হয়ে গেল চকিতের জন্যে। তারপর জিনার শরীর ভেদ করে যেন তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মডেল টি-এর দিকে। 'আরে, দারুণ একটা গাড়ি! দুর্লভ জিনিস।'

'একটু আগে এটার কথাই বলছিলাম ছেলেদেরকে। সময় বের করে শিগগিরই ঠিকঠাক করে নেব।'

এগিয়ে গিয়ে গাড়িটার গায়ে হাত রাখল ম্যাকআরথার।

'হ্যারি ম্যাকআরথার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নামটা আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' ফিরে তাকাল লোকটা।

'সিনেমায় কাজ করে আমার বাবা। কিছু দিন আগে খাওয়ার টেবিলে বসে আপনার কথা বলছিল। একটা ছবি বানাচ্ছে এখন, তাতে নাকি একটা পুরানো রিও গাড়ি দরকার। কোথাও পায় না পায় না, শেষে নাকি আপনার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। পুরানো গাড়ি কালেকশনের বাতিক আছে আপনার।'

'তাই নাকি? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই,' অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যেন ম্যাকআরথার।

'আপনার সংগ্রহের কথা বলছিল বাবা। বিরাট এক প্রাইভেট গ্যারেজ নাকি আছে আপনার, একজন ফুলটাইম মেকানিক রেখে দিয়েছেন বেতন করে। ওর কাজ শুধু গাড়িগুলোকে সব সময় সচল রাখা। সাধারণ কাজ, কিন্তু গাড়ি এত বেশি তাতেই নাকি হিমশিম খেয়ে যায় বেচারা।'

'হ্যাঁ। সাধারণ বলছ কেন? কাজটা কঠিনই। পুরানো এঞ্জিন, আধুনিক মেশিনের মত ভাল না, সচল রাখা যথেষ্ট কঠিন।'

'রানিং বাগ ছবিতে আপনার সিলভার ক্লাউডটাই তো ব্যবহার হয়েছিল?'

'সিলভার ক্লাউড? ও. হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ. একটা স্টুডিওকে ধার দিয়েছিলাম···বেশি

দিন আগের কথা নয়।'

'সিলভার ক্লাউড?' বলে উঠলেন উইলসন। 'আমার মডেল টি-ওতো ওটার কাছে নাতি।'

'শুরুতে অত পুরানো গাড়ি আমারও ছিল না,' বিনীত কণ্ঠে বলল ম্যাকআরথার। 'তবে একবার নেশায় পেয়ে বসলে কোত্থেকে কোত্থেকে জানি জোগাড় হয়ে যায়। কেনা শুরু করলেই টের পাবেন, এই গোলাঘরে কুলাবে না তখন আর। হয় নতুন বানাতে হবে, কিংবা বাড়াতে হবে।'

'নতুন আরেকটা গোলাঘর বানানোর কথা এমনিতেও ভাবছি,' বললেন উইলসন।

কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন দুজনে। হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছেন উইলসন, কোন জায়গায় কতবড় করে বানাবেন ঘরটা, পুরানোটার কি করবেন।

'কি মনে হলো?' দুজনে দূরে চলে গেলে বলল জিনা। 'এরকম ভণ্ড আর দেখেছ?'

'কাপড়-চোপড় নতুন,' বলল মুসা, 'তাতে কি? নামটা চেনা চেনা লাগছিল, মডেল টি-র প্রতি আগ্রহ দেখে মনে পড়ে গেল। বাবা বলেছে, লোকটার অনেক টাকা, এমনিতেও পাগল, গাড়িরও পাগল। ম্যানডেভিল ক্যানিয়নে নাকি মস্ত বাড়ি আছে তার, দশ ফুট উঁচু দেয়ালে ঘেরা।'

মৃদু কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'কিন্তু রানিং বাগ এর জন্যে তার সিলভার ক্লাউড ধার দেয়নি,' বলল সে। 'ফিল্ম ফান পত্রিকায় গাড়িটার ওপর একটা আরটিকেল বেরিয়েছিল। ম্যাকআরথারের গাড়ি নয়, ওটা ছিল জোনাথন হ্যামিলটনের। ছবির খরচও তিনিই দিয়েছেন। আর ছবিটা আজকের নয়, বহু আগের।'

কেউ তর্ক করল না। ওরা জানে, না জেনে কোন কথা বলে না কিশোর, ও যখন বলছে, ঠিকই বলছে।

লাফিয়ে উঠল জিনা। 'কি বলেছিলাম? ব্যাটা একটা ভণ্ড। মিথ্যুক।'

হাসল কিশোর। 'তা বলা যায় না, জিনা। হ্যারি ম্যাকআরথারের অনেকগুলো গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটা গাড়ি কখন কাকে ধার দিল না দিল, মনে না থাকলে দোষ দেয়া যায় না। তাছাড়া তার কাছেই গাড়ি চেয়েছে স্টুডিও এমন না-ও হতে পারে। হয়তো তার কোন কর্মচারীই গাড়ির ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে, হয়তো তার মেকানিকের ওপরই রয়েছে এ-দায়িত্ব।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' গোঁয়ারের মত হাত নাড়ল জিনা।

অকস্মাৎ পরিবেশটাই কেমন জানি বদলে গেল। অস্বস্তিকর নীরবতা। সহজ করে দিল ডিকি, ডিনারের জন্যে ডাক দিয়ে।

চার

'আরে আরও কয়েকটা কেক নাও না,' রান্নাঘরে লম্বা টেবিলের কিনার থেকে বলে

উঠল ডিকি। 'খুব ভাল জিনিস, জ্যাম মেশানো।'
মাথা নাড়ল কিশোর, 'না আর পারব না। অনেক খেয়েছি।'
ভুরু কোঁচকাল ডিকি। 'অনেক খেয়েছ মানে? দিয়েছিই তো এই কটা। এ-জন্যেই এমন প্যাঁকাটির মত শুকনো, হাড় জিরজিরে। ওই জিনাটাও হয়েছে এমন। আজকালকার ছেলেপুলে, খালি ওজন নিয়ে ভাবে। আরে বাপু, ছেলেমানুষ তোমরা, অমন চড়ুইর খাবার খেয়ে বাড়বে কি করে?'
'আমাদের দিকে নজর দিও না, খালা,' অনুরোধ করল জিনা। 'ওই ওকে খাওয়াও, শান্তি পাবে,' মুসাকে দেখিয়ে দিল সে।
'খাওয়াবই তো। খায় বলেই তো এমন চমৎকার স্বাস্থ্য। তোমাদের মত শোলা নাকি, ফুঁ দিলেই পড়ে যাবে। এই মুসা,' কেকের ট্রে-টা ঠেলে দিল ডিকি, 'চট করে শেষ করে ফেলো তো এগুলো। আরও এনে দিচ্ছি।'
'ও-কি, উঠে যাচ্ছিস কেন, জিনা?' বললেন উইলসন। 'তুই বাপু একেবারেই বেয়াড়া হয়ে গেছিস, তোর মাকে জানাতে হবে। বলি, আমরা সবাই রয়েছি টেবিলে, তুই উঠে যাচ্ছিস, ভদ্রতার খাতিরেও না হয় বসে থাক।'
'না খেলে বসে থেকে কি করবে?' জিনার পক্ষ নিল ডিকি। 'ছেলেপিলের ওসব ভদ্রতার দরকার নেই। যাও, মুখ ধুয়ে ফেলো।'
প্লেটটা নিয়ে সিংকে চুবাল জিনা।
'হয়েছে হয়েছে,' পেছন থেকে বলল ডিকি, 'ওটা তোমার ধুতে হবে না। আমিই সব ধোব। তুমি মুখ ধুয়ে ফেলো।'
রবিনও উঠল, হাতে এঁটো প্লেট।
'তুমি এটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' ডাক দিল ডিকি।
'ধুয়ে ফেলি। কি হবে? বাড়িতে কি ধুই না?'
'যাও তো। খাওয়া শেষ, হাত ধুয়ে ভাগো। রান্নাঘরে ভিড় পছন্দ নয় আমার।'
কাউকেই কোন সাহায্য করতে দিল না ডিকি, প্রায় জোর করে তাড়াল রান্নাঘর থেকে।
লিভিং রুমে এসে বসল সবাই। টেলিভিশনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সোফায় বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন উইলসন। ছেলেরাও হাই তুলতে শুরু করল।
'সব বাচ্চা খোকা,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জিনা। 'বিকেল না হতেই ঘুম। নটাও তো বাজেনি।'
'ভোর পাঁচটায় উঠেছি, সে খেয়াল আছে?' প্রতিবাদ করল রবিন।
'আমিও তো উঠেছি। এসো, দাবা খেলি...'
'আমি বাদ,' তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। 'মাথার ভেতরে একটা ঘড়ি বসানো আছে আমার। ওটা জানাচ্ছে ঃ রাত সাড়ে দশটা, শুতে যাও। আমি চললাম।'
'আমিও,' কিশোরের পিছু নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো মুসা।
বড় করে আরেকবার হাই তুলে রবিনও আগের দু-জনকে অনুসরণ করল।

'ধ্যাত্তোর!' রাগে সোফার হাতলে থাবা মারল জিনা। 'আলসের ধাড়ী সব।'

'এত কম খেয়েও এত এনার্জি পায় কোথায় জিনা?' নিজেদের ঘর বাংকরুমে কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে বলল মুসা।

মাথার নিচে হাত দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। আনমনে বলল, 'আমি শিওর না।'

টেলিভিশনের শব্দ থেমে গেল। শোনা গেল উইলসনের ঘুমজড়িত কণ্ঠ। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার পর শাওয়ারে পানি ছাড়ার শব্দ হলো। বন্ধ হলো আরেকটা দরজা।

'জিনাও ঘরে গেছে,' বলল কিশোর।

কাত হয়ে বালিশে মাথা রেখে বেডসাইড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সে। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর, কিন্তু পুরোপুরি নয়। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না আসছে। ঠাণ্ডা জালি কাটা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কাঠের মেঝেতে।

চোখ মুদল কিশোর। ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। ভোঁতা একটা শব্দ শুনেছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনির রেশ।

বিছানায় উঠে বসল সে। কান পেতে অপেক্ষায় রইল আবার শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে।

নিজের বাংকে গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ভিকি। আবার গুলি করেছে কুকুরটাকে।'

'না,' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'গুলির শব্দই, কিন্তু ভিকি না। অনেক দূর থেকে এসেছে।'

বিস্তৃত ক্রিস্টমাস ক্ষেতের দিকে তাকাল সে, চাঁদের আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে গাছগুলোকে। ডানে মিসেস ফিলটারের বাড়ি আর পরিত্যক্ত বিশেষ স্থানগুলো। নাক বরাবর সোজা, ধীরে ধীরে উঠে যাওয়া উপত্যকায় ম্যাকআরথারের সম্পত্তি। ছোট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে খনিমুখের কাছে। কেবিনের কাছে একটা ছায়ার নড়াচড়া। শেকলে বাঁধা কুকুরটা মাথা তুলে হউউউ করে উঠল।

উইলসনের এলাকায় ঢোকার গেটের ওধারে ছোট বাড়িটার এক ঘরে আলো জ্বলল, আলো এসে পড়ল গেটের কাছে। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মিসেস ফিলটার, পরনে ড্রেসিং গাউন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকাল, বোধহয় ম্যাকআরথারের কেবিনের দিকেই।

নিচে লিভিং রুমে কথাবার্তা শোনা গেল। উইলসন উঠে পড়েছেন, ভিকিও।

'আমি না,' ভিকির কণ্ঠ, 'আমি গুলি করিনি।'

সিঁড়িতে খালি-পায়ের শব্দ হলো। দরজায় করাঘাত। 'শুনছ, মশাইরা?' জিনা। 'শুনেছ কিছু?'

ড্রেসিং গাউন পরে দরজা খুলে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

একটা জানালার চৌকাঠে হাতের ভর রেখে বাইরে মাথা বের করে দিয়েছে জিনা। ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাকআরথার। আমি শিওর, ওদিক থেকেই শব্দটা এসেছে। দেখে যাও।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'কি?'

রোজি ফিলটারের বাড়ির দিকে দেখাল জিনা। ঘুরে গিয়ে ঘরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। 'মিসেস ফিলটারও জেগে গেছেন,' জিনা বলল। 'ম্যাকআরথারের কুত্তাটাও। ইস্, রাফিয়ানকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। বাবার জন্যেই পারলাম না। এমনিতে দেখতে পারে না, অথচ এখন বাড়ি পাহারায় রেখে দিব্যি কেমন নিশ্চিন্তে বিদেশ চলে গেছে। ওই কুত্তাটা কি রকম ঘাউ ঘাউ করছে শুনছ? আগে থেকে ওরকম চেঁচালে ওর ডাকেই ঘুম ভেঙে যেত আমাদের। অথচ কানের কাছে থেকেও ম্যাকআরথারের ঘুম ভাঙছে না। তুমি আমি হলে কি করতাম? আলো জ্বেলে বাইরে বেরিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতাম, কেন এমন করছে জানার চেষ্টা করতাম। অথচ ব্যাটা কিছুই করছে না। ও নিজেই তো গুলি করেছে, জানার চেষ্টা করবে কি?'

'জিনা?' নিচ থেকে ডাকলেন উইলসন। 'তুই ওখানে কি করছিস?'

'দেখছি,' জবাব দিয়ে বেয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল জিনা। 'চাচা, দেখে যাও। ম্যাকআরথারই গুলি করেছে।'

'জিনা,' কয়েক ধাপ উঠে এলেন উইলসন, 'নাহ্, ম্যাকআরথার রোগেই ধরল দেখি তোকে। মাথাটা খারাপ করে দিল। ও কিছু না, বুঝলি। কেউ খরগোশ মারছে। কিংবা কয়োট।'

'কে?' প্রশ্ন করল জিনা। 'পুরো এলাকাটা দেখতে পাচ্ছি আমি। কাউকে দেখছি না। কয়োট হলে আমাদের মুরগীগুলো খেতে আসে না কেন?'

'কি করে আসবে? ওদিকেই আগে হানা দিয়েছিল, গুলি করে মেরে ফেলেছে,' বললেন উইলসন। 'যা, নিচে, শো গিয়ে। ওদেরকে ঘুমোতে দে।'

'ধ্যাত্তোর!' বিরক্তি চাপতে পারল না জিনা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাবে, জানালার কাছ থেকে ডাকল কিশোর।

এগিয়ে গেল জিনা।

কেবিনের বাইরের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ম্যাকআরথার। বগলতলায় চেপে ধরে রেখেছে শটগান। পাহাড়ের দিকে ফিরে কি দেখল সে, তারপর বন্দুক কাঁধে ঠেকিয়ে ফায়ার করল।

আরেকবার রাতের নীরবতা ভাঙল বন্দুকের গর্জন। আবার চেঁচিয়ে উঠল কুকুরটা। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে ওটার মাথায় চাপড় দিল ম্যাকআরথার।

ঘেউ ঘেউ থামাল কুকুরটা, কেবিনে ঢুকে গেল তার মনিব। 'ঠিকই বলেছ, জিনা,' মুসা বলল পাশ থেকে, 'ম্যাকআরথারই।'

'তোমার চাচা ঠিকই বলেছেন,' বলল রবিন। 'কয়োটই। ওই যে তাড়াল ম্যাকআরথার।'

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল জিনা। নেমে গেল নিজের ঘরে।

'ম্যাকআরথারের পেছনে ভালমত লেগেছে জিনা,' বাংকে উঠে বলল রবিন। 'এখন যা-ই করুক লোকটা, জিনা তার অন্য অর্থ করবে। খালি বলবে কুমতলব আছে।'

'আমি যদি কখনও খনির মালিক হই,' বিছানায় উঠতে উঠতে বলল কিশোর,

'আর জিনা যদি ভেতরে ঢুকে দেখতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেব। ওর শত্রু হয়ে বিপদে পড়তে চাই না।'

রসিকতায় হাসল তিনজনেই।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। কিশোরের চোখে ঘুম এল না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছে আর কান পেতে শুনছে ক্রিস্টমাস পাতার মরমর।

হঠাৎ উঠে বসল সে। জোরে জোরে বলল, 'পয়লা গুলিটার সময় কোথায় ছিল ম্যাকআরথার?'

'উঁম্?' ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল মুসা।

'অ্যাঁ...কী?' রবিন জেগে গেছে।

'বলছি পয়লা গুলিটা কোথা থেকে করেছে ম্যাকআরথার?' আবার বলল কিশোর।

'পয়লা গুলি?' মুসার ঘুম ভেঙে গেছে। 'বাড়ির ভেতর থেকে।'

'বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে দেখেছ তাকে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'দ্বিতীয় গুলিটা করার আগে কোথা থেকে বেরিয়েছে, দেখেছ?'

'না তো। জিনা আর তার চাচার কথা শুনছিলাম তখন।'

'রবিন?'

'দেখেছি।'

'মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়নি নিশ্চয়,' বলল কিশোর। 'মুসা দেখেনি—না হয় ধরলাম সে তাকায়নি। কিন্তু তুমিও দেখোনি, আমিও দেখিনি। তাছাড়া কোথা থেকে গুলি করলে ওরকম ভোঁতা শব্দ শোনা যাবে? খনির ভেতরে থেকে।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'হয়তো কিছুই না,' বলল কিশোর। 'তবে খনির ভেতর কয়োট ঢুকেছিল, এটাও বিশ্বাস করব না আমি। কয়োটের সাড়া পেলেই চেঁচানো শুরু করত কুকুরটা। কিন্তু গুলির শব্দের আগে রা করেনি। এমনও তো হতে পারে, খনির ভেতরে গুলি ছুঁড়েছিল ম্যাকআরথার, তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখল পড়শীরা জেগে উঠেছে। তা যদি হয়, আর সন্দেহমুক্ত হতে চায়, কি করবে তাহলে?'

চুপ করে রইল অন্য দুজন।

বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে গুলি করবে না?' নিজেকেই প্রশ্ন করছে কিশোর। 'বোঝাতে চাইবে না, কয়োট তাড়ানোর জন্যে গুলি করেছে?'

'জিনার মতই সন্দেহ রোগে ভুগতে শুরু করেছ তুমি,' রবিন বলল।

'হয়তো বা,' অস্বীকার করল না কিশোর। 'তবে মিস্টার হ্যারি ম্যাকআরথারের আচার-আচরণও সন্দেহ করার মতই। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে একটা কেস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দার জন্যে।'

পাঁচ

পরদিন সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল কিশোরের। জানালা দিয়ে বাইরের উজ্জ্বল

রোদের দিকে চেয়ে গত রাতের কথা মনে পড়ল, সব কিছু এখন হাস্যকর মনে হলো। কাপড় পরে নেমে পড়ল, এল নিচে রান্নাঘরে। মুসা আর রবিন খাচ্ছে। টেবিলের এক মাথায় বসে আছেন উইলসন। ভিকি গরম কেক নামিয়ে বেড়ে দিচ্ছে টেবিলে।

কিশোরকে দেখে হাত তুলল মুসা, 'এসেছ। ডাকতে যাচ্ছিলাম। জিনা গেছে ঘোড়া দৌড়াতে।' কয়েক কামড় কেক চিবিয়ে নিয়ে বলল কিশোর।

'রুচি বদল হবে,' বলল কিশোর।

'ইয়ার্ডে মালপত্র গোছানো একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল।'

'ও। গাছকাটা মনে হয় ভালই লাগবে তোমাদের,' হাসলেন উইলসন। 'আমার তো লাগে। এর মাঝে শিল্প আছে, অনেকটা নিজ হাতে গড়ার মত মজা। বেয়াড়া রকম বেড়ে ওঠা গাছকে ছেঁটে নিজের মত সাজিয়ে নেয়া। দিনটা ভালই কাটবে তোমাদের। কিন্তু পয়লা দিনেই বেশি খাটাখাটনি কোরো না। ঘণ্টাখানেক পর পর কিছুক্ষণ করে জিরিয়ে নিও।'

নাস্তা সেরে গোলাঘর থেকে তিনটে ছুরি নিয়ে এলেন উইলসন। ছেলেদেরকে নিয়ে খেতে চললেন।

র‍্যাঞ্চ হাউস আর পথের মাঝের একটা খেতে এল ওরা। ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কেটে দেখিয়ে দিলেন উইলসন, কিভাবে কতখানি ছাঁটতে হয়। বললেন, 'গাছের বেশি কাছে যেও না। দূরে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে কোপ দেবে, যাতে পায়ে এসে না লাগে।'

কোপাতে শুরু করল তিন কিশোর। দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন খানিকক্ষণ উইলসন। যখন বুঝলেন, ছেলেরা শিখে গেছে, বাড়িতে ফিরে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ভিকিকে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে করে চলে গেলেন কোথাও।

নীরবে কাজ করে চলল তিন গোয়েন্দা। ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলে তাকাল। ম্যাকআরথারের সীমানার ওদিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে জিনা। খোঁয়াড়ে ঢুকল, অ্যাপালুসাটাকে ওখানে রেখে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

খানিক পরে এঞ্জিনের শব্দ কানে এল ছেলেদের। গোলাবাড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠল মুসা, 'খাইছে! কাণ্ড দেখো।'

পিকআপের ড্রাইভিং সীটে দেখা যাচ্ছে জিনাকে। গিয়ার দেয়ার শব্দ হলো। এলোমেলো ভাবে দুলতে দুলতে পথ ধরে ছুটে এল গাড়িটা।

চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'জিনা, পাগল হয়ে গেছ নাকি! করছ কি?'

ট্রাকের নাক সোজা রাখতে পারছে না জিনা। ছুটে এল ছেলেদের দিকে, শেষ মুহূর্তে ব্রেক প্যাডালে পা রেখে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। জোর কাশি দিয়ে থেমে গেল এঞ্জিন। 'পারছি,' শোনা গেল জিনার আনন্দিত কণ্ঠ, 'চালাতে পারছি। খোলা জায়গায় ঠিকই পারব।'

'চালাতে হলে আরও বড় হওয়া লাগবে তোমার,' রবিন বলল।

'লাইসেন্স পেতে বড় হওয়া লাগবে,' জিনা জবাব দিল। 'কিন্তু সীটে বসে প্যাডাল যখন ছুঁতে পারছি, চালাতেও পারব।'

আবার এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। 'হুঁ, প্র্যাকটিস দরকার।'

'তোমার চাচা জানেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নিশ্চই। চাচা বলে বড়রা যা করে, ছোটদেরও তা করতে পারা উচিত। আমার কোন কাজে চাচা বাধা দেয় না।'

'সে-জন্যেই বুঝি চাচা আর ভিকি বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলে? ওরা থাকতে সাহস পাওনি?'

জানালা দিয়ে মুখ বের করল জিনা, চোখ উজ্জ্বল। মুসার কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'দুজনে বাজারে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। ম্যাকআরথারও বাড়ি নেই, কুত্তাটাকে বেঁধে রেখে গেছে। চলো, এই সুযোগ।'

'খনিতে তো? একাই যাও, আমরা এর মাঝে নেই।'

ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ভাবছে কিশোর। গতরাতে গুলির শব্দ কোথা থেকে এসেছিল, সে কথা।

'ভীতুর ডিম,' মুসার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল জিনা। 'থাকো তোমরা, আমি চললাম।' আবার চেষ্টা করল সে, এবার স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

'রাখো রাখো,' হাত তুলল কিশোর, 'আমি যাব।'

'গুড,' হাসল জিনা। 'ছুরিটা নিয়ে এসো। ম্যাকআরথার দেখে ফেললে তাড়াতাড়ি খেতে নেমে গাছ কাটার ভান করবে। কি, তোমরা দুজন যাবে না?'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, কি ভাবল কে জানে, কিন্তু আর আপত্তি না করে এসে উঠল গাড়িতে। রবিনও উঠল।

কাঁচা হাতে গিয়ার দিল জিনা। প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাল এঞ্জিন, ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল ম্যাকআরথারের সীমানার দিকে।

'দারুণ একখান গাড়ি,' উল্লাসে ফেটে পড়ছে জিনা। গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বাঁকা হচ্ছে, সোজা হচ্ছে, এদিকে কাত হচ্ছে, ওদিকে কাত হচ্ছে। এরই মাঝে এক ফাঁকে মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'খুব সহজ, বুঝলে? কোন ব্যাপারই না, শুধু গিয়ারগুলো ঠিকমত ফেলতে পারলেই হলো...'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মুসা। 'গাড়ি উল্টে ঘাড় না মটকালেই বাঁচি এখন। আস্ত এক কৌটা বাতের মলম লাগবে আজ আমার।'

'বেশি ভয় পাও তুমি...আঁউউ!' ক্যাঙারুর মত আচমকা এক লাফ দিল গাড়ি, আলের মত একটা জায়গায় হোঁচট খেয়ে। আপনা আপনি জিনার হাত থেকে স্টিয়ারিং ছুটে গেল, পা সরে এল ক্লাচ থেকে। জোরে আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। 'যাক, জায়গামতই এনে রেখেছি,' মুসার দিকে তাকাচ্ছে না সে। 'এখান থেকেই ম্যাকআরথারের সীমানা শুরু।'

সামনে রুক্ষ, অসমতল খোলা জায়গা, হঠাৎ করে গিয়ে শেষ হয়েছে যেন পর্বতের গোড়ায়। এক ধারে কালো বেড়া, খনির কালো মুখ দেখা যাচ্ছে। বেড়ার ওপর দিয়ে খনির ভেতরটা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে, তবু কয়েক ফুট পর্যন্ত নজর

চলে। সুড়ঙ্গের মেঝেতে সাদা মিহি বালি, এখান থেকেও বোঝা যায়। খনির ডানে ম্যাকআরথারের নোংরা কেবিন।

'আস্ত মেথর,' নাক কোঁচকাল জিনা।

'পরিষ্কার করার সময় পায়নি হয়তো,' বলল রবিন। 'কদ্দিন হলো এসেছে?'

'প্রায় এক মাস। এসেছে তো একটা ফকিরের মত, বিছানা, হাঁড়ি-কড়াই আর কয়েকটা বাসন-পেয়ালা, ব্যস। নতুন আর কিছু কিনেছে বলে মনে হয় না। একেবারে চামার।...ওই যে বিল্ডিংটা ওতে খনির কাজকর্ম হত। খনি থেকে আকরিক তুলে নিয়ে জমা করা হত ওখানে, তারপর রুপা আলাদা করা হত।'

শেকলের শব্দ শোনা গেল, কেবিনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা। ছুটন্ত অবস্থায় যতখানি বিশাল মনে হয়েছিল সেদিন কিশোরের তত বড় নয়, তবে বড়। শিকারী-লাব্রাডর আর জার্মান ভেড়া-তাড়ানো কুকুরের শঙ্কর। আগন্তুকদের দেখে চাপা গর্জন করে উঠল।

'চেনটা শক্ত কিছুতে বাঁধা তো?' বিড়বিড় করল মুসা।

'হ্যাঁ,' মুসার ভয় দেখে হেসে ফেলল জিনা। 'তখন চেতিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে গেছি। টানাটানি অনেক করেছে, ছুটতে পারেনি।'

'কখন করলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এই তো খানিক আগে, কমেটকে নিয়ে এলাম না।'

'এত সাহস যে দেখালে, যদি ছুটে যেত?'

'গেলে যেত। কমেটের সঙ্গে দৌড়ে পারত নাকি? লাথি খেলেও বাপের নাম ভুলে যেত। ভিকি খালা তো গুলি ছুঁড়ে ভুল করে, কমেটকে ডেকে এনে একটা লাথি খাওয়ানো দরকার ছিল। জিন্দেগীতে আর মুরগীর দিকে চোখ তুলে তাকাত না।'

'তুমি না কুকুর ভালবাস, জিনা?' মুসা বলল, 'এটাকে দেখতে পারো না কেন? রাফিয়ানকে তো...'

'চুপ। কার সঙ্গে তুলনা। কোথায় ভদ্রলোকের বাচ্চা, আর কোথায় চোরা ম্যাকআরথারের মুরগীচোর।'

'কুকুর ভদ্রলোকের বাচ্চা হয় কি করে?' ফস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভদ্রলোকের না হোক ভদ্রকুকুরের তো?'

'তা বলতে পারো...'

'আরে কি বকবক শুরু করলে তোমরা?' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, গভীর মনযোগে খনি আর তার আশপাশের অঞ্চল দেখছিল। 'জিনা, নামো, পথ দেখাও।'

খনিমুখের ভেতরে ঢুকে টর্চ জ্বালল জিনা। ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে পোঁতা হয়েছে রেললাইনের স্লীপারের মত বড় বড় মজবুত তক্তা, তার ওপর বীম লাগিয়ে পাথুরে ছাত সহজে যাতে ধসে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুড়ঙ্গের ভেতরে স্তব্ধ নীরবতা। সব কিছু শান্ত, তবু পরিবেশটা এমন, অকারণেই গা ছমছম করে।

খুব ধীরে ধীরে অমসৃণ ঢাল রেয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

পর্বতের ভেতরে পঞ্চাশ গজমত ঢুকে দু-ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ, একটা সোজা এগিয়েছে, আরেকটা বাঁয়ে সামান্য মোড় নিয়েছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বাঁয়ের পথটাই ধরল জিনা। তাকে অনুসরণ করল ছেলেরা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যে আবছা আলো আসছিল এতক্ষণ, মোড় নেয়ায় সেটাও হারিয়ে গেল। পাথুরে মেঝেতে নিজেদের জুতোর শব্দই কেমন যেন ভুতুড়ে শোনাচ্ছে।

'মহিলা পড়েছিল যেন কোথায়?' নিচু গলায় বলল জিনা। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

'জিনা, দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর। সামনে মেঝেতে কিছু একটা চোখে পড়েছে। 'এই যে, এদিকে, আলো ফেরাও?'

আলো ফেলল জিনা। আলগা পাথর, নুড়ির ছোট একটা স্তূপ। দেয়াল আর ছাত থেকে খসে পড়ে জমা হয়েছে বোধহয়।

এগিয়ে গিয়ে তুলে নেয়ার জন্যে ঝুঁকল কিশোর, এই সময় আলো সরে গেল।

'আরে আরে, য়াচ্ছ কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'টর্চটা···এই জিনা?'

কিন্তু জিনা থামল না। টর্চের আলো নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে দূরে। পাশের একটা করিডরে ঢুকে গেল সে।

'জিনা!' চেঁচিয়ে ডাকল রবিন।

হঠাৎ পেছনে আলো দেখা গেল, উজ্জ্বল আলো যেন নগ্ন করে দিল তাদেরকে। বুঝল, হঠাৎ কেন ছুটে পালিয়েছে জিনা।

'এই! এই, কি করছ ওখানে?' ম্যাকআরথারের কড়া গলা।

'মরেছি!' ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছে না মুসার।

জিনার হাত থেকে টর্চ খসে পড়ার শব্দ হলো। ঝনঝন করে উঠল পাথরে বাড়ি খেয়ে, কাচ ভাঙল।

অন্ধকার করিডরের শেষ মাথা থেকে ভেসে এল জিনার রক্তহিম-করা চিৎকার। চেঁচিয়েই চলল সে, একনাগাড়ে।

ছয়

'জিনা? কি হয়েছে, জিনা?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাবে শুধুই চিৎকার। মাথা খারাপ হয়ে গেছে যেন জিনার।

'মরছে নাকি!' আলো হাতে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল ম্যাকআরথার, করিডরে গিয়ে ঢুকল।

পেছনে গেল ছেলেরা।

মস্ত এক কালো খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে জিনা। আরেক পা এগোলেই যেত পড়ে গর্তের মধ্যে।

'থামো! এই মেয়ে, শুনছ? চুপ!' ধমক দিল ম্যাকআরথার। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে জিনাকে সরিয়ে আনল গর্তের ধার থেকে। 'কি, হয়েছে কি?'

থরথর করে কাঁপছে জিনা, হাত তুলে ইঙ্গিত করল গর্তের দিকে। 'ও-ওখানে···নিচে···'

সাবধানে খাদের পাড়ে এসে দাঁড়াল চারজনে। ভেতরে আলো ফেলল ম্যাকআরথার, উঁকি দিল ছেলেরা। বেশি গভীর নয়, দশ-বারো ফুট। তবে একেবারে খাড়া দেয়াল।

খাদের তলায় কি যেন পড়ে আছে। প্রথমে কাপড়ের স্তূপ বলে মনে হলো। কিন্তু ঠিকমত আলো ফেলে ভাল করে তাকাতেই দেখা গেল, একটা হাত বেরিয়ে আছে। কাপড়ের ভেতরে রয়েছে দেহটা, দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত। চোখের জায়গায় দুটো শূন্য কোটর, মাথার চুল পাটের রুক্ষ আঁশের মত লেপটে রয়েছে খুলির সঙ্গে।

'মরা!' চেঁচিয়ে উঠল আবার জিনা। 'মরা!...মরে গেছে!'

'আহ্, থামো তো।' আবার ধমক লাগাল ম্যাকআরথার।

ঢোক গিলল জিনা, চুপ করল।

'বেরোও,' আদেশ দিল ম্যাকআরথার। 'সব্বাই।'

দু-পাশ থেকে জিনার দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে এগোল কিশোর আর রবিন। পেছনে টলমল পায়ে চলল মুসা। সবার পেছনে আলো হাতে রয়েছে ম্যাকআরথার।

খোলা আকাশের নিচে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা।

কুকুরের পরিচিত ডাক অপার্থিব লাগছে কিশোরের কানে। যেন এইমাত্র ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। গুহার তলায় কাপড়ের স্তূপের ভেতরে কোঁচকানো চামড়া আর হাড্ডি সর্বস্ব হাত, শূন্য কোটর, লেপটানো চুল...শিউরে উঠল সে, কড়া রোদের মাঝেও শীত শীত লাগছে।

'যাও, বাড়ি যাও,' বলল ম্যাকআরথার। 'খবরদার, আর কখনও এদিকে আসবে না। যদি আর কোনদিন দেখি...'

গটমট করে গিয়ে কেবিনে ঢুকল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ধীর পায়ে এগোল ছেলেরা। খনিমুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এখন একটা উজ্জ্বল লাল শেভি সুবারব্যান ট্রাক, ম্যাকআরথারের। ওটার পাশ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে এগোল। পিকআপের পাশ কাটিয়ে এল, চালানোর সাধ্য নেই আর এখন জিনার। হেঁটে চলল বাড়িতে।

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরতে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল জিনা। রক্ত ফিরল মুখে। 'শেরিফকে খবর দিতে হবে। ম্যাকআরথারের কাজ। আগেই বলেছি, ব্যাটা নাম্বার ওয়ান শয়তান।'

'তোমার দরকার নেই,' বলল কিশোর, 'সে-ই এতক্ষণে খবর দিয়ে ফেলেছে শেরিফকে। শেরিফের কাছে ওর কথা উল্টো-পাল্টা কিছু বলবে না, সাবধান।'

'কেন বলব না?' তর্ক শুরু করল জিনা। 'ওর খনিতে মানুষ মরে পড়ে আছে...'

শহরের দিক থেকে ছুটে আসছে ছোট্ট একটা ধুলোর মেঘ। কয়েক সেকেণ্ড পর ওদের পাশ কাটিয়ে গেল মেঘটা, বাদামী রঙের একটা সিডান গাড়ি। দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ শেরিফ। পলকের জন্যে ড্রাইভারকে দেখতে পেল ছেলেরা, বিশালদেহী লোক, মাথায় স্টেটসন হ্যাট। ম্যাকআরথারের কেবিনের সামনে গিয়ে থামল গাড়ি।

'কি বলেছিলাম?' জিনার দিকে চেয়ে হাসল কিশোর।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল জিনা, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। 'শেরিফকে কি বলে ম্যাকআরথার কে জানে।'

'তোমার চাচাকে কি বলবে, তাই ভাবো,' পথের দিকে নির্দেশ করল কিশোর। স্টেশন ওয়াগনটা ফিরছে।

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ছেলেরা, স্টেশন ওয়াগনও এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকলেন উইলসন, 'জিনা? শেরিফকে দেখলাম। কিছু হয়েছে?'

'ম্যাকআরথারের খনিতে একটা লাশ পড়ে আছে,' আরেক দিকে চেয়ে জবাব দিল জিনা।

'লাশ? খনিতে?'

মাথা ঝোঁকাল জিনা।

'মাদ্রে দা দিও!' বিড় বিড় করল ভিকি, বেরিয়ে আসছে গাড়ি থেকে। 'জিনা, তুমি জানলে কিভাবে?'

অস্বস্তিকর নীরবতা। ভাইঝির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উইলসন। 'জিনা, আবার ঢুকেছিলি খনিতে?'

কোনমতে মুখ তুলে বলল জিনা, 'হ্যাঁ...গতরাতে গুলির শব্দ শুনলাম তো...ভাবলাম...'

'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না,' কড়া গলায় বললেন তিনি। 'যাও, বাড়ি যাও। খবরদার, আর বেরোবে না।

গাড়ি থেকে নেমে মাঠের ওপর দিয়ে ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে দৌড় দিলেন উইলসন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন মিসেস ফিলটার, শেরিফের গাড়ি দেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দোতলায় এক জানালা থেকে আরেক জানালায় গিয়ে উঁকি দিতে লাগল চারজনেই। বাইরে, ম্যাকআরথারের বাড়িতে কি হচ্ছে দেখার জন্যে উদগ্রীব। আরও কিছুক্ষণ পর একটা অ্যামবুলেন্স গিয়ে থামল খনিমুখের সামনে। ঘণ্টাখানেক পর চলে গেল শহরের দিকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা গাড়ি এসেছে। তার একটা হাইওয়ে পেট্রল পুলিশের।

বেলা তিনটায় পিকআপটা নিয়ে ফিরে এলেন উইলসন।

'চাচা,' দেখেই বলে উঠল জিনা, 'ম্যাকআরথারকে অ্যারেস্ট করেছে?'

'তাকে কেন করবে? খনির ভেতর লোকটা অনেক আগে মরেছে। ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে কয় বছর আগে ঘাড় ভেঙেছিল। এতে ম্যাকআরথারের দোষ কি? খনির মুখ শিক দিয়ে বন্ধ করার আগেই মরেছে লোকটা।'

'পাঁচ বছর,' উইলসনের সাড়া পেয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভিকি। 'আহা, বেচারা। পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে মরে পড়ে আছে ওখানে, কেউ জানে না।'

'মাত্র পাঁচ?' মুসা বলল। 'আমি তো ভেবেছি চল্লিশ বছর।'

'খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই,' জানাল ভিকি, 'তবে মুখ বন্ধ করা হয়নি, লোক যাতায়াত থামেনি। অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে শেষে বছর পাঁচেক আগে, বসন্তকালেই বুঝি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসন্তকালে শিক দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে দেয়া হয়।'

মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে কিশোর, আনমনে একটা কিছু ছুঁড়ছে আর লুফে নিচ্ছে।

'কি, ওটা?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

খপ করে ধরল আবার কিশোর। 'খনিতে পেয়েছি। এটার জন্যেই আলো ধরতে বলেছিলাম তোমাকে।' ডান হাতের তর্জনী জিভে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে পাথরের মত জিনিসটার গা ডলল। 'শুনেছি ওটা রুপার খনি ছিল। সোনাও ছিল নাকি?'

'না, শুনিনি তো?' উইলসন বললেন।

পাথরটা আলোর দিকে ধরল কিশোর। 'উজ্জ্বল একটা দাগ। আয়রন পাইরাইট হতে পারে। ফুল'স গোল্ড বলে একে।' বাংলায় বলল, 'বোকার স্বর্ণ...না না, সোনালি ফাঁকি।'

'আয়রন পাইরাইট না কিসের পাইরাইট, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার,' বলে উঠল জিনা। 'আমি জানতে চাই, আগে কেন লাশটার কথা পুলিশকে বলেনি ম্যাকআরথার? আমরা দেখে ফেলায় জানাতে বাধ্য হয়েছে।'

ধৈর্য হারালেন উইলসন। 'ম্যাকআরথার জানত নাকি, লাশ আছে? গত হপ্তায় মাত্র শিকগুলো সরিয়েছে সে, খনির ভেতরে পুরোপুরি দেখার সময়টা পেল কই? পাঁচ বছর আগের একটা মড়া লুকানোর কোন দরকার আছে তার? দেখো জিনা, বেশি মাথায় উঠে গেছ।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। শব্দ শুনেই দরজা খুলে দিল ভিকি।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন শেরিফ। সরাসরি তাকালেন জিনার দিকে। 'জিনা, তুমি জানো, খনিটার নাম কেন ডেথ ট্র্যাপ রাখা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'ওখানে অ্যাকসিডেন্টে লোক মারা যায়। যায় তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'যায়। জানি।'

'আবার যদি ওখানে যাও, ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা হাজতে ভরবো। কোর্টে যেতে হবে তোমার চাচাকে, তোমাকে ছাড়াতে। ছেলেরা, তোমাদেরও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।'

একটা চেয়ার টেনে বসলেন শেরিফ।

'লোকটা কে, জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।

'বোধহয়,' শেরিফ বললেন। 'পকেটে মানি ব্যাগ আর একটা আইডেন্টিটি কার্ড পেয়েছি, তাতে স্যান ফ্রানসিসকোর ঠিকানা। ওখানে ফোন করলাম। পুলিশ জানাল, বছর পাঁচেক আগে জানুয়ারি মাসে বাড হিলারি নামে একটা লোক নিখোঁজ হয়েছে, রেকর্ড আছে। লোকটার অনেকগুলো ছদ্মনাম, এই যেমন, বেরি হারবার্ট, বন হিরাম, বার হুম্যান। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্যান কুয়েনটিন-এ জেল খেটেছে ছয় বছর। ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশ স্টেশনে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে মাত্র দু-বার, তারপরই গায়েব। পুলিশের ওয়ানটেড লিস্টে আছে দীর্ঘ দিন ধরে। খনিতে পাওয়া লাশের সঙ্গে হিলারির চেহারার বর্ণনা মিলে যায়। বদ্ধ বাতাসে একই আবহাওয়ায় থেকে পচেনি দেহটা, মমি হয়ে গেছে। আরও শিওর হওয়ার জন্যে

তার ডেন্টাল চার্ট চেক আপ করার নির্দেশ দিয়েছি।

'বেচারা ম্যাকআরথার,' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল জিনার কণ্ঠে, 'লাশটা যে আছে তার খনিতে, জানেই না।'

'জানেনা-ই তো। জানলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করত আমাকে,' উঠে দাঁড়ালেন শেরিফ। 'তো, যা বলেছি মনে থাকে যেন, ইয়াং লেডি। খনির ধারে কাছে যাবে না।'

শেরিফকে এগিয়ে দিতে বেরোলেন উইলসন।

'শিক খোলার পর খনির ভেতরটা ঘুরে দেখেনি ম্যাকআরথার, অবাকই লাগে,' বলল কিশোর। 'আমার খনি হলে আমি আগে ঘুরে দেখতাম।'

'বলছিই তো ব্যাটা আস্ত ইবলিস!' জিনার সেই এক কথা।

'পাঁচ বছর আগে, জানুয়ারি মাসে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'বাড হিলারি নামের এক ডাকাত ছাড়া পেল জেল থেকে। এরপর নিয়মিত দুই বার দেখা করল সে স্যান ফ্রানসিসকো পুলিশ অফিসে, তারপর গায়েব। তখন ছিল বসন্তকাল, খনির মুখ বন্ধ করার সময়। পালিয়ে টুইন লেকসে চলে এসেছিল লোকটা, খনিতে পড়ে মরল। কিন্তু স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালানো আর খনিতে পড়ার আগে মাঝখানের সময়টা সে কোথায় ছিল? কি করেছিল? ভিকিখালা, বলতে পারো, টুইন লেকসেই কি ছিল সে।'

মাথা নাড়ল ভিকি। 'টুইন লেকস খুব ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। নতুন কেউ এলে চোখে পড়েই।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিক পুলিশের নজর থেকে পালিয়ে এলে অন্য কারও চোখে পড়তে চাইবে না। অথচ ইচ্ছে করেই যেন এখানে চোখে পড়তে এল সে।'

'পাঁচ বছর আগে টুইন লেকসে আসলে কি ঘটেছিল?' কিশোরের কথার পিঠে বলল জিনা। 'একটা চোর ভেতরে থাকতেই বন্ধ করে দেয়া হলো খনির মুখ। এ-ব্যাপারে কারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না তো? হ্যারি ম্যাকআরথারের মত?'

'আমার মনে হয় না,' টেবিলে স্তূপ করে রাখা সংবাদপত্রগুলো ঘাঁটছে রবিন। 'তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি আমরা। তাতে যদি তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়, ভাল।'

'কি ভাবে?'

'স্থানীয় খবরের কাগজ,' একটা কাগজ তুলে দেখাল রবিন। 'দি ডেইলী টুইন লেকস। শহরের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব ছাপা হয়। এমন কি কার বাড়িতে কবে কজন মেহমান এল সে খবর পর্যন্ত। পুরানো কাগজ ঘাঁটলে বাড হিলারির ব্যাপারে কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।'

'দারুণ আইডিয়া!' আনন্দে হাত তালি দিয়ে জিনা বলল, 'চলো এখুনি যাই। সম্পাদক সাহেবকে আমি চিনি। আমি আসার খবর পেয়েই এসে দেখা করেছিলেন, কেন এসেছি, কদিন থাকব, নানা রকম প্রশ্ন। ছেপে দিয়েছেন পত্রিকায়। তোমরা যে এসেছ, সে খবরও নিশ্চয় পেয়েছেন। এখনও আসছেন না কেন তাই ভাবছি।'

'বাড়ি থেকে বেরোতে দেবেন তোমার চাচা?' মুসার প্রশ্ন।

'দেবে না মানে, একশো বার দেবে। খনি ছাড়া অন্য যে কোন জায়গায় যেতে দেবে।'

সাত

কিন্তু যেতে দিলেন না উইলসন, স্রেফ মানা করে দিলেন। উপরন্তু তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিলেন গাছ ছাঁটার কাজে, কড়া নির্দেশ দিয়ে রাখলেন, ডিনারের আগে কতখানি জায়গার গাছ ছাঁটতে হবে। বাড়িতে একা একা বসে আঙুল চোষা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না জিনার।

পর দিন সকালে মেজাজ ভাল হয়ে গেল উইলসনের। জিনা যখন বলল তিন গোয়েন্দাকে শহর দেখাতে নিয়ে যেতে চায়, শুধু বললেন, 'সারাদিন কাটিয়ে এসো না।'

'না, কাটাব না,' বলল জিনা। 'আর টুইন লেকসে আছেই বা কি, এত সময় দেখবে?'

ধুলো-ঢাকা কাঁচা সড়ক ধরে হেঁটে চলল ওরা। পর পর কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটাল ওদের, ম্যাকআরথারের বাড়ি যাচ্ছে। একটা গাড়ি থেমে গেল কাছে এসে। জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন, জিজ্ঞেস করল, 'ডেথ ট্র্যাপ মাইনে কি এদিক দিয়েই যেতে হয়?'

'হ্যাঁ,' বলল জিনা।

'থ্যাংকিউ,' গাড়ি ছাড়তে গিয়ে কি মনে করে আবার থেমে গেল লোকটা। 'এই শোনো, তোমরাই কি লাশটা আবিষ্কার করেছ?'

'হয়েছে!' আঁতকে উঠল রবিন। তাড়াতাড়ি জিনার হাত ধরে টান দিল, 'জিনা, এসো, জলদি। খবরের কাগজ।'

'এই শোনো, শোনো,' গাড়ি থেকে ক্যামেরা হাতে নামছে লোকটা। 'এই, এক সেকেণ্ড, তোমাদের একটা ছবি...'

'লাগবে না,' হাত নেড়ে জবাব দিয়েই হাঁটার গতি বাড়াল মুসা।

প্রায় ছুটতে শুরু করল ওরা। আরেকটা গাড়ি পাশ কাটাল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে আরোহীরা।

'জানতাম এ-রকমই হবে,' গতি কমাল না কিশোর। 'গতরাতে টেলিভিশনে খবরে দেখিয়েছে, লোকের কৌতূহল হবেই। সব পাগল। যেন আর কোন কাজ নেই দুনিয়ায়।'

'খবরদার, ছবি তুলতে দিয়ো না,' জিনাকে হুঁশিয়ার করল মুসা। 'তোমার চাচা রেগে যাবেন।'

শহরের প্রধান সড়কে বেশ ভিড়। পথের ধারে গাড়ির মেলা। কোর্ট হাউসের সামনে ঠেলাঠেলি করছে নারী-পুরুষ, ওদেরকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন শেরিফ, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, মুখ-চোখ লাল। এক সঙ্গে কজনের প্রশ্নের জবাব দেবেন?

'রিপোর্টারের দল,' বলল রবিন। 'স্টোরি চায়।'

ডেইলী টুইন লেকসের অফিসটা এককালে মুদী দোকান ছিল। ওটাকেই সামান্য পরিবর্তন করে প্রেস বসানো হয়েছে। পথের দিকে মুখ করা রয়েছে বিশাল

কাচের জানালা, দোকান যে ছিল বোঝাই যায়। ভেতরে গোটা দুই পুরানো নড়বড়ে ডেস্ক। একটাতে বিভিন্ন অফিশিয়াল কাগজ আর পত্রিকা-ম্যাগাজিনের স্তূপ। আরেকটার সামনে বসে আছেন রোগাটে এক তালপাতার সিপাই, শরীরের যেখানে সেখানে দড়ির মত ফুলে আছে মোটা মোটা রগ। লালচে চুল, তীক্ষ্ণ চেহারা। মহাউত্তেজিত, টাইপ রাইটারের চাবিগুলোতে ঝড় তুলেছেন, একনাগাড়ে টিপে যাচ্ছেন।

'আরে, জিনা!' দেখেই বলে উঠলেন সম্পাদক। 'এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছি। লেখাটা শেষ করেই যেতাম। শেরিফের কাছে শুনলাম, তুমিই লাশটা খুঁজে পেয়েছ।'

হাসল জিনা। 'আপনিই স্যার একমাত্র লোক, যিনি খুশি হলেন। ম্যাকআরথার তো পারলে ঘাড় মটকে দিত। শেরিফ বলল, জেলে ভরবে। আর আমার নিজের চাচা, পুরো চোদ্দ ঘণ্টা আটকে রাখল বাড়িতে।'

'জানি জানি। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেব না। তবে এখন আর খনির কাছাকাছি যেও না। তা, ইন্টারভিউ দিতে আপত্তি আছে?' তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন। 'তোমার বন্ধুরা না? লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে?'

'শুনে ফেলেছেন তাহলে। এ-হলো কিশোর পাশা, ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড, ওর বাবা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের রিপোর্টার।'

'আহ্‌ পত্রিকা একখান!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সম্পাদক।

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' পার্টিশনের ধার দিয়ে সরে যেতে লাগল রবিন, লক্ষ্য ওপাশের আধো অন্ধকার বড় ঘরটা। একটা ছোট রোটারি প্রেস আর লাইনোটাইপ মেশিন চোখে পড়েছে তার। ধুলোয় ভারি হয়ে আছে বাতাস, ছাপার কালির কড়া গন্ধ।

'ঘুরে দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন সম্পাদক।

'দেখালে খুব খুশি হব, স্যার,' বলল রবিন। 'পত্রিকার কাজ খুব ভাল লাগে আমার। লাইনোটাইপটা কি আপনিই চালান?'

'কম্পোজ থেকে শুরু করে সবই আমি করি। তবে কাজ বিশেষ থাকে না। এ-হপ্তার কথা অবশ্য আলাদা। জিনা, বসো ওখানটায়। হ্যাঁ, এবার খুলে বলো তো সব। রবিন, তুমি গিয়ে দেখো। লাইট জ্বেলে নিও।'

মুসা আর কিশোরও চলল রবিনের সঙ্গে। সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিল কিশোর। সিলিঙে লাগানো উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ভরে গেল ঘর। এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে তাক, তাতে বড় বড় ড্রয়ার, প্রতিটি ড্রয়ারের হাতলের নিচে সাদা রঙে লেখা রয়েছে তারিখ, মাস, বছর।

'পুরানো ইস্যুগুলো এদিকে,' রবিন দেখাল।

'পাঁচ বছর আগেরগুলো দরকার,' কিশোর বলল।

কয়েকটা ড্রয়ার নামিয়ে নিল ওরা। খনির মুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখনকার কপি আছে ওগুলোতে।

'প্রত্যেকটা কপি দেখবে,' বলল কিশোর। 'হেডলাইনগুলো পড়বে। আমাদের দরকারে লাগতে পারে এমন কোন কিছুই যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।'

পত্রিকার বোঝা নিয়ে মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসল ওরা। পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে জিনার কথা।

ঘেঁটে চলেছে ওরা পত্রিকা! বিরক্তিকর কাজ। মজার কিছুই নেই, অতি সাধারণ কভার, কার বাড়িতে আগুন লেগেছিল, শেরিফ কবে নতুন গাড়ি কিনলেন, কোন আত্মীয় কবে টুইন লেকসে কার বাড়িতে বেড়াতে এল, ইত্যাদি। বাড হিলারির নাম-গন্ধও নেই। তবে ২৯ এপ্রিলের পত্রিকার এক জায়গায় এসে থমকে গেল কিশোর, 'বোধহয় কিছু পেলাম।'

'কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

পুরো এক মিনিট নীরবে পড়ল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল পাঁচ বছরের একটা মেয়ে, তিন ঘণ্টা নিখোঁজ হয়ে ছিল। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে শেষে ডেথ ট্র্যাপ মাইনে পাওয়া গেছে তাকে। খনিতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেয়েটা। আঁতকে উঠল লোকে, টনক নড়ল, মারাও যেতে পারত মেয়েটা। চাঁদা তুলতে শুরু করল তার বাবা-মা, খনির মুখ ভালমত বন্ধ করার জন্যে।'

খুঁজল কিশোর। 'মে-র ছয় তারিখের পেপারটা কোথায়? দেখো তো তোমার ওখানে?'

'এই যে,' বের করল রবিন। 'হ্যাঁ, পয়লা পাতায়ই আছে খনির খবর। টুইন লেকস মার্কেটের মালিক দোকানের সামনে পাঁচ গ্যালনের একটা ড্রাম রেখে দিয়েছিল, তার গায়ে লেখা ছিল ঃ খনি বন্ধ করার জন্যে মুক্তহস্তে দান করুন। দু-দিনেই লোহার গ্রিল কেনার টাকা উঠে গেল। লর্ডসবুর্গ থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনা হলো গ্রিল। ঠিক হলো, মে-র চোদ্দ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হবে খনির মুখ।'

তেরো তারিখের পত্রিকায় আরও বিস্তারিত লেখা রয়েছে, কি ভাবে বন্ধ করা হবে মুখটা। প্রচণ্ড উত্তেজনা গিয়েছে কদিন ছোট্ট শহরটায়। অনেক তোড়জোড় করে নির্দিষ্ট দিনে সিমেন্ট গেঁথে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে গ্রিল—এসব কথা লেখা আছে বিশ তারিখের পত্রিকায়।

'বাপরে বাপ, যেন আমেরিকার জন্মদিন গেছে,' বলল মুসা।

'সম্পাদক সাহেব কি বললেন শুনেছ তো,' রবিন মনে করিয়ে দিল। 'কাজ তেমন নেই তাঁর। ছোট শহর, হাতে গোণা কয়েকজন লোক, ওই খনি বন্ধ করার ব্যাপারটাই একটা বিরাট ঘটনা।'

টুইন লেকসবাসীরা মিছিল করে যাচ্ছে খনির দিকে, ছবিটার দিকে চেয়ে রইল রবিন। হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে, এই তো। চার পৃষ্ঠায়। খনির সীমানার মধ্যে সেদিন পরিত্যক্ত একটা গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। একটা শেভ্রলে সেডান। পুলিশ পরে জেনেছে, লর্ডসবুর্গের সুপার মার্কেট থেকে তিন দিন আগে চুরি হয়েছিল ওটা। এই যে, শেরিফ থ্যাচারের মন্তব্যও কোট করা হয়েছে ঃ তাঁর ধারণা, টুইন লেকসের কোন তরুণের কাণ্ড। বিনে পয়সায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে গাড়ি চুরি করেছে। হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, এরপর যদি এ-ধরনের ঘটনা ঘটে, টুইন লেকসের সব উচ্ছৃঙ্খল তরুণকে নিয়ে হাজতে ঢোকাবেন।'

মুখ তুলল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর ভাবনায় মগ্ন। বিড় বিড় করল, 'লর্ডসবুর্গ থেকে চুরি...পাওয়া গেল খনির কাছে। খনির ভেতরে তখন এক চোর· সে-ই চুরি করেছিল বললে অতিকল্পনা হয়ে যাবে? কোন কারণে খনির ভেতরে ঢুকেছিল...আর বেরোতে পারেনি।'

'তা নাহয় হলো,' কথাটা ধরল মুসা, 'কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ? আমরা তো যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে যাচ্ছি। ধরে নিলাম, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালিয়ে লর্ডসবুর্গে এসেছিল হিলারি, সেখান থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছে টুইন লেকসে। কিন্তু কেন? কিসের তাগিদে?'

মুখ বাঁকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু কিশোর।

পুরানো কাগজ ঘেঁটে চলল রবিন। এই রহস্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তেমন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। হ্যারি ম্যাকআরথারের উল্লেখ নেই। জানা গেল, ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে টুইন লেকসে এসেছিল মিসেস রোজি ফিলটার। পরে দুটো সংখ্যায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে, কোথায় কবে কতখানি জায়গা কিনেছে মহিলা। জায়গাগুলো ছিল খনির সম্পত্তি।

'ভাবছি, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালিয়ে এসে কতদিন লর্ডসবুর্গে ছিল হিলারি?' আনমনে বলল কিশোর।

লাইনোটাইপ মেশিনের গায়ে হেলান দিল মুসা। 'কে জানে? পুলিশকে না জানিয়ে পালিয়ে এসে আইন অমান্য করেছে সে, ঠিক। তবে সেটা পাঁচ বছর আগে। এতদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চয় পরিস্থিতি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিনা কারণেই এসেছিল এখানে। খনিতে ঢুকেছিল। এমন একটা খনি, যেটা কিনেছে হ্যারি ম্যাকআরথার। লাশটা যে ছিল খনিতে, কেন জানল না সে? দুজনের মাঝে, ঘটনাগুলোর মাঝে কি কোন যোগসূত্র রয়েছে? একজন জেলফেরত দাগী আসামী আর একজন রহস্যময় ধনীর মাঝে? একটাই কাজ এখন করার আছে আমাদের।'

'কী?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা।

'সময়কে পিছিয়ে নিতে পারি আমরা।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। 'কি আবল-তাবল বকছ? এই কিশোর?'

'অ্যাঁ?' সংবিৎ ফিরল যেন কিশোরের। 'হ্যাঁ, সময়কে পিছিয়ে নিতে পারি। হিলারির অতীত উদঘাটনের চেষ্টা করতে পারি। লর্ডসবুর্গে থেকে থাকলে, নিশ্চয় রাতে ঘুমাতে হয়েছে তাকে। কোথায়? এত বছর পর জানার চেষ্টা করা কঠিন, হয়তো বৃথাই হবে, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। পুরানো খবরের কাগজ আর টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে দেখতে পারি। হ্যাঁ, এই একটাই কাজ করার আছে এখন আমাদের।'

আট

শেষ বিকেলে বাড়ি ফিরল ওরা।

বারান্দায় অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন উইলসন। গাড়ি বারান্দায় তিনটে গাড়ি। জটলা করছে কয়েকজন লোক, কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'কারও সঙ্গে কথা বলবে না আমার ভাস্তি,' রাগ করে বললেন উইলসন। 'এমনিতেই ও বদমেজাজী, তার ওপর এই ঘটনায় মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে…' ছেলেদেরকে দেখে থেমে গেলেন। 'জিনা, ঢোকো! সোজা ওপরতলায়।' লাফ দিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে জিনার বাহু ধরে টেনে নিয়ে ঠেলে দিলেন ঘরের ভেতরে। পিঠে ধাক্কা দিয়ে ছেলেদেরও ঢুকিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। নিজেও ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

'রিপোর্টার না জোঁক,' লাল হয়ে গেছে তাঁর মুখ। 'একটা কথাও বলবে না ওদের সঙ্গে।'

'কেন, কি হবে?' প্রশ্ন না করে পারল না জিনা। 'আমি তো এখন মস্ত বড় খবর, তাই না?'

'কি হবে? তোমার মা শুনলে আমার মুণ্ডু কেটে নেবে, এই হবে।'

'আগে হুঁশিয়ার করলে না কেন? আমি তো সব বলে এসেছি সম্পাদক পিটারসনকে।'

'পিটারসনের কথা আলাদা,' ছেলেদের অবাক করে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন উইলসন। 'সে চালায় একটা অখ্যাত পত্রিকা। জাপানে বসে এটা পাবে না তোর মা, জানবেও না কিছু। যা বলছি, শুনবি। বাড়ি থেকে একদম বেরোবি না আজ। কালও যদি জোঁকগুলো না যায়, কালও বেরোনো চলবে না।'

'আংকেল,' কিশোর বলল, 'কাল আমরা লর্ডসবুর্গে যেতে চাই।'

'কেন?'

পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর, আগের দিন খনিতে যেটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। দেখিয়ে বলল, 'জুয়েলারকে দেখাব।'

হাসলেন উইলসন। 'সোনার টুকরো মনে করেছ? হতাশ হবে। ডেথ ট্র্যাপে সোনা নেই। যেতে পারো, তবে কাল নয়। এ-হপ্তায়ই আমি যাব, তুমি আর জিনা যেতে পারবে তখন। চাইলে, চারজনেই যাবে। তোমাদেরকে রেখে যাওয়ার চেয়ে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।'

রিপোর্টারদের বিদায় করার জন্যে আবার বেরোলেন উইলসন।

সারাটা বিকেল বই পড়ে আর আলোচনা করে কাটাল ওরা। খানিক পর পরই বাংকরুমের লাগোয়া ঝোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকাল ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে। জিনা এসে জানাল একবার, শটগান হাতে গুহা পাহারা দিচ্ছে ম্যাকআরথার। তার হারামী কুত্তাটা দর্শক তাড়াতে তাড়াতে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘেউ ঘেউ করারও আর শক্তি নেই। লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতে সকাল সকাল খেয়ে বাংকরুমে এসে ঢুকল ছেলেরা। ম্যাকআরথারের জানালায় আলো দেখতে পেল। কিন্তু ওরা বিছানায় ওঠার আগেই নিভে গেল আলো। একটু পরে মিসেস ফিলটারের বাড়ির আলোও নিভে গেল।

'সবাই যেন আজ বেশি ক্লান্ত,' বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বলল মুসা। 'আমিও।

কিন্তু কেন বুঝতে পারছি না।'

'উত্তেজনা,' ব্যাখ্যা করল রবিন। 'প্রচণ্ড উত্তেজনায় দ্রুত ক্ষয় হয় শরীর, কাহিল হয়ে পড়ে। এখানকার সবার বেলায়ই তো আজ এই ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া কোন কারণে হঠাৎ বেশি চমকে গেলেও পরে অবসাদ আসে শরীরে। কাল খনিতে যা দেখলাম, ভয়ানক দৃশ্য। বড় কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা।'

কিন্তু কি করছিল সে ওখানে? সারা দিন নিজেকে অনেকবার প্রশ্নটা করেছে কিশোর। লর্ডসবুর্গে হয়তো কোন জবাব মিলবে।

'জুয়েলারকে পাথর দেখাতে সত্যি যাচ্ছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'ক্ষতি কি? এটা একটা ভাল ছুতো, আংকেলের কাছ থেকে সরে যাওয়ার। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে যান, খনি-রহস্যের তদন্ত করছি আমরা, মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করবেন না আর।'

'জিনা কিন্তু হিলারিকে নিয়ে মোটেও ভাবছে না। তার একটাই লক্ষ্য, ম্যাকআরথারকে ভণ্ড প্রমাণ করা।'

'কিন্তু লাশটাকে কেন আগে দেখল না ম্যাকআরথার? প্রশ্নটা খালি খোঁচাচ্ছে আমাকে। নিজের খনি একটু ঘুরে দেখার কৌতূহলও হলো না?'

নানারকম প্রশ্ন মনে নিয়ে একে একে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মুসার। অন্ধকারেই ভ্রূকুটি করে কান পাতল। কিছু একটা নড়ছে বাইরে, জানালার নিচে কোথাও। আরেকবার শোনা গেল, শব্দটা, মচমচ, ক্যাঁচকোঁচ। কনুয়ের ওপর ভর রেখে উঠল সে।

'কিশোর, এই কিশোর?' ফিসফিস করে ডাকল। 'রবিন? শুনছ?'

'উ...কি?' পাশ ফিরল রবিন।

গোলাঘরের দরজা খুলল কে জানি,' উঠে পা টিপে টিপে জানালার দিকে এগোল মুসা। চৌকাঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল। পাশে এসে দাঁড়াল অন্য দুজন।

'কই, দরজা তো বন্ধ,' রবিন বলল।

পর মুহূর্তেই আলো দেখা গেল গোলাঘরের জানালার ময়লা কাচে, নাচছে আলোটা মৃদু। নিভে গেল। জ্বলল আবার।

'দেশলাই জ্বালছে,' কিশোর বলল। 'চলো তো, দেখি।'

দ্রুত শার্ট-প্যান্ট আর জুতো পরে নিল ওরা। নিঃশব্দে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। সাবধানে খুলল সামনের দরজা।

চাঁদ ডুবে গেছে। বেশ অন্ধকার। আগে আগে এগোল গোয়েন্দাপ্রধান, তাকে অনুসরণ করল সহকারীরা। গোলাঘরের দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় আলগা পাথরে পা পড়ে পিছলাল রবিন, গোড়ালি গেল মচকে, জোরে চিৎকার দিয়ে বসে পড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল ঘরের আলো। জানালা অন্ধকার।

'খাইছে!' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা।

একটা পাথরে বসে গোড়ালি ডলতে শুরু করল রবিন, চোখ গোলাঘরের দিকে। খানিক পরেই উঠে দাঁড়াল সে। আবার এগোল তিনজনে। আস্তে করে দরজার বাইরে খিলে হাত রাখল কিশোর, মৃদু খড়খড় করে উঠল ওটা।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বুকে জোর ধাক্কা খেয়ে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল কিশোর। মোটাসোটা মূর্তিটাকে দেখেই লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। ওদের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে গেল লোকটা, হারিয়ে গেল গাড়ি পথের ওপাশের ক্রিস্টমাস খেতে।

'কে?' বাড়ির ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল। 'কে ওখানে?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। জবাব দিল, 'গোলাঘরে চোর ঢুকেছিল।'

'তাই নাকি? সর্বনাশ!' বললেন উইলসন। 'এখুনি শেরিফকে ফোন করছি।'

ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে হাত তুলে বলল মুসা, 'ব্যাটা ওদিকে গেছে।'

কান পেতে রয়েছে ছেলেরা, কিন্তু আর কোন শব্দ শোনা গেল না। অন্ধকার খেত, গাছগুলো নিথর।

'বেশি দূর যায়নি,' বলল কিশোর।

ঢোক গিলল মুসা, পায়ে পায়ে এগোল খেতের দিকে। কান খাড়া, কোন গাছ নড়ছে কিনা, অন্ধকারে বোঝার চেষ্টা করছে। তার পেছনেই রয়েছে কিশোর আর রবিন। আরেকটু এগিয়ে আস্তে করে বাঁয়ে সরে গেল কিশোর, রবিন সরলো ডানে। খেতে ঢুকে পড়ল মুসা, খুব সাবধানে এগোচ্ছে যাতে নিচের দিকের কোন ডালে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে।

হঠাৎ থেমে গেল মুসা। দুরুদুরু করছে বুক, কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে যেন রক্তের দ্রুত সঞ্চালন। আরেকটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। জোর করে শব্দটা চেপে রাখতে চাইছে যে লোকটা। দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। রয়েছে কাছেই।

স্থির হয়ে গেছে মুসা, শুনছে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে গাছের আড়ালে রয়েছে, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। সঙ্গীদের ডাকার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল সে। চোরটা ভাগবে তাহলে।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শুনে হাসি ফুটল মুসার মুখে। শেরিফ ছুটে আসছেন। চোরটাকে পাকড়াও করতে পারবে এবার।

গেটের কাছে মোড় নিল গাড়ি, হেডলাইটের আলো ঘুরে এসে পড়ল মুসা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এক দৌড়ে গিয়ে আরেকটা ঘন ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে গেল চোর। লাফিয়ে উঠে তার পিছু নিল মুসা। কিন্তু দুই পা এগিয়েই থেমে গেল। ওপরের দিকে তোলা একটা হাত দেখতে পাচ্ছে, নড়তে শুরু করেছে হাতটা।

ঝট করে নিচু হয়ে গেল মুসা। শাঁ করে তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল ধারাল লম্বা ফলা, একটা গাছের মাথা দু-টুকরো হয় গেল, আরেক মুহূর্ত দেরি করলে গাছের পরিণতি হত মুসার।

গাছপালা ভেঙে মাড়িয়ে আবার দৌড় দিল চোর।

সোজা হলো মুসা। হাঁটু কাঁপছে। বড় বাঁচা গেছে, আরেকটু হলেই আজ···আর ভাবতে পারল না সে।

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'ভোজালী!' কোনমতে বলল মুসা। 'গাছ কাটার ছুরি! আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমার মুণ্ডু আলাদা করে!'

নয়

সঙ্গে করে এক যুবক সহকারীকে নিয়ে এসেছেন শেরিফ, নাম ডিক। সব কথা মন দিয়ে শুনল ওরা, তার পর জোরাল একটা টর্চ নিয়ে চোর খুঁজতে বেরোল। ক্রিস্টমাস খেতে পায়ের ছাপ পাওয়া গেল, মুসা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কাছেই। ম্যাকআরথারের সীমানার ভেতরে অন্য অনেকগুলো ছাপের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে চোরের ছাপ। আর অনুসরণ করা গেল না, কোনটা যে কার বোঝাই মুশকিল।

দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলেরা।

ম্যাকআরথারকে ডেকে তুলে তার কেবিনে ঢুকলেন শেরিফ আর তার সহকারী। কুকুরটা চেঁচাচ্ছে। কিন্তু কান দিল না ওরা, তিনজনে গিয়ে ঢুকল খনিতে।

মিসেস ফিলটার জেগে গেছেন, আলো দেখা যাচ্ছে তাঁর জানালায়।

মহিলার বাড়িতেও ঢুকলেন শেরিফ, অব্যবহৃত ঘরগুলোতে ঢুকে দেখলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এলেন শেরিফ আর ডিক।

'চোরটা,' উলইসনকে বললেন শেরিফ, 'পাহাড়ের ওদিকে চলে গেছে। অন্ধকারে খুঁজে বের করা যাবে না, তাই আর পিছু নিলাম না। রিপোর্টারদের কেউও হতে পারে। কিছু একটা ঘটলেই পঙ্গপালের মত এসে ছেঁকে ধরে। কিন্তু ছুরিটা কেন নিল বুঝলাম না।'

সহকারীকে নিয়ে শহরে ফিরে গেলেন শেরিফ।

দরজা বন্ধ করলেন উইলসন, নিচ তলায় জানালাগুলোও সব বন্ধ করে দিলেন।

সকালে হো-হো হাসি শুনে ঘুম ভাঙল ছেলেদের। নিচে রান্নাঘরে নেমে দেখল বেশ জমিয়ে নিয়েছে জিনা আর ভিকি। টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে জিনা।

'কি ব্যাপার? খুব আনন্দে আছ মনে হচ্ছে?' হেসে জিনাকে বলল কিশোর।

'আনন্দই তো,' জবাব দিল ভিকি। 'পুরানো দিনের কথা মনে করে দিচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে টুইন লেকসে এ-রকম উত্তেজনাই ছিল। শনিবারে এমন কোন রাত যেত না, যেদিন মারপিট হত না। শেষে শেরিফকে এসে থামাতে হত।'

'খালা,' জিনা বলল 'শিশু ম্যাকআরথারকে দেখেছ?'

'দেখব না মানে?' হেসে বলল ভিকি। 'ওসব ভোলা যায় নাকি?'

'সত্যি এখানে জন্মেছে?'

'তবে কোথায়? কোর্ট হাউসের কাছে ছোট একটা সবুজ বাড়িতে থাকত তার মা-বাবা। তার বাপ ছিল খনির ফোরম্যান। খনির কাজে ওস্তাদ। হ্যারির পরে আর কোন শিশুকে জন্মাতে দেখিনি এ-শহরে, তার আগেই চলে গিয়েছিলাম। খনিরও তখন শেষ দশা, লোকে গাঁটরি গোছাতে শুরু করেছে। অনেক দিন পর আমি ফিরেছি। হ্যারিও ফিরল। তার বাবা-মা কেমন, কোথায় আছে, টুইন লেকস থেকে যাওয়ার পর কেমন কেটেছে, গিয়ে জিজ্ঞেস করব ভাবছি একদিন, সময়ই করে উঠতে

পারি না। তাছাড়া হ্যারিও খুব ব্যস্ত। সারাক্ষণ লাল ট্রাকটা নিয়ে ঘোরে, কি করে কে জানে। আজ ভোরে দেখলাম, তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে, মাথায় সেই অদ্ভুত হ্যাট। কেন যে পরে, বুঝি না।'

রাস্তায় গাড়ির শব্দ হলো।

দোতলায় ছুটল জিনা। নেমে এসে জানাল, ম্যাকআরথার ফিরেছে। সঙ্গে আরও দুজন লোক। 'মনে হলো মেকসিকান,' বলল সে। 'আবার কোন্ মতলব?'

'জিজ্ঞেস করলে না কেন?' ভিকি বলে উঠল।

'করলেই যেন বলবে। তাছাড়া ওকে বিরক্ত করলে চাচা যাবে রেগে। বলেছে, আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে।'

'পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বলে, কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল ভিকি।

নাস্তা সেরে খেতে কাজ করতে চলল তিন গোয়েন্দা। বড় একটা খেতের গাছ সব ছেঁটে আরেকটায় এসে ঢুকল। জিনাও এসে হাত লাগাচ্ছে মাঝে মাঝে, তবে ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকেই তার খেয়াল। কমেটের পিঠে চড়ে বারবার গিয়ে ঢুঁ মেরে আসছে ওদিক থেকে। খবর জানাচ্ছে বন্ধুদেরকে। খনিমুখের কাছেই কাঠের ছোট একটা ছাউনি আছে, সেটার দরজায় নাকি এখন ঝকঝকে নতুন তালা ঝুলছে। ম্যাকআরথার তার বিচিত্র পোশাক আর হ্যাট পরে গাড়িতে করে ঘুরছে, সাংঘাতিক ব্যস্ত।

সেদিন নতুন কিছু ঘটল না।

দ্বিতীয় দিনে শ্রমিকেরা এল। ট্র্যাকে করে নিয়ে এসেছে সিমেন্টের বস্তা, স্টীলের খুঁটি। ম্যাকআরথারের সীমানা ঘিরে আট ফুট উঁচু বেড়া দিতে শুরু করল।

দুপুরে খাওয়ার সময় জিনা বলল, 'বাতিল একটা খনির জন্যে বেহুদা খরচ করছে লোকটা। ওটা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে?'

'তুমি যাচ্ছ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন তার চাচা। 'পাগল হয়ে আছ ভেতরে ঢোকার জন্যে। জোঁকগুলোর কথা বাদই দিলাম। করবে কি বেচারা? ক্রিস্টমাস গাছের প্রতি লোকে এত আগ্রহ দেখালে আমিও বেড়া দিতে বাধ্য হতাম।'

খাওয়ার পর রাস্তার ধারের খেতে আগাছা বাছতে চলে গেলেন উইলসন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'ক্রিস্টমাস গাছের ব্যাপারে যদি আগ্রহী না-ই হয়, গোলাঘরে ঢুকল কেন চোর?'

কেউ জবাব দিল না।

এঁটো বাসনগুলো ঠেলে দিয়ে হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল ওরা। গোলাঘরের দিকে চলল। ভালমত দেখবে।

'কিচ্ছু নেই,' মুসা বলল। 'খড়, কিছু যন্ত্রপাতি, হোস পাইপ আর একটা পুরানো অচল গাড়ি।'

'হয়তো ছুরির দরকার পড়েছিল ব্যাটার।'

'খুব খারাপ কথা,' রবিন মন্তব্য করল। 'যা একেকটা ছুরি, এক কোপে ধড় থেকে কল্লা নামিয়ে দেয়া যাবে। ওই জিনিস কার দরকার পড়ল?'

গোলা থেকে বেরোল ওরা। গেটের সামনে দিয়ে চলে গেল ম্যাকআরথারের

লাল শেভি সুবারব্যান। খনির দিকে চলেছে। ম্যাকআরথারের পাশে বসে আছে আরেকজন, হালকা সামার-সুট আর সাদা হ্যাটে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

দৌড়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে চলে এল ছেলেরা, দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে এসে উঠল দোতলায়। বাংকরুমের ঝোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ম্যাকআরথারের বাড়িতে কি ঘটে দেখার জন্যে উদগ্রীব।

শ্রমিক দুজন এখন বেড়া লাগাচ্ছে না। একজন বেরিয়ে এল খনির ভেতর থেকে, একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে, তাতে পাথর আর মাটি বোঝাই। কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে থামাল ম্যাকআরথার, গাড়ি থেকে এক মুঠো মাটি-পাথর তুলে নিয়ে মেলে ধরল তার সঙ্গীর চোখের সামনে। তারপর কিছু বলল শ্রমিককে।

গাড়িটা এক জায়গায় রেখে ওয়ার্কশপ বিল্ডিঙে চলে গেল শ্রমিক।

অতিথিকে নিয়ে ম্যাকআরথার ঢুকল খনিতে।

মিনিটখানেক পর চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল খনির ভেতর থেকে। কয়েক সেকেণ্ড দূরাগত মেঘ গর্জনের মত গুমগুম করে মিলিয়ে গেল শব্দের রেশ।

'আবার গুলি করছে,' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

'গুলি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। ডিনামাইট।

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মিসেস ফিলটার। ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে নজর।

খনিমুখে দেখা দিল ম্যাকআরথার আর তার অতিথি। পেছনে বেরোল দ্বিতীয় শ্রমিকটা। সে-ও আরেকটা ঠেলাগাড়ি ভরে মাটি আর পাথর নিয়ে বেরিয়েছে।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট কথা বলল ম্যাকআরথার আর তার সঙ্গী। তারপর লাল ট্রাকে চড়ে এগিয়ে এল পথ ধরে।

বারান্দায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ফিলটার, তাঁর সামনে দিয়েই গেল ট্রাক, কিন্তু ফিরেও তাকাল না ম্যাকআরথার।

ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর রাস্তা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে এলেন মিসেস ফিলটার, অধৈর্য্যভাবে নাড়ছেন হাতের চুড়ি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ছেলেরা। দরজা খুলে দিল জিনা।

'কাণ্ড দেখেছ?' যেন জিনাকে বলার জন্যেই এসেছেন মিসেস ফিলটার। 'খনিতে আবার কাজ শুরু করেছে মিস্টার ম্যাকআরথার।'

রান্নাঘর থেকে বেরোল ভিকি। 'কিন্তু কি লাভ? ওই খনিতে আর কিচ্ছু নেই। সব রূপা শেষ।'

'কিন্তু তা-ও তো কাজ শুরু করল। ডিনামাইট ফাটাল। শোনোনি? আমার ভুল হতে পারে না। ওই শব্দ জীবনে এত বার শুনেছি, কোনদিন ভুলব না।'

'খেলাধুলা করছে আরকি,' হালকা গলায় বলল মুসা। 'কিংবা টুরিস্ট আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জানেনই তো, পুরানো ভূতুড়ে শহর কিনে ঠিকঠাক করে ব্যবসা ফেঁদে বসে লোকে। এ-ও হয়তো তেমনি কিছু।'

অস্বস্তি ফুটল মিসেস ফিলটারের চোখে। 'জায়গাটার বারোটা বাজাবে লোকটা। শান্তি তাহলে শেষ।'

'তার জায়গা, সে যা খুশি করবে,' ঠোঁট বাঁকাল জিনা, আসলে চাচাকে ভেঙাল, উইলসনও এমনি করেই বলেছিলেন।

বিরক্তি চাপতে পারলেন না মিসেস ফিলটার, নাক দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করে ফিরে চললেন বাড়িতে।

'আমার বিশ্বাস হয় না টুরিস্টদের জন্যে খনি ওপেন করতে যাচ্ছে ম্যাকআরথার,' বলল কিশোর। 'টুইন লেকস অনেক দূর, রাস্তাও ভাল না।'

'কি করছে তাহলে?' প্রশ্ন করল মুসা।

হাসল কিশোর। 'ওর মেকসিকান শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করে দেখব। ম্যাকআরথার নেই এখন। চলো তো যাই।'

মিনিট কয়েক পর নতুন তোলা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। শ্রমিকদের ডাকল। ইংরেজিতে কথা বলল ওরা। জবাব নেই। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ জানে কিশোর, চেষ্টা করে দেখল। তা-ও সাড়া মিলল না। সন্দিগ্ধ চোখে তাদের দিকে তাকাচ্ছে মেকসিকান দুজন।

হতাশ হয়ে ফিরে এল ওরা। ভিকির সাহায্য চাইল।

'তুমি তো মেকসিকোর ভাষা জানো, ভিকিখালা,' মুসা বলল। 'গিয়ে বলে দেখো না একটু। তোমাকে হয়তো বিশ্বাস করবে।'

বেশ আগ্রহ নিয়েই গেল ভিকি। ফিরে এল একটু পরেই। তার দিকে নাকি তাকিয়েও দেখেনি শ্রমিকেরা, তার ওপর রয়েছে কুকুরটা। দেখা মাত্র চিনে ফেলেছে শত্রুকে, ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসেছে। চেঁচামেচির মাঝেও শ্রমিকদের নিজেদের আলোচনার একটা শব্দ কানে এসেছে, 'ওরো'।

'ওরো?' ভিকির উচ্চারণের প্রতিধ্বনি করল কিশোর। 'মানে স্বর্ণ! ম্যাকআরথার কি সোনা খুঁজছে নাকি খনিতে?'

'কিন্তু ওটা তো রূপার খনি?' প্রতিবাদ করল ভিকি।

'সোনা আর রূপা অনেক সময় কাছাকাছিই পাওয়া যায়,' পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর। 'জিনা, তোমার চাচা কবে লর্ডসবুর্গ যাবেন, কিছু বলেছেন?'

'আগামীকাল,' জানাল জিনা।

'কালই বোঝা যাবে, কি মেশানো আছে নুড়িটাতে।'

দশ

লর্ডসবুর্গে পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করলেন উইলসন। 'স্যান জোসেতে চারার অর্ডার দিয়েছিলাম,' বললেন তিনি। 'ওগুলো ডেলিভারি নিয়ে বিল্ডারস সাপ্লাই কোম্পানিতে যাব, কাজ আছে। ঠিক একটায় এখানে থাকব, তোমরাও থেকো। লাঞ্চ সেরে তারপর বাড়ি রওনা হব।'

'চাচা, ওদের সঙ্গে আমি যাই?' জিনা অনুরোধ করল।

'যাবে? ঠিক আছে, যাও। কোন রকম গোলমাল পাকিও না আবার। এখানে অবশ্য খনি-টনি কিছু নেই, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি। কখন যে কোথায়...' বাক্যটা

শেষ করলেন না তিনি।

আর কিছু না বলে পোস্ট অফিসে ঢোকার দরজার দিকে এগোলেন উইলসন।

'আগে নুড়িটা দেখাচ্ছ তো?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'তাতে সময় লাগবে। কোথায় পাওয়া গেছে, বলবে নাকি জুয়েলারকে?'

'পাগল। টুইন লেকসে সোনা আছে শুনলে মৌমাছির মত গিয়ে ভিড় করবে লোকে। রিপোর্টারদের জ্বালায় পালানো ছাড়া পথ থাকবে না। দেখি, কিছু একটা বানিয়ে বলে দেব জুয়েলারকে।'

পোস্ট অফিসের দুটো ব্লক পরেই পাওয়া গেল জুয়েলারের দোকান। জানালায় সাইনবোর্ড লেখা ঃ

ঘড়ি মেরামত করা হয়।
পুরানো স্বর্ণ আর রৌপ্য
কেনা-বেচা করা হয়।

'ঠিক এরকম কাউকেই খুঁজছিলাম,' বলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল কিশোর।

মোটা, প্রায় গোলাপী রঙের একটা লোক বসে আছে কাচের পার্টিশনের ওপাশে। চোখে একটা ঘড়ির মেকানিকের লেন্স, ঘড়ি মেরামত করছে লোকটা। তার পাশে একটা শো-কেসে সাজানো রয়েছে রূপার পুরানো জিনিসপত্র, কয়েকটা সোনার টাই-পিন আর আঙটি।

'আপনিই মালিক?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাতের ছোট স্ক্রু-ড্রাইভারটা রেখে চোখ থেকে লেন্স খুলে রাখল লোকটা। হাসল।

পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর। 'সিলভার সিটিতে বন্ধুর ওখানে বেড়াতে এসেছি আমরা। গতকাল পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম, এক বুড়োর সঙ্গে দেখা, খনিজ পদার্থের সন্ধানে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় সে।'

মাথা ঝাঁকাল মালিক। 'আজকাল অনেকেই ঘোরে।'

'লোকটা বলল, তার টাকা দরকার। এটা বের করে দিল,' নুড়িটা বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'বলল, অনেক দিন ধরে আছে তার কাছে। টাকা লাগবে, তাই বিক্রি করে দিতে চায়।'

চোখ তেরছা করে নুড়িটা দেখল মালিক, জোরে জোরে ডলল আঙুল দিয়ে। হাসিটা তেমনি রয়েছে। 'কত দিয়েছ?'

'পাঁচ ডলার,' বলল কিশোর।

'এটা আসল?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'মনে তো হচ্ছে,' ঘুরিয়ে বলল লোকটা। 'স্বর্ণ আছে কিনা বোঝা যাবে এখুনি।' ড্রয়ার খুলে ছোট একটা শিশি আর একটা উখা বের করল সে। উখা দিয়ে ঘষে সরু একটা দাগ কাটল নুড়ির গায়ে, শিশি থেকে এক ফোঁটা তরল পদার্থ ফেলল খাঁজে। 'নাইট্রিক অ্যাসিড,' জানাল সে। 'বেশির ভাগ ধাতুরই বিক্রিয়া ঘটায়, তবে সোনার কিছু হয় না।' কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, সোনা আছে।'

'রেডিমেড সোনা মেলে প্রকৃতিতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমি বলতে চাইছি, প্রসেসিং ছাড়াই খাঁটি সোনা বের করা যায়?'

'সাধারণত অন্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে স্বর্ণ। তবে এটা খুব ভাল পেয়েছ। কোথায় পেল লোকটা, কে জানে।'

'বলেনি,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর।

'হুঁ,' নুড়িটা আবার ফিরিয়ে দিল জুয়েলার। 'কোন বাতিল খনিতে পেয়েছে বোধহয়, ক্যালিফোর্নিয়ার কোন জায়গায় হবে। খনি বন্ধ করে দেয়ার পরেও এসব খনিজ-সন্ধানীরা বহুদিন তার আশেপাশে ঘুরঘুর করে, ছিটেফোঁটা পায়ও মাঝে মাঝেই।'

নুড়িটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর, 'অন্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে বললেন। এটার সঙ্গে কি মেশানো আছে? রূপা-টুপা কিছু?'

'না। লালচে। তার মানে তামা। রূপা থাকলে সবজে দেখাত।' বাক্স খুলে পুরানো একটা টাই-পিন বের করল জুয়েলার। ওক পাতার মত ডিজাইন, খুব হালকা সবুজ একটা ভাব রয়েছে। 'এই যে, এটাতে আছে। অনেকে সবুজ সোনা বলে একে। পঁচিশ পারসেন্ট রূপা, তারমানে এটা আঠারো-ক্যারাট স্বর্ণ। আর এই যে আঙটিগুলো, পঁচিশ-ক্যারাট। বাচ্চাদের জন্যে বানানো হয়েছে। বড়দিনের উপহারের জন্যে কেনে লোকে। তবে খুব নরম, সেটা বলে দিই আমি বিক্রির সময়। তোমার নুড়িটাতে এই জাতের স্বর্ণই আছে।'

'পাঁচ ডলার দাম ঠিক আছে?'

'তা আছে। আজকাল তো একটা প্ল্যাসটিকের টুকরোর দামও এর চেয়ে বেশি। যত্ন করে রেখে দাও। কখনও টাই-পিন বা আঙটি বানাতে ইচ্ছে হলে সোজা চলে এসো আমার কাছে।'

জুয়েলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'খাইছে!' উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারল না মুসা। 'খনিটাতে সত্যি সত্যি সোনা রয়েছে!'

'তামাও,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু অবাক লাগছে, এটাতে রূপার বদলে তামা কেন? রূপা থাকাটাই তো স্বাভাবিক ছিল, কারণ পাওয়া গেছে রূপার খনিতে। সোনা আর রূপা এক খনিতে পাওয়া যায়, এটা জানি আমি, কিন্তু সোনা, রূপা, তামা···নাহ্, মিলছে না।'

'মজার ব্যাপার, না?' জিনা বলল। 'শয়তানের চেলা তো ব্যাটা, ওর ওস্তাদই বোধহয় গোপনে ওকে জানিয়েছে, খনিটার ভেতরে সোনার স্তর লুকানো আছে। ওর বাপ ছিল ফোরম্যান, দক্ষ খনিকার। হয়তো সে-ই খোঁজ পেয়েছিল সোনার, চুপ থেকেছে, ছেলে বড় হওয়ার পর তাকে বলেছে। ব্যস, জনাব ম্যাকআরথার এসে কিনে নিয়েছেন খনিটা। গল্প ফেঁদেছেন, জন্মভূমির জন্যে কেঁদে কেঁদে তার অন্তত চুরচুর হয়ে গেছে, আহারে। মিথ্যুকের বাচ্চা মিথ্যুক!'

'তাই যদি হয়,' কিশোর বলল, 'তাহলে আরও আগেই এল না কেন? তার বয়েস এখন চল্লিশ, আরও বিশ বছর আগেই আসতে পারত। কয়েক বছর আগে সোনার দাম চড়েছিল, তখনও তো আসতে পারত, আর আসার মোক্ষম সময় ছিল সেটাই। কেন এল না?'

'আসেনি যে সেটা জানছি কি করে?' পাল্টা প্রশ্ন করল জিনা। 'পাঁচ বছর আগে

যখন ডাকাত বাড হিলারি খনিতে পড়ে মরল, তখন ম্যাকআরথারও যে আসেনি সঙ্গে, শিওর হচ্ছি কিভাবে? দুজনে পার্টনার হিসেবেই হয়তো এসেছিল। কোন কারণে মতের মিল হয়নি, ঝগড়া লেগেছিল, তাই হয়তো লোকটাকে গর্তে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ম্যাকআরথার।'

'খুব বেশি কল্পনা করছ, জিনা,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'একজন কোটিপতি পুরানো এক খনিতে এক ডাকাতের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে কেন? কোন কারণ নেই। আর যদি ম্যাকআরথার জানেই খনিটাতে স্বর্ণ আছে, তাহলে পার্টনার নেয়ার কোন দরকার নেই। ওই স্বর্ণ তোলার সামর্থ্য তার একারই আছে। আর তার খনি থেকে সে যদি সোনা তোলেই, সেটা বেআইনী কিছু নয়, কাজেই গোপনে তোলার চেষ্টা করার তো কোন কারণ দেখছি না। ওসব বাদ দিয়ে এসো এখন কাজের কথা বলি, বা হিলারির খোঁজ লাগাই।

পকেট থেকে নোটবুক বের করে জোরে জোরে পড়ল রবিন ঃ 'বাড হিলারি, দাগী আসামী, নিয়মিত দু-বার দেখা করেই গায়েব হয়েছে। অনেকগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে সে, বেরি হারবার্ট, বন হিরাম, বার হুম্যান। স্যান কোয়েনটিন থেকে ছাড়া পেয়ে পাঁচ বছর আগে স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে নিখোঁজ হয়েছে। সেটা সম্ভবত জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে। টুইন লেকসে পৌঁচেছে হয়তো মে মাসের কোন এক সময়, লর্ডসবুর্গ থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে।'

'খুব ভাল রেকর্ড লিখেছ, নথি,' প্রশংসা করল কিশোর।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করার মত,' বলে গেল রবিন, 'তার আসল নাম আর ছদ্মনাম, সবগুলোরই আদ্যাক্ষর বি এইচ। লর্ডসবুর্গেও যদি কোন ছদ্মনাম নিয়ে থাকে, এই দুটো অক্ষর দিয়েই হয়তো নাম বানিয়েছে। সেভাবেই খোঁজা দরকার আমাদের। কিশোর, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শুরু করব? ফোন বুক, সিটি ডিরেকটরি, পুরানো খবরের কাগজ, সবই পাওয়া যাবে ওখানে।'

সায় দিল কিশোর।

জিনা চেনে লাইব্রেরিটা। পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল সেখানে। খুব ভদ্রভাবে লাইব্রেরিয়ানকে জানাল কিশোর, এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছে ওরা। তার এক মামা নাকি থাকে এখানে, অনেক দিন কোন খোঁজখবর নেই, তাই আসার সময় কিশোরের মা বলে দিয়েছে, পারলে মামার খোঁজ নিয়ে আসতে। লাইব্রেরিয়ান মানুষটা ভাল, তাছাড়া এমনভাবে অভিনয় করে বলেছে কিশোর, গলে গেলেন। নিজেই উঠে গিয়ে ফোন বুক, সিটি ডিরেকটরি বের করে দিলেন। পাঁচ বছরের পুরানো বই-পত্র নিয়ে লম্বা একটা টেবিলে বসে গেল ওরা। নামের আদ্যাক্ষর বি এইচগুলো খুঁজছে।

বেশিক্ষণ লাগল না। দশ মিনিটেই ষোলোটা নাম পেয়ে গেল। কিন্তু পনেরোজনই লর্ডসবুর্গের স্থায়ী বাসিন্দা। বাকি থাকল একজন, তার নাম বেকার হেইম্যান। পাঁচ বছর আগেরর ডিরেকটরিতে আছে, মাঝখানে কয়েকটা বছর নেই, তারপর একেবারে চলতি বছরের বইতে আবার নাম উঠেছে।

'মাঝখানে কোথাও চলে গিয়েছিল হয়তো,' কিশোর বলল 'আবার' ফিরেছে। আগে যে বাড়ির ঠিকানা ছিল, এখনও তাই আছে।'

'না, ও আমাদের চোর না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'বোঝা যাচ্ছে, কোথাও নামধাম না লিখিয়েই কেটে পড়েছে লর্ডসবুর্গ থেকে আমাদের বি এইচ।'

'থাকার তো কথা মাত্র কয়েক মাস,' রবিন বলল।

'পেয়েছ?' নিজের ডেস্ক থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন লাইব্রেরিয়ান।

'না, স্যার,' হতাশ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'মা বোধহয় ভুল অনুমান করেছে। এখানে আসেইনি মামা। আর এসে থাকলেও হয়তো ডিরেক্টরিতে নাম তোলেনি, ফোন নেয়নি। একটা ব্যাপার অবশ্য...মামা যেখানে যায়, শুনেছি কিছু একটা করে মাত করে দেয়, খবরের কাগজে নাম উঠে যায়। পুরানো কাগজগুলো, স্যার...'

'দেখতে চাও? ওই যে, ওখানে,' দেখিয়ে দিলেন লাইব্রেরিয়ান।

একের পর এক পাতা উল্টে চলল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে, ১০ই মে-তে এসে থমকে গেল। ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ বন্ধ করার খবর ছেপেছে। পড়ে বলল রবিন, 'হুঁ, লর্ডসবুর্গের কাগজেও লিখেছে দেখা যাচ্ছে। হিলারির মৃত্যুর সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ থাকতে পারে?'

'কি জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'হয়তো খবরটা পড়ে কোন কারণে টুইন লেকসে ছুটে গিয়েছিল হিলারি, খনির ভেতরটা দেখতে। গাড়িটা কবে চুরি হয়েছে, লিখে রেখেছ না?'

নোটবুক দেখে জানাল রবিন, 'মে-র এগারো। লর্ডসবুর্গের কাগজে খবর বেরোনোর পরদিন। আর খনির মুখ বন্ধ করার তিন দিন আগে। যোগাযোগ আছে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু কি যোগাযোগ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'খনির মুখ বন্ধ করা হবে জানল চোরটা, তারপর এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল, গাড়ি চুরি করে নিয়ে ছুটে গেল ওখানে গর্তে পড়ে মরার জন্যে? যাতে পাঁচ বছর আর কোন খবর না থাকে তার? আমার মনে হয়, ম্যাকআরথারই তাকে ওখানে দেখা করতে...'

'দূর!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'মুহূর্তের জন্যেও ম্যাকআরথারকে ভুলতে পারো না নাকি তুমি?'

'যে অন্ধকারে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি আমরা,' রবিন বলল। 'আমরা জানি, বাড হিলারি লর্ডসবুর্গে এসেছিল, গাড়ি চুরি করেছিল, টুইন লেকসে সে-ই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। সকালটাই মাটি।'

'পুরোপুরি মাটি না,' সান্ত্বনা দিল কিশোর। নুড়িটা আবার বের করে দেখাল। 'যেদিন এই নুড়িটা পেলাম, সেদিনই বাড হিলারির লাশও আবিষ্কার করলাম। কি যোগাযোগ আছে জানি না, তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, যোগাযোগ কিছু একটা আছেই।'

এগারো

বিকেল নাগাদ র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে উইলসনকে সাহায্য করল ছেলেরা। চারাগুলোকে গোলাঘরের কাছে রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে

রাখল। বাড়ির ভেতরে চলে গেছেন উইলসন।

মিসেস ফিলটারের বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'ডেথ ট্র্যাপ মাইনের কথা আর সবার চেয়ে ওই মহিলাই বেশি বলতে পারবেন।'

'মিসেস ফিলটার?' জিনা বলল, 'হ্যাঁ, তা পারবেন।'

'চলো যাই তাহলে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

অন্য দুজনও এক কথায় রাজি। রাস্তা পেরিয়ে মিসেস ফিলটারের বাড়িতে এসে দাঁড়াল চারজনে, দরজায় ধাক্কা দিল কিশোর।

সাড়া দিলেন মিসেস ফিলটার, ভেতরে যেতে বললেন ছেলেদেরকে।

ভেজানো দরজা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। পথ দেখিয়ে ছেলেদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জিনা। মিসেস ফিলটারকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যস্ত?'

হাসলেন মহিলা, চোখের কোণের ভাঁজগুলো গভীরতর হলো। 'আজকাল আর ব্যস্ততা কোথায়? তবে আমাকে যদি একটু সাহায্য করতে, প্লীজ···আমার ট্রাকে কিছু মালপত্র আছে, যদি নামিয়ে দিতে। মুদীর কাছে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক্ষুণি দিচ্ছি নামিয়ে,' বলল মুসা।

কাঁচা মাটির গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ফিলটারের ট্রাক। বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বোঝাই বাদামী রঙের কাগজে মোড়া প্যাকেট। রান্নাঘরে বয়ে নিয়ে এল ওটা মুসা, নামিয়ে রাখল।

'থ্যাংক ইউ,' বললেন মিসেস ফিলটার। 'বয়েস হয়েছে তো, আগের মত কাজ আর করতে পারি না।' প্যাকেট খুলে শাকসব্জি, রুটি ও টিনের খাবার বের করে তাকে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

হঠাৎ চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস ফিলটার। খনি-খনি খেলা শুরু করেছে আবার ম্যাকআরথার। এটাই আশা করছিলাম। আধ ঘণ্টা আগে তার শহুরে বন্ধুকে নিয়ে ঢুকতে দেখেছি তো।'

'খনি খুঁড়ছে নাকি আবার?' বলল কিশোর।

'দেখেশুনে তা-ই মনে হয় বটে,' সায় দিয়ে বললেন মিসেস ফিলটার। 'বিস্ফারণ ঘটাচ্ছে খনির ভেতরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানেই জন্মেছি তো, ওই শব্দ আমি চিনি, কোনদিন ভুলব না। এই বাড়িতেই বাস করেছি, যখন আমার স্বামী সুপারিনটেনডেণ্ট ছিল। খনির সুড়ঙ্গে ডিনামাইট ফাটার শব্দ কয়েকদিন শুনলেই তোমরাও আর ভুলবে না। কিন্তু সব সময় খনিতে বোমা ফাটায় না ম্যাকআরথার, শুধু সঙ্গী থাকলেই ফাটায়। তার লস অ্যাঞ্জেলেসের বন্ধুকে দেখায় বোধহয়।'

'অদ্ভুত শখ,' রবিন মন্তব্য করল।

'অনেকেরই থাকে এ-রকম,' হাসলেন মিসেস ফিলটার। 'একটা লোককে চিনতাম, তার বাড়ির পেছনে মাঠে তিনশো গজ লম্বা এক লাইন বসিয়েছিল, পুরানো একটা রেলইঞ্জিন কিনে তাতে চালাত। বার বার সামনে-পেছনে করত, চালানোর সময় ড্রাইভারের পোশাক পরে নিত। বেশি টাকা থাকলেই এসব ভূত চাপে লোকের মাথায়। ম্যাকআরথারেরও হয়তো ওরকম কিছু হয়েছে। সারাজীবন বাপের মুখে খনির গল্প শুনে শুনে খনি-খোঁড়ার ভূত চেপেছে আর কি। সেই পুরানো দিনের

স্বাদ পেতে চাইছে। এতে দোষের কিছু দেখি না।'
'এত নির্দোষ ভাবছেন ওকে?' জিনার পছন্দ হলো না মিসেস ফিলটারের কথা।
'দেখো, কিছু মনে করো না, একটা কথা বলি। কোন সময় সহজ ব্যাপারকে ঘোরাল করবে না। তুমি তার সব কাজেই দোষ দেখতে পাও, তাকে পছন্দ করো না বলে। তবে তোমাকেও দোষ দিই না। লোকটা তেমন মিশুক নয়। সীমানায় বেড়া লাগিয়ে ভালই করেছে। যা একটা কুত্তা পোষে, কখন কাকে কামড়ে দিয়ে বিপদ বাধাবে।'
আবার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ।
'মিসেস ফিলটার,' কিশোর বলল, 'সত্যিই কিছু নেই তো খনিতে? মানে কাজের কাজ কিছু করছে না তো?'
জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস ফিলটার। 'ডেথ ট্র্যাপ মাইন শেষ, মরা। চল্লিশ বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে রুপা। তোমরাও হয়তো জানো। খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনেক দিন খুব দুঃসময় গিয়েছিল আমাদের। এখান থেকে চলেই যেতে হলো শেষে বাধ্য হয়ে। এখানে সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলে যেতাম ভাবছ? তারপর রিচার্ড মারা গেল, সে-ও বাইশ বছর আগের ঘটনা। তার বীমার টাকা সব তুলে ফিনিক্সে একটা দোকান দিলাম। ইনডিয়ানদের কাছে মোকাসিন আর গহনা বিক্রি করতাম, কিন্তু ব্যবসার কিছুই বুঝি না, খোয়ালাম সব। দোকান-টোকান বেচে দিয়ে আবার ফিরে আসতে হলো যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে। টেনেটুনে চলছি কোনমতে এখন।' ঘৃণা ফুটল চোখে, বোধহয় নিজের ওপরই। হঠাৎ করেই কোমল হলো তাঁর দৃষ্টি। 'তবে, এখানে আসার জন্যে ছটফট করছিলাম আমি। যেখানে জন্মেছি, অনেকগুলো সুখের বছর কাটিয়েছি, সেখানে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানোর ইচ্ছে কার না হয়? ম্যাকআরথারও বোধহয় তাই চায়। তার ছোটবেলা দেখেছি, নোংরা, ললিপপ চুষত, রঙিন লালা লেগে থাকত সারা মুখে। তখনও অদ্ভুত কিছু ছিল ছেলেটার মধ্যে। কী, ঠিক মনে করতে পারছি না।'
'কিন্তু সত্যি যদি কিছু পাওয়ার আশা করে থাকে ম্যাকআরথার, কোন লাভ হবে না, এটা তো ঠিক?' বলল কিশোর।
'তা ঠিক। কিচ্ছু নেই আর ওই খনিতে।'
'রূপা নেই, কিন্তু যদি স্বর্ণ থাকে? দুটো ধাতু অনেক সময় পাশাপাশি থাকে তো।'
'থাকে। কিন্তু ডেথ ট্র্যাপ মাইনে নেই।'
'তামা?'
'না। শুধু রূপা ছিল, শেষ হয়ে গেছে,' পুরানো দিনের স্মৃতি মনে করেই বোধহয় বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিসেস ফিলটার। 'সব শেষ। এক কালে কি শহরই না ছিল টুইন লেকস, কি আরামেই না ছিলাম আমরা। আবার যদি অলৌকিক কিছু ঘটত, সত্যি সত্যি কিছু পাওয়া যেত খনিটাতে, বুড়ো বয়েসে আবার হয়তো সুখের মুখ দেখতে পারতাম। কিন্তু তা-তো হবার নয়। যাকগে, এসো আমার ছোটখাট জমিদারী দেখাই তোমাদের,' কথাগুলো তিক্ত শোনাল।
ছেলেদেরকে নিয়ে বাইরে বেরোলেন মিসেস ফিলটার। 'এখানে আসার পর

ভেবেছিলাম, দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা করব,' বললেন তিনি। 'কিন্তু পরে দেখলাম কোন দরকার নেই। জিনা লাশটা দেখার পর অবশ্য অবস্থা অন্য রকম হয়েছে। এখন অচেনা লোক আসছে। হ্যাঁ, জিনা, ভাল কথা, তোমার চাচার ছুরি পাওয়া গেছে?'

'নাহ্। নিয়ে গেলে আর কি পায়?'

'পাবে হয়তো কেউ একদিন পাহাড়ের ওদিকে, মরচে-টরচে পড়া অবস্থায়।' হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির উত্তর ধারে পুরানো একটা ঘরের কাছে চলে এলেন মিসেস ফিলটার। বললেন, 'মিলানোর ঘর ছিল এটা। খনির পে-মাস্টার ছিল সে।'

দরজায় ঠেলা দিলেন মিসেস ফিলটার। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ প্রতিবাদ জানিয়ে খুলে গেল দরজা। সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দীর্ঘ দিনের অব্যবহৃত আসবাবপত্র, দেয়ালের প্লাসটার খসা, আলমারির দরজা ভেঙে খুলে ঝুলে রয়েছে। ভেতরে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, কিছু ভাঙাচোরা, কিছু মোটামুটি ভাল।

'অনেকেই অনেক কিছু ফেলে গেছে,' বললেন মিসেস ফিলটার। 'নেয়ার দরকারই মনে করেনি, বোঝা মনে করে ফেলে গেছে।'

'বাড়িগুলো খালি ফেলে রেখেছেন কেন?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'তো কি করব?'

'ভাড়া দিয়ে দিলেই পারেন। অনেক ঝামেলা আছে অবশ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।'

'তা নাহয় করলাম। কিন্তু ভাড়া নেবে কে? লোক কোথায়?'

ঘুরে ফিরে দেখছে ছেলেরা। বালি উড়ছে, বদ্ধ ঘরের পুরানো ভ্যাপসা গন্ধে বাতাস ভারি। জায়গায় জায়গায় ছাতের প্লাসটার খসে পড়েছে, বৃষ্টির পানি চুইয়ে পড়ে আরও বেশি করে নষ্ট হয়েছে ওসব জায়গা। মুসার ভয় হলো, গায়ের ওপরই না ধসে পড়ে।

মরচে ধরা একটা স্টোভের কাছে একগাদা খবরের কাগজ স্তূপ হয়ে আছে, হলদে হয়ে গেছে পুরানো হতে হতে।

কাগজের স্তূপের পাশে গিয়ে বসে পড়ল রবিন। উল্টে দেখল দু-একটা। মিসেস ফিলটারকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যখন জায়গাটা কেনেন, তার আগে থেকেই ছিল? মানে, পাঁচ বছর আগে যখন এলেন?'

'বোধহয় ছিল,' মনে করার চেষ্টা করছেন মিসেস ফিলটার। 'হ্যাঁ, ছিলই। নইলে পরে আসবে কোত্থেকে? আমি তো রাখিনি।'

'ইনটারেসটিং,' গালে আঙুল রাখল রবিন। 'আমি নিতে পারি এগুলো?'

'এই বস্তাপচা পুরানো খবরের কাগজ দিয়ে কি করবে?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস ফিলটার।

'ও খবরের কাগজের পোকা,' হেসে বলল জিনা। 'পুরানো কাগজ জোগাড় করা হবি। কত রকম পাগলই তো আছে দুনিয়ায়। লাশটা পাওয়ার পর দি টুইন লেকসের অফিসে গিয়েছিলাম আমরা। জানার চেষ্টা করেছি কেন এসেছিল বাড হিলারি, কি করছিল। অনেক কিছুই জেনেছি, কিন্তু...'

বার বার জিনার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে কিশোর, কিছু না বলার ইঙ্গিত

করছে, কিন্তু দেখছেই না জিনা।

রবিন বুঝল ব্যাপারটা, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'আমার বাবা খবরের কাগজের লোক। পুরানো কাগজের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। সে জন্যেই নিতে চাইছি। নেব?'

কিছুটা বিস্মিত মনে হলো মিসেস ফিলটারকে। 'নাও। নিয়ে যাও।'

সাবধানে, যেন না ছেঁড়ে এমনিভাবে সাজিয়ে কাগজের গাদা তুলে নিল রবিন। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। বাইরে পড়ন্ত বিকেলের সোনালি রোদ।

'কিছু খাবে তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফিলটার। 'ঠাণ্ডা কিছু?'

'মুসার আপত্তি নেই,' হেসে বলল জিনা।

'চলো। কমলার শরবত আছে।'

মিসেস ফিলটারের ছোট রান্নাঘরে আবার ফিরে এল ওরা। ফ্রিজ খুললেন মহিলা। কিন্তু কমলার রসের বোতল নেই। তাক খোঁজা হলো, আলমারি খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও নেই। 'আরে, গেল কই?' মহিলা তো অবাক। 'দু বোতল ছিল। আমি তো আজ খাইনি। তাহলে?'

সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখা কিশোরের স্বভাব। মুদী দোকান থেকে সদ্য আনা জিনিসগুলো যেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে-তাকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বলল, 'রুটিও একটা কম। আর এক টিন মাছ। আপনি তখন রেখেছিলেন, দেখেছি।'

কিশোরের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা, যেন কথা বুঝতে পারছেন না। তাকের দিকে এক নজর চেয়েই দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে, বাইরে তাকালেন। যেন দেখতে পাবেন, তাঁর খাবারগুলো হাতে নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে কোন লোক।

খবরের কাগজের গাদা নামিয়ে রাখল রবিন। রান্নাঘরের সিংক থেকে তুলে আনল একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো। 'মিসেস ফিলটার, আপনি নিশ্চয় সিগারেট খান না?'

রবিনের হাতের দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস ফিলটার। চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ-কার কাজ? কার এত খিদে পেয়েছে? আমার কাছে চাইলেই পারত, চুরি করল কেন?'

'শুধু খাবারই না,' মুসা বলল, 'হয়তো আরও এমন কিছু দরকার হয়েছে তার, যেটা চাইলে দিতেন না আপনি। আসুন না খুঁজে দেখি। এমনও হতে পারে, চোর এখনও বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।'

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। প্রতিটি ঘর, আলমারি, বিছানার তলা খুঁজে দেখল। চোর নেই।

'তেমন মূল্যবান কিছু নেই আমার, চোরে নেয়ার মত,' বললেন মিসেস ফিলটার। 'আর কিছু খোয়াও যায়নি।'

'শেষ পর্যন্ত তালা আপনাকে লাগাতেই হচ্ছে, মিসেস ফিলটার,' বলল কিশোর। 'এখন থেকে বাইরে বেরোলে তালা লাগিয়ে বেরোবেন।'

'কিন্তু টুইন লেকসে কেউ তালা লাগায় না,' করুণ কণ্ঠে বললেন মহিলা।

'আগে অচেনা কেউ ছিল না, এখন অনেকেই আসা-যাওয়া করছে। কে ভাল কে খারাপ, কি করে বুঝবেন? এই তো, খাবার চুরি করে নিয়ে গেল। একবার যখন করেছে, খিদে পেলে আবারও আসতে পারে। হুঁশিয়ার থাকা ভাল না?'

বারো

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল ওরা। দু-হাতে পাঁজাকোলা করে খবরের কাগজের গাদা নিয়ে এসেছে রবিন।

'কেন এনেছ এগুলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ইতিহাসে ডক্টরেট নেবে নাকি? থিসিস লিখবে?'

'আর আমাকেই বা চুপ করিয়ে দিয়েছিলে কেন তখন?' জিনা অনুযোগ করল।

কারও কথারই জবাব না দিয়ে রবিন বলল, 'বেশির ভাগ কাগজই দা টুইন লেকস। চল্লিশ বছরের আগেও কপিও আছে। তবে এই যে, এটা, ফিনিক্স থেকে বেরোয়, পাঁচ বছর আগের, মে-র নয় তারিখের কপি। দেখো দেখো, হেডলাইনটা দেখো।'

দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'হুম্! নিরাপদ কোথাও বসে ভালমত পড়া দরকার।'

গোপন আর নিরাপদ জায়গা এখানে একটাই গোলাঘরটা। ভেতরে ঢুকে মডেল টি-র ধারে এসে বসল ওরা। কাগজের গাদা নামিয়ে রেখে ফিনিক্স থেকে বেরোনো পেপারটা মেলল রবিন। চারপাশ থেকে ঝুঁকে এল সবাই ওটার ওপর।

জোরে জোরে পড়ল রবিন ঃ

আর্মার্ড ট্রাক লুট।
দশ লক্ষ ডলার নিয়ে পালিয়েছে
মুখোশধারী ডাকাতেরা।

আজ বিকেল তিনটায় নর্থ ইনডিয়ান হেড রোডে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে। ট্রাকটা সিকিউরিটিস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির। মুখোশপরা তিনজন সশস্ত্র ডাকাত অতর্কিতে আক্রমণ করে ড্রাইভার হিনো মারকিং আর গার্ড ডিয়েগো পিটারকিনকে বেঁধে ফেলে, হাত-মুখ বেঁধে রাখে ট্রাকের পেছনে। তারপর দশ লক্ষ ডলার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ডাকাতদের হাতে ছিল কাটা-শটগান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য ঃ সাদা একটা ক্রাইসলার সিডানে করে এসেছিল ডাকাতেরা। ফিনিশিয়ান লোন কর্পোরেশনের সামনে এসে আর্মার্ড ট্রাকটা থামার আগে থেকেই পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল সাদা গাড়িটা। ডাকাতেরা মেঝেতে লুকিয়েছিল। টাকা লুট করে ওরা সাদা গাড়িতে তোলার পর পরই পাশের একটা কার্ড শপ থেকে এক মহিলা বেরিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল, দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ইনডিয়ান হেড রোডের উত্তর দিকে। মুখোশধারীদের চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়নি, তবে মহিলাকে ভালমতই দেখেছে প্রত্যক্ষদর্শী।

মহিলার বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে, হালকা-পাতলা গড়ন, চুল হালকা ধূসর, গায়ের রঙ তামাটে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চিমত লম্বা, ওজন, আন্দাজ একশো তিরিশ পাউণ্ড। গাঢ় রঙের প্যান্ট ছিল পরনে, গায়ে টারটল-নেক সাদা শার্ট। গলায় অস্বাভাবিক বড় একটা ইনিডিয়ান হার ছিল, রূপার তৈরি, নীলকান্তমনি খচিত।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এক মিলিয়ন নিয়ে পালাল?'

'মে-র নয় তারিখ,' বিড় বিড় করল কিশোর। 'পাঁচ বছর আগে। রবিন, তার পরদিনই তো ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ সীল করার কথা বেরিয়েছিল লর্ডবুর্গের কাগজে?'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'এবং এগারো তারিখ গাড়িটা চুরি গিয়েছিল।'

'সেই সময়,' আপন মনেই বলে গেল কিশোর, 'মিসেস ফিলটারের বাড়ি ছিল খালি। আসেননি তখনও টুইন লেকসে। এলেন অক্টোবরে, জায়গা আর বাড়ি কিনলেন। কিন্তু কেউ একজন ছিল তখন ও-বাড়িতে, যে মে-র নয় তারিখে ফিনিক্সে ছিল, যে কাগজটা ফেলে গেছে।'

'বাড হিলারি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'অসম্ভব নয়,' সায় দিয়ে বলল কিশোর। 'লর্ডসবুর্গ থেকে বেশি দূরে না ফিনিক্স। ডেথ ট্র্যাপ মাইন সীল করার মাত্র কয়েক দিন আগে দশ লক্ষ ডলার ডাকাতি হলো, তারপর লর্ডসবুর্গে একটা গাড়ি চুরি হলো, পাঁচ বছর পর খনিতে পাওয়া গেল এক জেলখাটা দাগী আসামীর লাশ। হ্যাঁ, কল্পনা করতে দোষ নেই, হিলারি ওই ট্রাক ডাকাতদের একজন, নয় তারিখে ফিনিক্স ছিল, তারপর লর্ডসবুর্গ থেকে গাড়ি চুরি করে পালিয়ে এসে লুকিয়েছিল টুইন লেকসে। মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি, কেন সে এসেছিল এখানে।'

'লুকাতে,' বলল মুসা।

'না। টুইন লেকসে লুকানোর জায়গা নেই। এখানে নতুন কেউ এলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে যাবে। ধরা যাক, হিলারি ডাকাতদের একজন, তার ভাগের টাকা লুকানোর জন্যে নিরাপদ একটা জায়গার খোঁজ করছিল। মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে শিগগিরই, এমন একটা খনির চেয়ে টাকা লুকানোর ভাল জায়গা আর কোথায় হতে পারে?'

চোখ বড় বড় করে ফেলেছে জিনা। 'কিন্তু রাখলে আবার বের করবে কি করে?'

'বাড হিলারির মত একটা ডাকাতের জন্যে সামান্য কয়েকটা লোহার শিক এমন কি বড় বাধা,' রবিন জবাব দিল।

'টাকাগুলো তাহলে ম্যাকআরথারই পেয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'খনিতে লুকানো থেকে থাকলে সে ছাড়া আর কেউ পায়নি। এজন্যেই কাউকে খনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয়নি ব্যাটা। লাশটা আছে জেনেও বলেনি। সুযোগ মত লুকিয়ে ফেলত লাশটা, তাহলে টাকার কথা আর অনুমান করতে পারত না কেউ। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা তার আগেই গিয়ে দেখে ফেলেছি।'

'সেটা সম্ভব,' বলল কিশোর। 'কিন্তু আপাতত ম্যাকআরথারের কথা ভাবছি না আমরা। হিলারির টুইন লেকসে আসার আরও একটা কারণ থাকতে পারে।'

'কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'হতে পারে, লর্ডসবুর্গের খবরের কাগজে খনিটা সম্পর্কে যা যা বেরিয়েছে, তার চেয়ে বেশি জানত হিলারি। হতে পারে, কেউ তাকে বাতিল খনিটার কথা সব বলেছিল, বলেছিল খনির পরিত্যক্ত জায়গাগুলোর কথা। হতে পারে, সেই লোক হিলারির কুকাজের এক সহকারী।'
'কি বলতে চাইছ?' বুঝতে পারছে না জিনা।
ফিনিক্সের ছোট একটা দোকানে কয়েক বছর চাকরি করে টুইন লেকসে ফিরে এলেন মিসেস ফিলটার, ডাকাতিটার কয়েক মাস পরে। বেশ বড় সাইজের একটা সম্পত্তি কেনার মত টাকা নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। হিলারির সহকারী হতে পারেন না?'
'তু-তুমি পাগল হয়ে গেছ!' উত্তেজনায় কথা স্পষ্ট করে বলতে পারল না জিনা।
'না, তা হইনি,' হালকা গলায় বলল কিশোর। 'যে গাড়িতে করে পালিয়েছিল ডাকাতেরা, সেটার ড্রাইভার ছিলেন মহিলা।'
'ঠিক!' দু-আঙুলে চুটকি বাজাল রবিন। 'ঠিক বলেছ। মহিলার বয়েস ছিল পঞ্চান্ন থেকে যাটের মধ্যে, হালকা ধূসর চুল, গায়ের রঙ তামাটে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, একশো তিরিশ পাউণ্ড ওজন। গলায় রূপার হার, তাতে বসানো নীলকান্তমনি।'
'কি জিনা,' ভুরু নাচাল কিশোর, 'এ-রকম কাউকে চিনি আমরা?'
'কিন্তু...কিন্তু ওরকম আরও অনেক মহিলা থাকতে পারে, আর ওই হার একা মিসেস ফিলটার পরেন না, বাজারে আরও কিনতে পাওয়া যায়। মিসেস ফিলটার একজন অত্যন্ত ভাল মহিলা।'
'ব্যবহার ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাকাতিটা যখন হয়, তখন মহিলা ফিনিক্সে ছিলেন, এটা তো ঠিক। ব্যবসায় নেমে জমানো টাকা সব খুইয়েছিলেন, তারপর চাকরি নিয়েছিলেন ছোট একটা দোকানে, সেখানে কত আর বেতন পেতেন?'
খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার পর কত আর জমানো যায় ওই টাকা থেকে? কিন্তু দেখা গেল বেশ মোটা টাকা নিয়ে ফিরেছেন, ডাকাতির কয়েক মাস পর। কোন কাজ করেন না, অথচ বেশ আছেন এখানে। শান্ত, ভদ্র, আত্মবিশ্বাসী, এতবড় একটা ডাকাতির জন্যে পারফেক্ট চরিত্র। সব চেয়ে বড় কথা, প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে সব কিছু।'
'তাতে কি!' রেগে উঠল জিনা। 'দেখো কিশোর, কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে। কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না।'
'না তা পারব না,' স্বীকার করল কিশোর, 'তবে কতগুলো অদ্ভুত যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি। প্রমাণ খোঁজা শুরু করতে পারি আমরা,' নরম চোখে তাকাল জিনার দিকে। 'আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে পারি। যদি মিসেস ফিলটার ডাকাতিটার সঙ্গে যুক্ত থাকেন...' নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করে গেল সে।
'বলো। থামলে কেন?' চেঁচাল জিনা।

'তাহলে এমনও হতে পারে, বাড হিলারি একা আসেনি টুইন লেকসে। হয়তো···হয়তো টাকা লুকানোর সুযোগই পায়নি।'

'মিসেস ফিলটার ধাক্কা দিয়ে তাকে খাদে ফেলে দিয়েছেন,' জিনার কণ্ঠ কাঁপছে, মুখচোখ লাল, 'এই তো বোঝাতে চাইছ? তুমি···তুমি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ, কিশোর পাশা। তোমার আর কোন কথা শুনতে চাই না,' ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'সত্যি তুমি ভাবছ, মিসেস ফিলটার হিলারিকে খুন করে তার ভাগের টাকাও হাতিয়ে নিয়েছেন?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এমনি কথার কথা বলছিলাম জিনার সঙ্গে। তবে, ডাকাতিটায় ওই মহিলাও জড়িত থাকলে অবাক হব না।'

তেরো

পরদিন সকালে রান্নাঘরে নাস্তা সারল ছেলেরা। তাদের সঙ্গে রয়েছে কেবল জিনা। গভীরভাবে কি যেন ভাবছে কিশোর, তার আনমনা ভাব দেখেই বোঝা যায়। নিজের প্লেটের দিকে চেয়ে জিনাকে বলল, 'ফিনিক্সে মিসেস ফিলটার যে দোকানে কাজ করতেন, দোকানটার নাম জানো?'

'সেটা জেনে তোমার কোন লাভ নেই,' কড়া গলায় জবাব দিল জিনা। 'দোকানটার নাম ছিল "টিড-বিট"। প্রথমে মিসেস ফিলটারই দোকানটা দিয়েছিলেন, ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে পরে বিক্রি করে দেন মিসেস ম্যালকম নামে আরেক মহিলার কাছে। সেই মহিলা মিসেস ফিলটারকে ওই দোকানের সেলসউত্তম্যান হিসেবে রেখে দেয়। মিসেস ম্যালকমেরও টাকাপয়সা বিশেষ ছিল না, দোকানও যা চলত, তাতে বেতন খুব একটা দিতে পারত না।'

'তাই নাকি? মিসেস ফিলটার জমি কেনার টাকা পেলেন কোথায় তাহলে? খোঁজখবর করতে হয়।'

'কিশোর! খবরদার!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল জিনা। 'মিসেস ফিলটারের ব্যাপারে নাক গলাবে না। খুব ভাল মহিলা। আমি পছন্দ করি।'

'এবং ম্যাকআরথারকে অপছন্দ করো,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'জানি। তাতে প্রমাণিত হয় না, হ্যারি ম্যাকআরথার চোর-ডাকাত, আর মিসেস ফিলটার সাধু-সন্ন্যাসী। সত্যি কথা কি জানো, মহিলাকে আমিও পছন্দ করি। কিন্তু একজন রহস্যভেদী হিসেবে আবেগকে প্রশ্রয় দিতে পারি না, দেয়া উচিতও নয়।'

'তাই নাকি।' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল জিনার কণ্ঠে। 'খুব নীতিবান। নির্দোষ একজন ভদ্র-মহিলাকে চোর ভাবতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, 'দেখো, জিনা, মিসেস ফিলটার কি করেছেন না করেছেন, আমি জানি না। কিন্তু এটা তো জানি ডাকাতিটার সময় তিনি ফিনিক্সে বাস করতেন, এবং ঠিক তাঁর মতই একজন মহিলা অংশ নিয়েছিল ডাকাতিতে। তারপর একটা লোক পড়ে মরল এমন একটা

খনিতে, যেটা মিসেস ফিলটারের অতি-পরিচিত। যোগাযোগগুলো খুব বেশি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে না? সে-জন্যেই খোঁজ নিতে চাইছি। শুরুতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে চাই সেই দোকানটায়, টিড-বিটে। শুরুতেই জানা দরকার, টিড-বিটে সত্যি কাজ করতেন কিনা মহিলা।'

'ফোন করো না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল জিনা। 'তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমারও মুখ বন্ধ হবে।'

'তাই করব,' উঠে লিভিং রুমে রওনা হলো কিশোর, টেলিফোন করবে।

ডিরেকটরিতে নাম্বার পাওয়া গেল। ডায়াল করল কিশোর। ওপাশ থেকে সাড়া মিলতে নিজের কণ্ঠস্বর ভারি করে, বয়স্ক লোকের গলা নকল করে বলল, 'টিড-বিট? মিসেস ম্যালকমের সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লীজ?'

দীর্ঘ নীরবতা।

'মিসেস ম্যালকম?' অবশেষে বলল কিশোর। 'লর্ডসবুর্গের বিউটি পারলার থেকে বলছি, আমি হ্যারি কোলম্যান। একজন সেলস-উওম্যান চেয়েছিলাম, দরখাস্ত পেয়েছি, নাম মিসেস রোজি ফিলটার। অভিজ্ঞতার জায়গায় আপনার দোকানের রেফারেন্স দিয়েছে। পাঁচ বছর আগে টিড-বিট ছেড়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ রিজাইন দিয়েছিল...'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। মনযোগ দিয়ে শুনছে ওপাশের কথা।

'পনেরো বছর পর?' এক সময় বলল সে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্যেরা।

'বলেছিলাম না?' ফিসফিস করে বলল জিনা। 'মহিলা বাজে কথা বলেন না।'

জিনার দিকে ফিরেও তাকাল না কিশোর, শুনছে। 'তাই?...হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্ত...হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ মিসেস ম্যালকম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

'কি বলল?' মুসা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না।

'পনেরো বছর কাজ করেছেন ওখানে, মিসেস ফিলটার,' জানাল কিশোর। 'পাঁচ বছর আগে বসন্ত কালে চলে এসেছেন। মিসেস ম্যালকম বললেন, এপ্রিল কি মে মাসে হবে। পরিষ্কার মনে করতে পারলেন না। তবে, রিজাইন দিয়ে আসেননি মিসেস ফিলটার।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে,' যেন কিছুই না ব্যাপারটা, এমনি ভাবে বলল জিনা। 'তাতে কি?'

'তাড়ায়ওনি। ওয়ান ফাইন মরনিং জাস্ট কাজে যাননি। এমন কি টেলিফোনও করেননি। দোকানের এক লোক খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, বাসা ছেড়ে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। কাউকে জানিয়ে যাননি।'

শূন্য চোখে তাকাল জিনা।

সোফায় হেলান দিয়ে ছিল রবিন, সামনে ঝুঁকল। 'পাঁচ বছর আগের বসন্তেই ডাকাতিটা হয়েছিল। কিশোর, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক। হয়তো মিসেস ফিলটারই সাদা গাড়ি ড্রাইভ করেছিলেন। কিন্তু টিড-বিট ছাড়া ও টুইন লেকসে

আসার মাঝের সময়টা কাটিয়েছেন কোথায়?'
'সেটা তাঁকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি না কেন?' প্রস্তাব দিল কিশোর।
'গল্পের ছলে কথা আদায়?' মুসা হাসল। 'তা মন্দ হয় না। টেকনিকটা ভালই তোমার। চলো।'
'তোমাদের মন এত ছোট!' কেঁদে ফেলবে যেন জিনা।
'কিছু মনে করো না, জিনা,' নরম গলায় বলল মুসা। 'তুমি থাকো...'
'না,' জ্বলে উঠল জিনা, 'আমিও যাব। তোমাদের মুখ থুবড়ে পড়া না দেখে ছাড়ব ভেবেছ?'
কিন্তু মিসেস ফিলটারের পিকআপটা গাড়িবারান্দায় নেই। ডেকে, দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া মিলল না।
'মনে হয় শহরে গেছেন,' জিনা অনুমান করল। 'এসো, ঢুকি। একটা নোট রেখে যাব, যেন আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খান।'
দরজা ভেজানো রয়েছে। সোজা রান্নাঘরে চলে এল জিনা। পেছনে এল ছেলেরা।
'মিসেস ফিলটার?' ডাকল জিনা।
সাড়া নেই।
কাগজ-কলমের জন্যে লিভিং রুমে চলে গেল সে। গোয়েন্দারা রান্নাঘরেই রইল। রান্নাঘরটা আগের দিনের মত এত গোছানো নয়, অপরিষ্কার। স্টোভের ওপর হাঁড়ি চড়ানো, খাবারের টুকরো লেগে আছে। সিংকে ময়লা বাসন-কোসন, কোন কারণে ধোয়া হয়ে ওঠেনি বোঝা যায়।
'কিশোর,' লিভিং রুম থেকে জিনার ডাক শোনা গেল, 'মিসেস ফিলটার কোথাও বেড়াতে যাবেন মনে হচ্ছে।'
দরজায় উঁকি দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি করে বুঝলে?'
বেডরুমের খোলা দরজা দেখাল জিনা। ছোট একটা স্যুটকেস উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, পাশে এলোমেলো কিছু কাপড় চোপড়।
খোলা দরজার কাছে চলে এল কিশোর। এক নজর দেখেই বলল, 'তিনি অলরেডি চলে গেছেন।'
'চলে গেছেন?' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা।
হাত তুলে খোলা আলমারি দেখাল কিশোর। 'কাপড় কই? সব নিয়ে গেছেন। ড্রয়ারগুলো কিভাবে খুলে আছে, দেখেছ? খালি। তিনি গিয়েছেন, এবং খুব তড়িৎ-অন্তর্ধান।'
'মানে?' জিনা ঠিক মেনে নিতে পারছে না কিশোরের টিটকারি।
'দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? গতকালও এ-ঘর দেখেছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। এই ঘর তো ভালই, রান্নাঘরে গিয়ে ভালমত দেখো। নোংরা। এঁটো বাসনগুলো পর্যন্ত সিংকে ভেজানো রয়ে গেছে। কোন কারণে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে তিনি ভেগেছেন।'
'কিডন্যাপ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে! খাবার চুরি করেছিল যে, নিশ্চয় ওই ব্যাটা...'

'ঠিক তাই,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তা এজন্যেই বুঝি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে লোকটার সঙ্গে কিডন্যাপ হয়েছেন? কেউ কিডন্যাপ করলে এভাবে স্যুটকেস গোছানোর সুযোগ দেয়?'

'বোধহয় বেড়াতেই গেছেন,' মুসা বলল।

'সন্দেহ আছে। বেড়াতে গেলে এভাবে নোংরা রেখে যেতেন না বাড়িঘর, এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাছাড়া গতকাল ঘুণাক্ষরেও জানাননি বেড়াতে যাবেন।'

'জরুরী কোন কারণে কোথাও যেতে পারেন,' রবিন বলল। 'আমরা যাওয়ার পর হয়তো ফোন পেয়েছিলেন।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, ভ্রূকুটি করল, 'হ্যাঁ, এটা হতে পারে। তবে আরও একটা কারণ হতে পারে। ফিনিক্স থেকে বেরোনো খবরের কাগজটা তুমি দেখে ফেলেছ।'

'কিন্তু কাগজে কি আছে তিনি জানেন না,' প্রতিবাদ করল জিনা। 'তিনি বাড়ি কেনার আগে থেকেই ওগুলো ছিল ওখানে।'

'হয়তো ছিল,' মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। 'কিন্তু তিনি ডাকাতিতে জড়িত থাকলে আর রবিন হাতে নেয়ার পর কাগজটার হেডলাইন নজরে পড়ে থাকলে, জেনে গেছেন কি লেখা রয়েছে। বুঝে গেছেন, গোলমালে পড়তে যাচ্ছেন। কারণ, তুমি, জরজিনা পারকার, কথা বেশি বলতে গিয়ে বলে ফেলেছ মৃত লোকটার ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে বেশি সময় যে লাগবে না আমাদের, এটা না বোঝার মত বোকা তিনি নন। এবং বোঝার পর তাঁর কি করা উচিত?'

'পালানো,' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

'মুখে কিছু আটকায় না তোমাদের।' জিনার চোখে তিরস্কার। 'এতই যদি আত্মবিশ্বাস, শেরিফকে ডাকছ না কেন?'

'ডেকে কি বলব?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'বলব, মিসেস ফিলটার চলে গেছেন? যে কোন স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অধিকার আছে যে কোন স্বাধীন নাগরিকের। ডাকাতির সঙ্গে তিনি জড়িত, এর কোন প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। সবই অনুমান।'

ধুলোয় ঢাকা গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর। মাটির দিকে চোখ রেখে এগোল। এক জায়গায় থেমে বালিতে চাকার দাগ পরীক্ষা করল। পিকআপের চাকার দাগের ওপর অন্য চাকার দাগও পড়েছে। পিছিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠে ম্যাকআরথারের বাড়িমুখো এগিয়েছে।

'অদ্ভুত,' আঙুল দিয়ে ঠোঁটে টোকা দিল কিশোর। 'শহরের দিকে যাননি। অন্য দিকে গেছেন।'

'যদি দাগগুলো তাঁর গাড়ির চাকার হয়ে থাকে,' জিনা বলল।

'তার গাড়িবারান্দায় যে দাগ দেখেছি, তার সঙ্গে মিল তো রয়েছে।'

ধুলোয় ঢাকা পথে চাকার দাগ ধরে ধরে এগোল ওরা। ম্যাকআরথারের গেট ছাড়িয়ে এল। তাদেরকে দেখেই লাফ দিয়ে বেড়ার কাছে চলে এসেছে বিশাল কুকুরটা, বড় বড় লাফ মারছে পেরোনোর জন্যে, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। বেড়া

থাকায় কুকুরটাকে আর বাঁধেনি ম্যাকআরথার। কিন্তু তাকে আর তার মেকসিকান শ্রমিকদেরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ম্যাকআরথারের সীমানার পর শ-খানেক গজ দূরে মোড় নিয়েছে গাড়ি, অনেক আগে রাস্তা ছিল এখানে, ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না এখন। এঁকেবেঁকে তীক্ষ্ণ কয়েকটা মোড় নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা।

'কিন্তু কেন…কেন তিনি পুরানো হ্যামবোনের পথে গেছেন?' বলল জিনা।

'হ্যামবোন?' ফিরে তাকাল কিশোর।

'ওই যে ওখানে, চূড়ার ওদিকে একটা সত্যি সত্যি ভূতুড়ে শহর আছে। ওটার নাম হ্যামবোন। আরেকটা খনি আছে ওখানে, ডেথ ট্র্যাপের মতই মৃত। ওখানে টুইন লেকসের মত স-মিলও নেই, তাই শহরটা পুরোপুরি মরে গেছে। কখনও যাইনি, রাস্তা নাকি খুব খারাপ। তবে ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপ বা ট্রাক হলে যাওয়া যায়।'

'মিসেস ফিলটারের গাড়িটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ,' কিশোর বলল। 'তিনি ওদিকেই গেছেন।'

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মুসা। 'তাহলে আমরা যাচ্ছি না কেন? চিহ্ন ধরে ধরে তাঁকে অনুসরণ করতে পারি। জিনা তোমার চাচার একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ ট্রাক আছে, আর…'

'আর আমি সেটা চালাতেও পারি,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল জিনা। 'তবে সেটা র‍্যাঞ্চ এলাকার মধ্যে, সমতল জায়গায়। এখানে আমি তো দূরের কথা, আমার ওস্তাদ…' হঠাৎ উজ্জ্বল হলো তার চেহারা। 'ঘোড়া নিতে পারি আমরা। মিসেস ফিলটারের কি অবস্থা কে জানে। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারব। ভিকিখালা এখন দয়া করে যদি কিছু খাবার গুছিয়ে দেয়, আর চাচাকে বোঝায়…'

'…তাহলে সত্যিকারের একটা ভূতুড়ে শহরে দেখতে পাব আমরা,' রবিনও উত্তেজিত।

'ভিকিখালাকে বোঝানোর দায়িত্ব তোমার, জিনা,' হেসে বলল মুসা। 'তুমি এক মিনিটে যতগুলো মিছে কথা বলতে পারবে, আমরা তিনজনে মিলে এক বছরেও তা পারব না।'

চোদ্দ

খাবার গুছিয়ে দিতে কার্পণ্য করল না ভিকি। স্যাডল ব্যাগে সেগুলো ঠেসে ভরে নিতে হলো অভিযাত্রীদের।

'খাবার গরম করার সময় খুব সাবধান,' হুঁশিয়ার করে দিল ভিকি। 'পুরো পর্বতটা জ্বালিয়ে এসো না আবার,' বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল সে।

জিনা চড়েছে তার প্রিয় অ্যাপালুসায়। কিশোরেরটা মোটাসোটা মাদী ঘোড়া।

মুসারটা হাড় জিরজিরে। হেসেই বাঁচে না জিনা, ঠাট্টা করে বলেছে, 'দেখো, তোমার যা ওজন, বেচারার মেরুদণ্ড না বাঁকিয়ে দাও।' রবিনেরটা আংকেল উইলসনের তৃতীয় এবং সর্বশেষ, বেশ তেজী একটা ঘোড়া, ধূসর রঙের চামড়ায় সাদা ফুটকি।

মাঝারি কদমে ম্যাকআরথারের গেট পেরোল ওরা। ওদের দেখে যেন পাগল হয়ে গেল কুকুরটা, তার চিৎকারে ফিরে না চেয়ে পারল না দুই মেকসিকান শ্রমিক। ওরা এখন কেবিন রঙ করায় ব্যস্ত।

পাহাড়ী পথ ধরে আগে আগে চলেছে জিনা। তার কাছাকাছি রয়েছে কিশোর, কমেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খাচ্ছে হোঁতকা মাদীটা। তাছাড়া তাল রাখার দিকে থোরাই নজর ঘোড়াটার, তার খেয়াল পথের দুপাশে কোথায় তাজা ঘাস আছে। দেখলেই সেদিকে এগোনোর চেষ্টা। সামলাতে সামলাতে ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে কিশোর। এক সময় হাল ছেড়ে দিল। মনের ভাব ঃ যা খুশি করগে মুটকির বেটি মুটকি।

বাধ্য হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে হলো জিনাকে। কমেটকে ঘুরিয়ে এনে মাদীটার পাশাপাশি হলো, কিশোরের হাত থেকে রাশ নিয়ে জোরে টান দিয়ে দেখিয়ে দিল অবাধ্য ঘোড়াকে কি করে বাগ মানাতে হয়।

জোরে রাশ টেনে ধরে ঘোড়ার মাথা ওপরের দিকে তুলে রাখল কিশোর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে জোর জবরদস্তি করা যায়, কয়েক মিনিট পরই ঢিল দিয়ে দিল। আবার সেই একই কাণ্ড, হাঁটার চেয়ে ঘাস খাওয়ার দিকে মনযোগ বাড়াল ঘোড়া।

'এভাবে গেলে তো সারা দিন লাগবে,' বিরক্ত হয়ে বলল জিনা।

ঘোড়ার পেটে জোরে লাথি লাগাল কিশোর, 'এই মুটকি, হাঁট।'

বড় জোর দশ কদম ঠিকমত এগোল ঘোড়া, তারপর আবার এক পা বাড়ে তো দু-পা পাশে সরে। একটা বাংলা কবিতা মনে পড়ে গেল কিশোরের, বিড়বিড় করল ঃ

এক যে ছিল সাহেব তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার
তার যে গাধা বাহন সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ঢেঁটা
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিন পা যেতে দুবার থামে…
ব্যাপার দেখে এমনি তরো
সাহেব বললেন সবুর করো
মূলোর ঝুঁটো ঝুলিয়ে নাকে…

এ পর্যন্ত বলেই আপনমনে হাসল কিশোর, বলল, 'দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থাও করছি,' বলেই নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। রাশটা জিনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাস্তার পাশ থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল। খুব তাজা আর সবুজ দেখে এক আঁটি ঘাস তুলে নিয়ে বাঁধল লাঠির মাথায়। তারপর আবার ঘোড়ায় চেপে লাঠিটা ধরল ওটার নাকের সামনে, এমনভাবে, যাতে কোনমতেই নাগাল না পায় ঘোড়া।

ব্যস, কাজ হয়ে গেল। ঘাস ধরার জন্যে মাথা উঁচু করে ছুটল ঘোড়া, যতই ছোটে ততই আগে বাড়ে ঘাস, নাগাল আর মেলে না। হাসতে হাসতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো মুসার। জিনা আর রবিনও হাসছে। হাসতে হাসতে রবিন বলল, 'জিনা, তোমার রাশ টানার চেয়ে কিশোরের ঘাস টানার বুদ্ধি অনেক মোক্ষম···হা-হা-হা!'

টায়ারের দাগ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। দু-ধারে পাইনবন, তার ওপাশে পর্বতের ঢালে কি আছে দেখা যায় না। বেলা একটার দিকে নগ্ন চূড়ায় পৌঁছলো ওরা, দ্রুত নেমে চলল হ্যামবোনের ধুলোয় ঢাকা প্রধান সড়ক ধরে। চারপাশে খটখটে শুকনো কাঠের বাড়িঘর, ভাঙাচোরা জানালা, রঙচটা সানশেড। সাইনবোর্ডগুলো পড়া যায় না। পথের ওপর পড়ে আছে বিছানা আর সোফায় মরচে ধরা স্প্রিং, ভাঙা আসবাবপত্র, কাচের টুকরো, ছড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে, আনাচে-কানাচে।

একটা বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল জিনা। এককালে ওটা হ্যামবোনের জেনারেল স্টোর ছিল। বারান্দার রেলিঙের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধল সে।

ছেলেরাও নামল। অনেকক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে শক্ত হয়ে গেছে যেন শরীর। যার যার ঘোড়া বেঁধে, হাত-পা ঝাড়া দিল।

'বাবারে, কি নির্জন,' চার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল মুসা, আশঙ্কা করছে যেন এখুনি একটা ভূত বেরিয়ে আসবে।

'লোক থাকে না বলেই তো ভূতুড়ে শহর বলে,' জিনা বলল। রাস্তার মাথায় বড় একটা ছাউনির দিকে হাত তুলল। বেড়া আর ছাত করোগেটেড টিনের, জায়গায় জায়গায় মস্ত কালো ফোকর। 'শ্রমিকরা নিশ্চয় কাজ করত ওখানে।'

মস্ত ছাউনিটার দিকে এগোল ওরা।

'দেখেশুনে চলবে,' হুঁশিয়ার করল জিনা। 'ওই যে, টিনের টুকরো কাঠের টুকরো পড়ে আছে, ওগুলোর কাছে যাবে না, কোন জিনিস তোলার চেষ্টা করবে না। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে র‍্যাটল স্নেক লুকিয়ে থাকে ওসবের নিচে। ভয় পেলে···'

'জানি কি করে,' বলল মুসা। 'ভেব না। জঞ্জালের ভেতর কিছু খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা।'

ছাউনির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। অনেক আগেই খসে পড়ে গেছে দরজার পাল্লা। উঁকি দিয়ে ভেতরের বিষণ্নতা দেখল সবাই।

'হুঁ, কাঠের মেঝে,' রবিন বলল। 'আমাদের ভার সইতে পারবে?'

'সওয়াতে যাচ্ছে কে,' কিশোর বলল। 'ভেতরে ঢুকছি না আমরা। ট্রাক নেই ওখানে। শুধু ভূতুড়ে শহর দেখতে আসিনি আমরা।' রাস্তায় সরে এসে টায়ারের দাগ পরীক্ষা করল। দাগ ধরে ধরে গিয়ে থামল ছাউনির এক কোণে। উঁকি দিয়ে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, 'ওই তো।'

'কি?' ছুটে এল জিনা।

মুসা আর রবিনও এল।

পিকআপটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'মিসেস ফিলটার!' চেঁচিয়ে ডাকল জিনা। ছুটে গেল গাড়ির দিকে, 'মিসেস ফিলটার! আপনি কোথায়?'

গাড়ির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে জিনা, এই সময় শোনা গেল একটা বিচ্ছিরি টি-র্-র্-র্ শব্দ।

'জিনা! খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

লাফিয়ে পেছনে সরার চেষ্টা করল জিনা, কিন্তু তাড়াহুড়োয় পিছলে গেল পা। ধড়াস করে চিত হয়ে পড়ল বালিতে। ট্রাকের নিচ থেকে উড়ে এল যেন একটা মোটা দড়ি, ছোবল হানল এক মুহূর্ত আগে জিনার পা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। কুৎসিত একটা চ্যাপটা মাথা, হাঁ করা চওড়া চোয়ালে ভয়ঙ্কর দুটো বিষদাঁত।

পাথর হয়ে গেছে যেন জিনা।

পুরো এক সেকেণ্ড লম্বা হয়ে পড়ে রইল সাপটা, তারপর লেজের টির্র্ শব্দ তুলে গুটিয়ে নিতে লাগল শরীর।

'নড়ো না, জিনা,' ফিসফিস করল মুসা। একটা পাথর তুলে নিয়ে নিশানা করে ছুঁড়ে মারল জোরে।

'বাহ্, একেবারে বুলস-আই,' হাততালি দিল রবিন। 'মাথা খতম। বড় বাঁচা বাঁচা গেছে জিনা!'

কোনমতে উঠে দাঁড়াল জিনা, দুর্বল রোগীর মত রক্তশূন্য চেহারা। কাঁপা গলায় মুসার দিকে চেয়ে শুধু বলল, 'থ্যাংক্স্।'

মরে গেছে সাপটা, কিন্তু এখনও শরীর মোচড়াচ্ছে, পাক খাচ্ছে। ধীরে ধীরে থেমে এল নড়াচড়া।

ট্রাকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে নিচু হয়ে তলায় উঁকি দিল মুসা। 'আর না থাকলেই বাঁচি।'

সাপটার পাশ ঘুরে ট্রাকের একেবারে কাছে চলে এল ওরা। কেবিনের ভেতরে উঁকি দিল। মিসেস ফিলটার নেই। খালি। সামনে-পেছনে কোথাও মালপত্র নেই। ইগনিশনের চাবিটাও নেই।

'এখানে এভাবে গাড়িটা ফেলে গেল,' কানের পেছনে চুলকাল রবিন। 'কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না,' জিনা বলল, 'কোথায় যেতে পারে? মালপত্রই বা কোথায়?'

'কোথাও লুকিয়ে নেই তো?' এদিক ওদিক তাকাল মুসা। শহরটা খুঁজে দেখল ওরা। জানালা-দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ঘরের ভেতরে। কিন্তু ভাঙা আসবাব আর ময়লা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। এখানে ওখানে বালিতে পায়ের ছাপ আছে।

মিসেস ফিলটার নেই।

'লোক যাতায়াত আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আবার পিকআপের কাছে এল ওরা। ওদের পায়ের ছাপ ছাড়াও ছাপ আছে। ওগুলো অনুসরণ করে এগোল কিশোর। বিশ গজ দূরে আরেক সেট টায়ারের দাগ দেখা গেল।

'জীপ কিংবা ট্রাক নিয়ে আরও কেউ এসেছিল,' মুসা বলল।

দাগ ধরে এগোল ওরা। শহরের এক কিনারে চলে এল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে আরেকটা সরু পথ, ওরা যেটা দিয়ে এসেছিল তার উল্টোদিকে, এই পথটা মোটামুটি ভাল অবস্থায়ই রয়েছে।

চুপ করে কিছু দেখছে কিশোর। বলল, 'কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা কে জানে। টুইন লেকস থেকে এসেছেন নিজের গাড়ি নিয়ে। আগেই ঠিক করা ছিল অন্য কেউ এখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। নিজের গাড়িটা এখানে ফেলে মালপত্র নিয়ে অন্য গাড়িতে করে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার। জিনা, এ-পথটা কোথায় গেছে?'

'শিওর না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'শুনেছি, ওদিকে মরুভূমি।'

নিচে গাছের মাথায় ধুলোর ঝড় দেখা গেল, ঢালের দিক থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের শব্দ, লো-গীয়ারে চলছে গাড়ি, ফলে গোঁ গোঁ বেশি করছে।

'ফিরে আসছে বোধহয়,' ভুরু কুঁচকে পথের মোড়ের দিকে চেয়ে আছে মুসা।

কিন্তু মিসেস ফিলটার ফেরেনি। একটা জীপ। আলগা নুড়িতে ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না চাকা, এবড়োখেবড়ো পথের ঝাঁকুনি আর খাড়াই গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে একজন বয়স্ক লোক, মাথায় ছড়ানো কানাওয়ালা খড়ের তৈরি হ্যাট। পাশে বসা এক মহিলা, পরনে ছাপার সুতি পোশাক।

'হাই!' পাশে এসে গাড়ি থামাল লোকটা। হাসল।

'হাই,' হাত তুলে জবাব দিল মুসা।

'তোমরাই শুধু?'

মাথা নোয়াল মুসা।

'বোতল শিকারে এসেছ নিশ্চয়?'

'বোতল শিকার?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রবিন।

'আমরা সে-জন্যেই এসেছি,' মহিলা বলল। 'সেই ক্যাসা ভারডে থেকে। এসব পুরানো জায়গায় মাঝেসাঝেই পুরানো আমলের চমৎকার সব বোতল পাওয়া যায়। তবে খোঁজার সময় সতর্ক থাকতে হয়। হাত দেয়া উচিত না। লাঠি দিয়ে সরিয়ে নেয়াটাই ভাল। নইলে সাপের যা আড্ডা এসব পোড়ো জায়গায়।'

'জানি,' বলল কিশোর। 'আচ্ছা, আরও লোক আসে নাকি এখানে?'

'হয়তো আসে,' জবাব দিল লোকটা। 'রাস্তা খুব খারাপ নয় সেটা একটা কারণ। আর বোতল না পাওয়া গেলেও, অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়। গত হপ্তায় অন্য একটা গোস্ট টাউনে গিয়েছিলাম। পুরানো আমলের একটা কেরোসিনের ল্যাম্প পেয়েছি, প্রায় নতুন।'

জীপটা চালিয়ে নিয়ে জেনারেল স্টোরের সামনে রাখল সে।

'টায়ারের দাগের ব্যাপারে আর শিওর হওয়া যাচ্ছে না,' হাত নাড়ল রবিন। 'যে দাগ ধরে এলাম এখানে, সেটা কোন অ্যানটিক শিকারিরও হতে পারে।'

'হুঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'মিসেস ফিলটারকে খুঁজে বের করার আর কোন উপায় দেখছি না।

পনেরো

খাবার গরম করে খেয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা। গতি ধীর। রাস্তা খুব খারাপ, পিছলে পড়ে হাড়গোড় ভাঙার ইচ্ছে নেই কারও। কাছাকাছি রয়েছে ওরা। প্রাণের ভয় সবারই আছে, জানোয়ারগুলোও তাই খুব সর্তক, কিশোরের হোঁতকাটাও আর ঘাসের লোভ করছে না এখন।

'বিশ্বাস হচ্ছে না,' এক সময় বলল কিশোর। 'মিসেস ফিলটারের মত মহিলা আতঙ্কিত হয়ে পালাবেন...'

'সব তোমার অনুমান,' জিনা বলল। 'তাঁর আসলে কি হয়েছে কে জানে।'

'একটা ব্যাপারই হয়েছে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'যেই বুঝতে পেরেছেন তাঁকে সন্দেহ করা হচ্ছে, অমনি পোঁটলা বেঁধে পালিয়েছেন। এমনও হতে পারে, টুইন লেকসে তাঁর কোন সঙ্গী ঘোরাঘুরি করছিল কদিন ধরে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ছুরিটা এখনও পাওয়া যায়নি।'

মুসার মুখ উজ্জ্বল হলো। 'হ্যাঁ, তাই তো। ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। মিসেস ফিলটারই হয়তো সে-রাতে চোরটাকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

'খাবার চুরির রহস্যটাই বা কি?' রবিন বলল। 'আর সিগারেটের গোড়া?'

'কি?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'হতে পারে চোরটা তখনও মিসেস ফিলটারের ঘরেই ছিল, আমরা যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খিদে পেয়েছিল, তাই আমরা ঘর থেকে বেরোতেই খেয়ে নিয়েছে সে। মনে করে দেখো, খাবার নেই এ-ব্যাপারটা প্রথমে মিসেস ফিলটারের চোখে পড়েনি, কিশোর বলার পর...'

'চমৎকার যুক্তি, রবিন,' বলল কিশোর। 'ঠিক পথেই ভাবছ।'

'তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' রেগে গেল জিনা।

'উত্তেজিত হয়ো না জিনা,' কিশোর বলল। 'সবই আমাদের অনুমান। অনেকগুলো উদ্ভট ব্যাপার ঘটছে তো। পাঁচ বছরের পুরানো একটা লাশ পেলাম খনিতে, পাঁচ বছর আগের এক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল লোকটা। সন্দেহভাজন বিধবা মহিলা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। গাছ কাটার একটা ছুরি চুরি গেল, ডাকাতদের সঙ্গে এটারও কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। একটা বাতিল রূপার খনির মুখ খুলে খনি-খনি খেলা শুরু করেছে এক আধপাগলা কোটিপতি। কুড়িয়ে পেলাম একটা সোনা মেশানো নুড়ি। অথচ, মিসেস ফিলটারের কথামত এক আউন্স সোনা থাকার কথা নয় খনিতে।'

'হয়তো মিছে কথা বলেছেন,' মুসা বলল।

'কেন বলবেন? ম্যাকআরথারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হলো না।'

'যদি টাকাগুলো খনিতে লুকানো থাকে? মিসেস ফিলটারের সে কথা জানা থাকলে, ম্যাকআরথারের মতই চাইবেন খনিতে কেউ না ঢুকুক।'

এরপর বাকি পথটা প্রায় নীরবে পেরোল ওরা, বিশেষ কোন কথা হলো না। শেষ বিকেলে এসে নামল উপত্যকায়। ম্যাকআরথারের লাল ট্রাকটা নেই। কেবিনের কাছে পড়ে রয়েছে রঙের বালতি, কিন্তু মেকসিকান শ্রমিকেরা অদৃশ্য। বিকেলের সোনালি রোদে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন বিশাল কুকুরটা।

স্তব্ধ নীরবতার মাঝে শুধু ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ, বেশি হয়ে কানে বাজছে। বেড়ার কিনার দিয়ে এল ওরা। কিন্তু কুকুরটার খবরই নেই যেন, ঘুমাচ্ছে।

'অদ্ভুত তো,' কিশোর বলল। 'এতক্ষণ তো বেড়া ভাঙার চেষ্টা করার কথা।'

র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়াগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে রাখল ওরা। বাড়ির সদর দরজা খোলা। রান্নাঘরের টেবিলে একটা নোট পাওয়া গেল, মিস্টার উইলসন লিখে রেখে গেছেন ঃ

> ডিকির বোন জরুরী
> খবর দিয়েছে। তাকে
> নিয়ে সিলভার
> সিটিতে গেলাম।
> ফিরতে রাত হবে।
> ঠাণ্ডা খাবার দিয়েছি
> কোনমতে আজ
> ডিনার সেরে নিও।
> —লাভ, আঙ্কেল
> উইলসন।

'দারুণ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ।

'আমার কাছে তো দারুণ লাগছে না,' জিনা বলল 'তোমার হয়েছে কি, কিশোর. ডিকিখালার বোনের শরীর খারাপও তো হতে পারে?'

'না হলেই খুশি হব,' অন্তর থেকেই বলল কিশোর।

'খুশি হয়েছি কেউ নেই দেখে। মিসেস ফিলটার নেই, ম্যাকআরথারের ট্রাকটা নেই—তারমানে সে-ও নেই, তার শ্রমিকেরা নেই। আঙ্কেল উইলসন আর ডিকিখালাও নেই। দারুণ বলব না? খনিতে ঢোকার এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর পাব?'

পকেট থেকে নুড়িটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খপ করে ধরল আবার সে, সঙ্গীদের দিকে তাকাল। 'চলো, এখুনি। এমন সুযোগ আর পাব না। দেখি গিয়ে কি মেলে খনিতে।'

'কুত্তাটা?' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'কেউ না থাকলেও ওটা তো আছে।'

'ব্যবস্থা করছি,' ফ্রিজের কাছে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল জিনা। ভেড়ার আস্ত এক রান বের করে নিয়ে বলল, 'বাঘা কুত্তার ওষুধ। অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকবে।'

কয়েক মিনিট পর ম্যাকআরথারের বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। কুকুরটা এখনও ঘুমাচ্ছে।

'সেৎসি মাছি কামড়েছে নাকি ব্যাটাকে?' মুসা বলল।

'সেৎসির কামড়ে কুকুরের কিছু হয় না,' জানাল রবিন। 'শুধু মানুষ আর গাধার

ওপর কাজ করে ওদের বিষ।'

'খাইছে! গাধা আর মানুষ তাহলে এক টাইপের প্রাণী? ইজ্জত গেল। হেই কুত্তা, হেই বাঘা। ওঠ, ওঠ।'

'এই যে তোর খাবার নিয়ে এসেছি,' ভেড়ার ঠ্যাঙটা নাড়ল জিনা।

কিন্তু নড়লও না বাঘা।

আবার ডাকল মুসা। কিন্তু সাড়া নেই। অবশেষে বেড়া ডিঙাল সে, ওপরে চড়ে লাফিয়ে নামল অন্য পাশে, ম্যাকআরথারের সীমানা ভেতরে।

'সাবধান,' হুঁশিয়ার করল রবিন, 'জেগে উঠে কামড়ে দিতে পারে।'

'জিনা, দেখি রানটা দাও তো,' বলল মুসা। 'ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দাও। কুত্তা মিয়া কখন আবার লাফিয়ে ওঠে।'

রানটা লুফে নিয়ে কুকুরটার দিকে ফিরল মুসা। 'মরে গেল নাকি?'

মুসার মতই বেড়া ডিঙাল তিনজনে। রানটা নিয়ে নিল আবার জিনা। এক সঙ্গে চারজনে এগোল কুকুরটার দিকে।

'এই তো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, রাগে না,' কোমল গলায় বলতে বলতে হাঁটু মুড়ে বলল জিনা। কুকুরটার দিকে হাত বাড়াল।

'হুঁশিয়ার! বাঘা কুত্তা কিন্তু,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

কিন্তু বাঘা কুত্তার ঘুম ভাঙল না। জিনা গায়ে হাত বোলালে মৃদু লেজ নেড়ে শুধু গোঁ গোঁ করল ঘুমের মধ্যেই।

'কুকুরের এত ঘুম?' এদিক ওদিক তাকাল সে। বেড়ার কাছে একটা টিন দেখে এগিয়ে গেল। যা সন্দেহ করেছিল। খানিকটা মাংস অবশিষ্ট রয়েছে এখনও। ওখান থেকেই ঘোষণা করল, 'ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে।'

কে খাওয়াল, দেখার জন্যেই যেন চারদিকে তাকাল অন্য তিনজন। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

'মেকসিকানগুলো গেল কোথায়?' নিচু কণ্ঠে বলল রবিন।

'এই, শুনছেন?' চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। 'কেউ আছেন?' প্রতিধ্বনি তুলে তার ডাকের সাড়া দিল শুধু পাহাড়।

'বোঝা গেছে, কেউ নেই,' উঠে দাঁড়াল জিনা। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে টর্চটা টেনে বের করে বলল, 'চলো, কেউ চলে আসার আগেই ঢুকে পড়ি।'

খনিমুখের দিকে এগোল সে। অন্ধকার একটা কালো গহ্বর, ভেতরের কিছুই চোখে পড়ছে না। সূর্য ডোবেনি, তবে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার নামছে তাই উপত্যকায়।

ভেতরে ঢুকল ওরা।

আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল জিনা। 'কি করেছে ব্যাটারা? বোমা মেরেছে কোন জায়গায়?'

'আসিনি এখনও সে-জায়গায়,' কিশোর বলল। 'আরও ভেতরে ঢুকতে হবে। চাপা আওয়াজ হয়েছে, তারমানে অনেক গভীর থেকে বেরিয়েছে। চলো, যে জায়গায় নুড়িটা পেয়েছি সেখানে।'

জিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আগে আগে চলল কিশোর। আগের বারের মত

পরিষ্কার নয় আর এখন পথ, আলগা নুড়ি আর পাথরে বিছিয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট স্তূপ। পঞ্চাশ ফুট মত এগিয়ে পাওয়া গেল ফোকরটা, এখানেই বোমা মারা হয়েছে। ভেতরে কি যেন চকচক করছে।

'দেখো দেখো,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'সোনা!'

ফোকরে ঢুকল কিশোর। টর্চের আলোয় ঝকঝক করছে হলদে ধাতু। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে টুকরোটা বের করে নিয়ে এল সে। 'আশ্চর্য!'

'মিসেস ফিলটার ভুল বলেছেন,' জিনা বলল। 'খনিটাতে স্বর্ণ আছে।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল চারজনেই।

খনির বাইরে শব্দ। গুলি করেছে কেউ, কিংবা গাড়ির এঞ্জিনের মিসফায়ার।

'কে যেন আসছে,' ফিসফিস করল মুসা।

'চলো ভাগি ,' জরুরী কণ্ঠে বলল জিনা। 'আবার ধরা পড়তে চাই না।'

সোনার টুকরোটা পকেটে রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল কিশোর, অন্যেরাও বেরোল ফোকর থেকে। মোড় নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে প্রধান সুড়ঙ্গে ঢুকতেই অতি আবছা আলো চোখে পড়ল, খনিমুখ দিয়ে আসছে সাঁঝের ফেকাসে সবুজ আলো। টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। পায়ে পায়ে এগোল মুখের দিকে।

কুকুরটা তেমনি শুয়ে আছে, আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। বেড়ার বাইরে টায়ারের শব্দ তুলে থামল একটা গাড়ি। দুজন লোক বেরোল গাড়ি থেকে।

'হ্যারি,' বলল একজন, 'পাথর দিয়ে বাড়ি মারো।'

'দরকার কি?' খসখসে কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় জনের। 'গুলি করলেই তো হয়।'

'তোমার যা কথা না। গুলির শব্দ শুনে ফেলুক কেউ, আর মোটকা শেরিফটাকে খবর দিয়ে দিক। নাও, পাথর নাও।' দূর থেকেও তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাচ্ছে ছেলেরা।

'কিশোর!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'এই ব্যাটাই! ও-ই ঢুকেছিল সেদিন গোলাঘরে। আমাকে কোপ মারার আগে ওরকম করেই শ্বাস ফেলেছিল।

খনির অন্ধকারে পিছিয়ে এল আবার চারজনে।

'কি করি এখন?' জিনা বলল। 'দৌড় দিয়ে পেরোতে পারব না, ধরে ফেলবে। ভাবসাব দেখে মোটেই ভাল লোক মনে হচ্ছে না।'

পাথর দিয়ে বাড়ি মারার ঠনঠন শব্দ কানে এল। খানিক পরই ভেঙে পড়ল গেটের তালা।

'এখনও থাকলে, ওই ঘরেই আছে,' হ্যারির খসখসে কণ্ঠ। 'বিংগো, কি মনে হয় তোমার?'

'না-ও থাকতে পারে,' জবাব দিল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। উঠান পেরোচ্ছে ওরা। 'যথেষ্ট সময় পেয়েছে, সহজেই অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারে।'

'ঘরে না পেলে খনিতে খুঁজব।'

'সেখানে না পাওয়া গেলে চুপ করে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব। সাহেব এলেই ধরব গলা টিপে।

রসিকতায় হাসল দুজনেই। দরজা খোলার শব্দ হলো। কেবিনে ঢুকছে।

'আমাদের দেখে ফেলবে এখানে এলে,' চিঁ চিঁ করে উঠল জিনার কণ্ঠ। 'কোনমতে পালানো দরকার। র‍্যাঞ্চে গিয়ে শেরিফকে ফোন করব।'

'পাগল নাকি?' আঁতকে উঠল মুসা। 'ওদের সামনে দিয়ে? বন্দুক আছে।'

হামাগুরি দিয়ে খনিমুখের কাছে গিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল কিশোর। ছাউনিটার কাছে এক বালতি তরল পদার্থ পড়ে আছে। আরেকটু এগিয়ে তরলের গন্ধ শুঁকল সে, ছুঁয়ে দেখল ছাউনির খটখটে শুকনো কাঠের পাল্লা।

খনিতে ফিরে এল কিশোর। 'রঙ গোলানোর তেল, মেকসিকানরা ফেলে গেছে,' বলল সে। 'ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিলে শহরের কারও না কারও চোখে পড়বে। ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেবে। মুসা, দেশলাই আছে না তোমার কাছে? হ্যামবোনে খাবার গরম করেছিলে যে?'

দেশলাই বের করে দিল মুসা।

ছাউনিতে গিয়ে পালা আর বেড়ার কাঠ তেল দিয়ে ভেজাল যতখানি পারল। কাঠি জ্বেলে তাতে দিল লাগিয়ে। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, চোখের পলকে ছড়িয়ে গেল। সময় মত সরে এল সে।

'চমৎকার!' হাসিমুখে বলল মুসা। 'কাজ না হয়েই যায় না।'

কি মনে পড়তে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি! জলদি ঢোকো!' ধাক্কা দিয়ে জিনাকে সরিয়ে দিল সে আরও ভেতরে, মুসা আর রবিনের হাত ধরে টান দিয়ে নিজে ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে। বিচিত্র ভঙ্গিতে অনেকটা ব্যাঙের মত লাফিয়ে সরে গেল যতটা পারল।

'কি ব্যাপার...' বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।

'ডিনামাইট,' বলেই আরও ভেতরে সরে গেল কিশোর। 'নিশ্চয় ছাউনিতে রেখেছে ম্যাকআরথার।'

তার কথার প্রমাণ দিতেই যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ধরণী।

ষোলো

একের পর এক বোমা ফাটতে লাগল, বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

এক সময় থামল সেটা। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির রেশ মিলাতে আরও কয়েক সেকেণ্ড লাগল।

হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে খনি থেকে বেরিয়ে এল ছেলেরা। খনিমুখের চারপাশে পোড়া কাঠ আর জ্বলন্ত অন্যান্য জিনিস।

'শুধু আগুন চেয়েছিলাম...' উত্তেজনায় কথা রুদ্ধ হয়ে গেল মুসার।

এরপর সাংঘাতিক দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা। বিল্ডিঙের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুই মেকসিকান শ্রমিক। বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল খনিমুখের ওপরে পাথরের স্তূপের আড়ালে। কেবিন থেকে লাফিয়ে বেরোল হ্যারি আর বিংগো। ঠিক এই সময় গেট দিয়ে ঢুকতে শুরু করল ম্যাকআরথারের লাল ট্রাক।

'মিস্টার ম্যাকআরথার,' চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গেল মুসা। 'সাবধান! ব্যাটাদের কাছে বন্দুক আছে।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল হ্যারি।

এক ঝটকায় দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ম্যাকআরথার, হাতে শটগান। 'থামো ওখানে! আর এক পা বাড়ালে···'

কিন্তু থামল না হ্যারি। ম্যাকআরথার বন্দুক সোজা করার আগেই মুসার কাঁধ খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে ফেলল, তার পেছনে চলে এল। গুলি খেলে এখন মুসা খাবে।

পিঠে কঠিন ধাতব স্পর্শ অনুভব করল মুসা।

'বন্দুক ফেলে দাও ম্যাকআরথার,' আদেশ দিল হ্যারি। 'নইলে ছেলেটার পিঠ ফুটো করে দেব।'

ধীরে ধীরে বন্দুক নামাল ম্যাকআরথার, ছেড়ে দিল হাত থেকে।

ছুটে এসে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিল বিংগো, মুখে কুৎসিত হাসি। জিনার দিকে চেয়ে বলল, 'এদিকে এসো, খুকি। জলদি!'

'না, যেও না,' জিনার পথরোধ করে দাঁড়াল রবিন।

'সরো,' ধমক দিল বিংগো। এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় রবিনকে সরিয়ে জিনার কব্জি চেপে ধরল, মুচড়ে হাত নিয়ে এল পিঠের ওপর। ঠেলা দিয়ে বলল, 'হাঁটো।'

দূরে শোনা গেল সাইরেনের তীক্ষ্ণ বিলাপ, ফায়ার ব্রিগেড আসছে।

একে অন্যের দিকে তাকাল হ্যারি আর বিংগো, জিম্মিদেরকে আরও শক্ত করে ধরল।

হ্যামবোনের দিকের পথটা ঠিকমত নজরে আসছে না, সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বিংগো, 'পথটা কোথায় গেছে, খুকি?'

'একটা···একটা ভূতুড়ে শহরে,' জবাব দিল জিনা।

'পাহাড়ের ওদিকে কি আছে?'

'শুধু মরুভূমি,' ভয় পাচ্ছে জিনা, কিন্তু প্রকাশ করছে না।

ম্যাকআরথারের ট্রাকটা দেখাল বিংগো। 'ওতে করেই যেতে পারব। ফোর-হুইল-ড্রাইভ।'

'এসব করে পার পাবে না!' চেঁচিয়ে বলল জিনা।

'চুপ!' ফোঁস ফোঁস করে উঠল বিংগো।

এগিয়ে আসছে ফায়ার ব্রিগেডের সাইরেন।

'জলদি। ট্রাকে।' জিনাকে ঠেলা দিল বিংগো। তাকে সামনে তুলে দিয়ে নিজে উঠল।

মুসাকে নিয়ে হ্যারি উঠল পেছনে।

অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল কিশোর, রবিন আর ম্যাকআরথার। তাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্রাকটা, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।

গেটের বাইরে ছুটে গেল কিশোর আর রবিন। আলো না জেলেই গাড়ি চালাচ্ছে বিংগো, অল্পক্ষণেই হারিয়ে গেল পাইনবনের আড়ালে।

উল্টো দিকে, আঙ্কেল উইলসনের গেটের আরও ওদিকে দেখা যাচ্ছে ফায়ার

ব্রিগেডের গাড়ির লাল আলো।

কয়েক মিনিট পর ম্যাকআরথারের গেটের কাছে এসে থেমে গেল সাইরেন। পেছনেই এসেছেন শেরিফ, হঠাৎ ব্রেক কষায় স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি।

ছাউনির ভস্মস্তূপ দেখলেন শেরিফ। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির হুইলে বসা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জরুরী অবস্থা শেষ। জ্বলার আর কিছু বাকি নেই।' ম্যাকআরথারের দিকে এগোলেন। 'হয়েছিল কি? শহর থেকে তো মনে হলো পুরো পর্বত ধসে পড়ছে।'

দ্রুত সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'ছাউনিতে আগুন দিয়েছিলাম আমি। দুটো লোক তালা ভেঙে মিস্টার ম্যাকআরথারের বাড়িতে ঢুকল, হাতে বন্দুক। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে আগুন লাগিয়েছি, আর কোন উপায় ছিল না। জিনা আর মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। হ্যামবোনের দিকে···লোকগুলোকে বেপরোয়া মনে হলো।'

অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে বললেন শেরিফ, 'জিনাকে নিয়ে গেছে?'

'আর আমার বন্ধু মুসা আমানকেও। গানপয়েন্টে।'

নিজের গালে মস্ত থাবা বোলালেন শেরিফ। 'কতক্ষণ আগে?'

'এই কয়েক মিনিট। তাড়াতাড়ি করলে এখনও ধরা যায়। আলো জ্বালেনি, জোরে চালাতে পারবে না, বেশি দূর যায়নি।'

'আমাকে পিছে দেখলে তখন ঠিকই চালাবে। এভাবে তাড়া করে লাভ নেই। বাচ্চাদুটোর বিপদ বাড়বে আরও।'

'তাইলে পথের ও-মুখে পাহারার ব্যবস্থা করুন, তাড়াতাড়ি। হ্যামবোনে থামবে না ওরা, ওপাশ দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। তার আগেই যদি পথ আটকানো যায়···'

'কোন পথ?'

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। 'কয়টা পথ আছে?'

'হ্যামবোন থেকে ডজনখানেক সরু সরু পথ বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। কোনপথে যাবে ওরা কে জানে। ছোট ছোট কেবিন পাবে, যেখানে খুশি লুকাতে পারবে। মরুভূমির ওদিকেও যেতে পারে। খুব সহজেই এক হপ্তা লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা ইচ্ছে করলে।'

'তাহলে?' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন শেরিফ। জানালা দিয়ে টু-ওয়ে রেডিও বের করে বললেন, 'হাইওয়ে পেট্রোলকে জানাচ্ছি, হেলিকপ্টার নিয়ে আসুক। এছাড়া আর কোন পথ নেই। ঈশ্বরই জানে কি করবে ওরা। তাড়াহুড়ো করে পালানোর জন্যে বাচ্চাদুটোকে না···' বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।

সতেরো

সঙ্গে নেয়ার অনুরোধ জানাল কিশোর আর রবিন। হেসে মাথা ঝাঁকাল হেলিকপ্টারের পাইলট জ্যাক বোরম্যান।

'তোমাদের যাওয়া ঠিক হচ্ছে না,' বললেন শেরিফ। 'গোলাগুলি চলতে পারে।' বললেন বটে, কিন্তু সরে দাঁড়িয়ে ছেলেদেরকে ওঠার জন্যে জায়গাও ছেড়ে দিলেন।

পাইলট আর প্যাসেঞ্জার সিটের মাঝের ছোট্ট পরিসরে গাদাগাদি করে বসল রবিন আর কিশোর। প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলেন শেরিফ, টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো রাইফেলটা রাখলেন কোলের ওপর।

মস্ত ফড়িঙের মত ডানা ফড়ফড় করে আকাশে উঠল কপ্টার।

আকাশে চাঁদ, নিচে উপত্যকায় আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। শূন্যে উঠেই সুইচ টিপল বোরম্যান, ফেকাসে অন্ধকারের চাদর যেন ফুঁড়ে গেল সার্চলাইটের নীলচে-সাদা তীব্র আলোক-রশ্মি। একটা লেভার দেখিয়ে শেরিফকে বলল, 'ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেখানে খুশি আলো ফেলতে পারবেন।'

সামনে ঝুঁকলেন শেরিফ। 'এখনও হয়তো আলো জ্বালায়নি।' লেভার ঘুরিয়ে নিচের ঢালে আলো ফেললেন।

বড় বড় পাথরের চাঙড় কিম্ভূত ছায়া সৃষ্টি করছে। ওপর থেকে আঁকাবাঁকা একটা ফিতের মত লাগছে হ্যামবোনের সড়কটাকে। সবুজ গাছপালার মাঝে এখন প্রায় সাদাই দেখাচ্ছে ওটা।

'ট্রাকটা এখুনি ফেলে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবে না,' বোরম্যান বলল। 'এই পথেই অন্তত হ্যামবোন পর্যন্ত যাবে।'

হঠাৎ মোড় নিল কপ্টার। তৈরি ছিল না, পাক দিয়ে উঠল কিশোরের পেটের ভেতর, এক ধরনের অদ্ভুত শূন্যতা।

টুইন লেকস টু হ্যামবোন সড়কের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু ট্রাকটা পাওয়া গেল না। 'এত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল?' বিশ্বাস করতে পারছেন না শেরিফ। 'তা-ও আবার আলো না জেলে?'

নড়ে উঠল রবিন।

তার দিকে তাকালেন শেরিফ, অভয় দিয়ে বললেন, 'ভেব না, খোকা। আমার অ্যাসিসটেন্ট জীপ নিয়ে আসছে। যাবে কোথায় ব্যাটারা?'

হ্যামবোনে কপ্টার অনেক নিচুতে নামিয়ে আনল বোরম্যান। বাড়িঘরের প্রায় ছাত ছুঁয়ে উড়ে চলেছে।

'ওটা কি?' চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ। 'একটা ট্রাক...খনির ছাউনিটার কাছে।'

ঝুঁকে দেখে বলল কিশোর, 'ওটা মিসেস রোজি ফিলটারের। বিকেলেই দেখেছি আমরা, খালি। মহিলা নেই।'

'কি ঘটছে এসব?'

'আরও অনেক ব্যাপার আছে, পরে সব খুলে বলব। আগে জিনা আর মুসাকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'হ্যামবোন পেরিয়ে গিয়ে থাকলে পশ্চিমের ঢালে কোথায় আছে, কোনও একটা সরু পথে। কিন্তু কোনটায় যে গেল, সেটা বোঝাই তো মুশকিল।'

'একটাই উপায় আছে,' বলতে বলতেই কপ্টারের নাক পশ্চিমে ঘোরাল বোরম্যান। দ্রুত পেছনে পড়তে লাগল ভূতুড়ে শহর হ্যামবোন।

*

মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনছে জিনা আর মুসা। গাছের পাতার ওপর দিয়ে গিয়ে রাস্তায় নামল সার্চলাইটের আলো।

কিন্তু আলো আর ফিরে এল না ওখানে। চলে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের শব্দ।

খিকখিক করে হাসল বিংগো। 'এবার যাওয়া যায়।' এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আবার পথে নামিয়ে আনল ট্রাক। আলো না জ্বেলেই আবার এগিয়ে চলল হ্যামবোনের দিকে।

'একবার বেরোতে পারলে এই হতচ্ছাড়া পথে আর আসছি না,' ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস টানল সে। 'এসে আর লাভও নেই। নিশ্চয় এতক্ষণে জোরেশোরে খুঁজতে শুরু করেছে ম্যাকআরথার, আগে না পেয়ে থাকলে। কিছু যে খুঁজতে গেছি আমরা, নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে।'

'দশ লাখ ডলারের বোঝাটা কতবড়?' জিজ্ঞেস করে বসল জিনা।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল বিংগো, ফিরে তাকাল। 'তোমাকে কে বলেছে?'

চুপ করে রইল জিনা।

সিগারেট বের করে ধরাল বিংগো। 'হ্যারি, এ দুটোকে কোথাও ফেলে দেয়া দরকার। এমন কোথাও, যাতে আর বাড়ি ফিরতে না পারে।'

কেশে উঠে হাত নেড়ে নাকের সামনে থেকে ধোঁয়া তাড়াল জিনা। 'এত বাজে অভ্যাস, এই ধোঁয়া টানা,' বলল সে। 'ফুসফুসের দফা রফা, গলাও শেষ, কথা বললে ব্যাঙের আওয়াজ বেরোয়। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে, আমাদের কোথাও ফেলে যাবে? তাতে কি লাভ? ফিনিক্সে যে তোমরা ডাকাতি করেছ, তিন ডাকাত আর এক ডাকাতনী মিলে, এটা আরও লোকে জানে।'

গুঙিয়ে উঠল হ্যারি। 'অন্য ছেলে দুটো? বোকার মত রেখে এলাম।'

'বোকা নয়,' শুধরে দিল জিনা, 'বলো, গাধার মত। গর্দভচন্দ্র।'

বন্দুক তুলে পেছন থেকে হুমকি দিল হ্যারি। চুপ হয়ে গেল জিনা।

হ্যামবোন থেকে উল্টো দিকের পথ ধরে নেমে চলল ওরা। লো গীয়ারে চালাচ্ছে বিংগো। এক জায়গায় এসে ডানে আরেকটা শাখাপথ বেরিয়েছে, সরু পথ, বেজায় রুক্ষ।

উপচে পড়া অ্যাশট্রেতে সিগারেট টিপে নেভাল বিংগো। মূল সড়ক, যেটাতে রয়েছে সেটা দেখিয়ে জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

পেছন থেকে ডেকে বলল হ্যারি, 'এটা দিয়ে যাওয়া উচিত না, মন সায় দিচ্ছে না। নিচে হাজারখানেক পুলিশ নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে। পাশের রাস্তায় নামো।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি বলল বিংগো, বোঝা গেল না। মোড় ঘুরে পাশের রাস্তায় গাড়ি নামাল। কাঁচা রাস্তা, অনেক কষ্টে যেন ওখানে জন্মানো থেকে নিজেদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে দুপাশের গাছের জঙ্গল। গভীর দুটো খাঁজ, টায়ারের দাগ, তার ওপর মাঝেমাঝেই পাথর পড়ে আছে। ফলে আটকে যেতে চাইছে চাকা; জোর করে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলেই লাফিয়ে উঠছে ভীষণভাবে।

আরেকটা সিগারেট ধরাল বিংগো, কিন্তু টানতে পারল না। গাড়ি সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। গাল দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরল।

'আগুনসহ তো ফেলেছ,' বলল জিনা। 'দেখো, জঙ্গলে দাবানল লেগে যায় নাকি? তাহলে পুরো পুলিশ ফোর্স ছুটে আসবে তোমাদের নাকে লাগাম পরাতে।'

তীক্ষ্ণ টিটকারি নীরবে হজম করল বিংগো, জবাব দেয়ার উপায় নেই, গাড়ি সামলাতে ব্যস্ত।

মুসা আর জিনার মনে হলো অনন্ত কাল ধরে চলেছে তারা ওই পাহাড়ী পথ ধরে। মাঝে মাঝে বনের ভেতর পরিত্যক্ত কেবিন চোখে পড়ছে, কি এক গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে যেন অন্ধকার ঘরগুলো। হ্যামবোনের চেয়ে ছোট আর বেশি ভূতুড়ে আরেকটা শহর পেরোলেন। সামনে এক জায়গায় একটা কয়োট বসে ছিল রাস্তার ওপর, মহাগম্ভীর, কিন্তু হেডলাইটের আলো চোখে পড়তেই ভীতু শেয়ালের মত কুঁই করে উঠে গিয়ে লুকালো পাশের অন্ধকার ঝোপে। মাথার ওপর কয়েক বার হেলিকপ্টারের আলো দেখা গেল। প্রতিবারেই জঙ্গলে ট্রাক ঢুকিয়ে ফেলল বিংগো। কপ্টার দূরে সরার আগে বেরোল না। ঘুমানোর চেষ্টা করল মুসা আর জিনা, কিন্তু যা ঝাঁকুনি ঝিমানোও সম্ভব নয়, ঘুম তো দূরে কথা।

ওপরের দিকে গাড়ি উঠছে তো উঠছেই। কিন্তু অবশেষে বাঁক নিল পথ। সাপের মত এঁকেবেঁকে খানিক দূর নেমে গিয়ে সোজা হলো।

'বোধহয় বাঁচলাম,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বিংগো।

স্টিয়ারিঙে হাতের চাপ যদিও শিথিল করতে পারছে না। ঢিল পড়লেই নাক ঘুরিয়ে গাছের গায়ে গুঁতো মারার জন্যে রওনা দেয় গাড়ি।

চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশে শুধু তারা মিটমিট করছে, ওপরেও ছায়াপথ, নিচেও ছায়াপথ বানিয়ে রেখেছে। যতই নামছে গাড়ি, দু-ধারে সরে যেন বেশি করে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে বন, পথ চওড়া হচ্ছে।

উপত্যকায় নামল গাড়ি। সামনে আড়াআড়ি চলে গেছে আরেকটা পাকা রাস্তা। তার ওপাশে বিস্তৃত মরুর খোলা শূন্যতা।

গাড়ি থামিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল বিংগো। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে, বেড়েছে ফোঁসফোঁসানি।

হেসে বলল হ্যারি, 'পুলিশ নেই। বলেছিলাম না, মেইন রোডে থাকবে ওরা। এদিকে আসব আমরা, কল্পনাও করেনি।'

'এখনও বলা যায় না,' বিংগো খুশি হতে পারছে না। 'রোড ধরে যাবই না।' সোজা চালাল সে। ঝাঁকুনি খেয়ে পাকা রাস্তায় উঠল ট্রাক, রাস্তা পেরিয়ে আবার ঝাঁকুনি খেয়ে নামল মরুভূমিতে।

মাথায় বাড়ি খেয়ে 'আঁউক!' করে উঠল জিনা। মস্ত এক গর্তে পড়ে ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে আবার উঠে পড়েছে গাড়ি। 'জিন্দেগীতে জায়গামত যাবে না এই ট্রাক।'

'চুপ!' ধমক দিল বিংগো। অস্বস্তিতে ভুগছে। ঝাল ঝাড়ল আধপোড়া সিগারেটের ওপর, অ্যাশট্রেতে পিষে মারল ওটাকে। 'যেতেই হবে।' মরুভূমি

পেরোলে সামনে অন্য পথ পাবই। ওখানে পুলিশ থাকবে না।'

শেষ তারাটাও মলিন হলো, মিলাল মহাশূন্যে।

ফিরে তাকাল মুসা, পেছনে পাহাড়ের চূড়ায় লালচে আভা। আঁধার কাটছে দ্রুত। খানিক পরেই উঁকি দেবে টকটকে লাল সূর্য। পাকা রাস্তা এখন অনেক পেছনে।

'সামনে শিগগিরই আরেকটা পথ পাব,' বিড়বিড় করে নিজেকে আশ্বাস দিল যেন বিংগো। 'যেটাতে...হুঁক...'

চোরা গর্তে পড়ে কাত হয়ে গেছে ট্রাক। জোর হিসহিস শোনা গেল, ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল রেডিয়েটর থেকে।

'সব্বোনাশ!' এঞ্জিন বন্ধ করে, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বালিতে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল বিংগো। ঘুরে গিয়ে উঁকি দিল ট্রাকের নিচে। এঞ্জিনের সামনের অংশ থেকে বালিতে পড়ছে মরচে রঙের পানি, ময়লা করছে ধবধবে সাদা বালি।

'কি হলো?' হ্যারির গলার ভেতরটা সিরিশ দিয়ে ঘষেছে যেন কেউ।

'রেডিয়েটর খতম,' অচেনা লাগছে বিংগোর কণ্ঠস্বর। 'অ্যাক্সেল দুই টুকরো।'

গুঙিয়ে উঠল হ্যারি। 'সর্বনাশ!'

জানালার কাছে এসে জিনার দিকে পিস্তল তাক করল বিংগো। 'নামো।' মুসাকে বলল, 'এই, তুমিও।'

'হলো তো এখন?' কালো হয়ে গেছে জিনার মুখ।

'চুপ। নামো।'

নামল দুজনে। হ্যারিও নামল। শূন্য চোখে তাকাল ছড়ানো মরুর দিকে। সামনে দেখিয়ে বলল, 'ওদিকে। পাহাড় পেছনে রেখে সোজা হাঁটব। আগে-পরে পথ পেয়ে যাবই।'

'না,' জেদ ধরল জিনা। 'এখানে হাঁটতেই থাকবে, হাঁটতেই থাকবে, পথ আর পাবে না। তারপর সূর্য উঠলে টের পাবে মজাটা। দেখতে দেখতে একশো ডিগ্রী ছাড়িয়ে যাবে গরম, কাবাব হয়ে যাবে। ট্রাকে বসে থাকাই ভাল।'

'ট্রাকে থাকলে মরব,' বলল হ্যারি।

'বাজে কথা রেখে হাঁটো তো,' আবার ধমক দিল বিংগো।

'না,' বালিতে বসে পড়ল জিনা। 'গুলি করে মেরে ফেললেও আমি যাব না। রোদে কাবাব হওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা অনেক আরামের। গরমে মগজ গলে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

দ্বিধা করল মুসা। তারপর বসে পড়ল জিনার পাশে।

ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাল বিংগো। পিস্তলের হাতলে চাপ বাড়ছে, সাদা হয়ে যাচ্ছে আঙুল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।

জিনা আর মুসার ওপর বার দুই নজর সরাল বিংগো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। ঘুরে রওনা হয়ে গেল সঙ্গীর পেছনে।

নীরবে চেয়ে আছে জিনা আর মুসা।

ছোট হতে হতে যেন ধোঁয়ার ভেতর মিলিয়ে গেল দুই ডাকাতের অবয়ব। দ্রুত চড়ছে সূর্য, গরম বাড়ছে। রাতের শিশিরে ভেজা বালি থেকে বাষ্প উঠতে শুরু করেছে ধোঁয়ার মত।

'হতাশ হয়ে যদি ফিরে যায় ওরা?' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। 'যদি খোঁজা বাদ দেয়? পিপাসায় ছাতি ফেটে মরব!'

আঠারো

জিনা আর মুসা যেখানে রয়েছে, তার থেকে অনেক ওপরে বসে কিশোর আর রবিন দেখল, পর্বতের চূড়া লাল হয়ে উঠছে ভোরের কাঁচা রোদে।

সুইচ টিপে সার্চ লাইট নিভিয়ে দিয়ে বড় করে হাই তুললেন শেরিফ। সারা রাত জেগে থেকে চোখ লাল।

নড়েচড়ে বসল বোরম্যান। সারারাত পাহাড়ের ওপরে আকাশে চক্কর দিয়েছে, আরেকবার দেয়ার জন্যে তৈরি হলো।

'অবাক কাণ্ড!' বলল সে। 'হাওয়া হয়ে গেল নাকি ওরা? কোনও জায়গা তো আর বাদ রাখিনি।'

'গেল কই?' না ঘুমিয়ে আর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে রবিনের মুখ। 'মেইন রোড ধরে নামেনি, তাহলে পুলিশের চোখ এড়াতে পারত না। আরেকটা কপ্টার যে বেরিয়েছে, তারাও কোন খোঁজ পাচ্ছে না। বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'পাহাড়ে জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে আছে,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'অসংখ্য পোড়ো শহর আছে, ছাউনি আছে, তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকলেও আকাশ থেকে দেখব না।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন শেরিফ। 'দেখা যাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, মরুভূমিতে নেমে যায়নি তো? রোড ক্রস করে? সেটা করলে মরবে। পানিও নেই ওদের সঙ্গে, খাবারও নেই।'

'মরুভূমিতে নামলে দেখা যাবে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'তা তো যাবেই। একেবারে খোলা। তবে অনেকখানি জুড়ে চক্কর দিতে হবে।'

হেলিকপ্টারের নাক ঘুরে গেল পশ্চিমে। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল মরুভূমির উদ্দেশে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জিনা।

সাদা হচ্ছে সূর্য, রোদের তেজ বাড়ছে।

শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসছে না জিনার। পঞ্চমবারের মত ঘুরে এল ট্রাকের চারপাশে। ধপ করে বসে পড়ল মুসার পাশে।

ট্রাকের ছায়ায় বসে আছে মুসা। বেশিক্ষণ থাকবে না এই ছায়া, যে হারে দ্রুত

সরছে।

'দুপুর তো হয়ে এল,' বলল জিনা। 'ওরা আসছে না কেন?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ইস্, যা খিদে লেগেছে না। গতকাল দুপুরের পর আর কিছু পেটে পড়েনি।'

'তুমি তো ভাবছ খাওয়ার কথা। আমার যে গলা শুকিয়ে কাঠ, খাবার পেলেও এখন গলা দিয়ে নামবে না।'

'রেডিয়েটরটাও তো লীক হয়ে গেছে। নইলে ওখান থেকে পানি নিয়ে খেতে পারতাম।'

'হুঁ,' কাঁধ নিচু করল জিনা। ঝট করে সোজা হলো পরক্ষণেই, চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মাই গড! হলো কি আমার?'

লাফিয়ে উঠল সে। ইগনিশন থেকে খুলে বের করল ফার্স্ট এইড কিটস। ভেতরে একটা ডাক্তারী কাঁচি পাওয়া গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখচোখ।

'এটা দিয়ে কি করবে?' জিনার আনন্দের কারণ বুঝতে পারছে না মুসা।

কাছেই একটা ব্যারেল ক্যাকটাস দেখাল জিনা। 'ক্যাকটাসের ভেতরে পানি থাকেই। বৃষ্টির সময় শুষে নিয়ে জমিয়ে রাখে শরীরের ভেতর। শুকনো মৌসুমে কাজ চালায়, বেঁচে থাকে। আরও আগেই মনে পড়ল না কেন ভাবছি।'

'বেটার লেইট দ্যান নেভার,' মুসা বলল। 'রসাল জিনিসের সন্ধান যে পাওয়া গেছে এতেই আমি খুশি।' কাঁচিটা নিয়ে দৌড় দিল সে। কুপিয়ে খুঁচিয়ে শক্ত চামড়া কেটে ভেতর থেকে দু-টুকরো নরম শাঁস বের করল। ফিরে এসে একটা দিল জিনার হাতে।

মুখে দিয়েই চেহারা বিকৃত করে ফেলল দুজনে।

'বুঝতে পারছি না কোনটা খারাপ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'পিপাসায় মৃত্যু…নাকি এটা?'

চুষে চুষে সবটুকু রস খেয়ে ছোবড়াটা ফেলে দিল জিনা। মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। ছায়া নেই। 'ট্রাকের নিচে ঢুকতে হবে, আর কোন উপায় নেই,' বলল সে। 'কপ্টার এলে ট্রাকটা দেখতে পাবে, আমরাও তখন বেরিয়ে আসতে পারব।'

ক্রল করে ট্রাকের তলায় চলে এল দুজনে।

'আরে, বেশ ঠাণ্ডা তো এখানে,' হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জিনা।

ক্যাকটাসের রস খেয়ে আর ছায়ায় শুয়ে সামান্য ভাল বোধ করছে ওরা। দূর থেকে ভেসে এল কি এক নাম না জানা মরু-পাখির বিষণ্ণ ডাক।

কনুই দিয়ে আস্তে করে জিনার পাঁজরে গুঁতো দিল মুসা, ইঙ্গিতে দেখাল।

বালির তলা থেকে মাথা তুলেছে একটা ক্যাংগারু-ইঁদুর, সতর্ক চোখে দেখল কয়েক মুহূর্ত, বিপদ নেই বুঝে বেরিয়ে এল। আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে হঠাৎ মস্ত লাফ দিয়ে ছুটে গেল এক দিকে, বোধহয় খাবার দেখতে পেয়েছে।

কোথা থেকে জানি, যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো কয়েকটা গিরগিটি, ট্রাকের নিচে এসে ঢুকল গুটিগুটি পায়ে, খাবার খুঁজছে।

চারপাশে সাদা বালির সমতল বিস্তার, আগুন হয়ে উঠেছে। মরুর তপ্ত বাতাসে একধরনের অদ্ভুত ঝিলিমিলি, মনে হচ্ছে যেন কাঁপছে বাতাস।

সময়ের হিসেব রাখেনি ওরা, ঠিক কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, মাথা তুলল মুসা। কান পেতে শুনছে।

জিনাও মাথা তুলল। 'হ্যাঁ, আমিও শুনছি। অনেক দূরে। কপ্টারের এঞ্জিনই।' চেঁচিয়ে উঠল, 'আসছে, ওরা আসছে!'

তাড়াহুড়ো করে ট্রাকের নিচ থেকে বেরোল দুজনে।

কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দ।

আকাশের দিকে মুখ তুলে আঁতিপাতি করে খুঁজল, কিন্তু গাঢ় নীলের মাঝে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই।

'কিন্তু শুনলাম তো,' হতাশ কণ্ঠে বলল জিনা।

'শুনেছি আমিও,' কান পেতে আছে মুসা।

শোনা যাচ্ছে না আর শব্দটা।

'এদিকে কেন এল না?' কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। 'আর বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। মরব।'

'ভেঙে পড়ছ কেন এখনই? আসবে ওরা...আমাদের খুঁজে বের করবে...' বলল বটে, কিন্তু নিজেই ভরসা পাচ্ছে না মুসা, গলায় জোর নেই।

কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল শব্দটা। দূরে, আওয়াজ বাড়ছে আস্তে আস্তে। সাদাটে-নীল দিগন্তে দেখা দিল কালো একটা বিন্দু।

এগিয়ে আসছে কপ্টার। লাফিয়ে উঠল জিনা আর মুসা, পাগলের মত হাত নেড়ে, চেঁচিয়ে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাল।

দেখতে পেল হেলিকপ্টার। দ্রুত নাক ঘুরিয়ে কাত হয়ে ছুটে এল সাঁ করে।

বালিতে ঘূর্ণিঝড় তুলল কপ্টারের পাখা, তার ভেতর দিয়েই মাথা নুইয়ে দৌড়ে গেল জিনা আর মুসা।

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছেন স্থূলদেহী শেরিফ। 'তোমরা ঠিক আছ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ধাক্কা দিয়ে আরেকটু হলে তাঁকে ফেলেই দিয়েছিল রবিন আর কিশোর, কে আগে নামবে সেই প্রতিযোগিতা। ছুটে এল দু-হাত তুলে। আনন্দে কে যে কাকে জড়িয়ে ধরল সে হুঁশ থাকল না।

সবার আগে সামলে নিল জিনা। শেরিফকে বলল, 'ডাকাতদুটো ওদিকে পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে গেছে।'

'ট্রাক ভেঙে পড়ার পরই ভেগেছে,' যোগ করল মুসা।

তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে কপ্টারে উঠলেন শেরিফ। পাশে কাত হয়ে কিছু বললেন পাইলটকে।

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে রেডিওর ওপর ঝুঁকল বোরম্যান। বোধহয় হাইওয়ে পেট্রোলকে খবর জানাচ্ছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা থাকো এখানে। মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি, আরেকটা হেলিকপ্টার আসছে। ব্যাটাদের ধরতে চললাম আমরা।' পানির একটা ক্যান্টিন বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।

উড়াল দিল আবার হেলিকপ্টার। সোজা পশ্চিমে রওনা হলো হ্যারি আর

বিংগোর খোঁজে।

পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল জিনা আর মুসা।

'আমি শিওর, বেশি দূর যেতে পারেনি ব্যাটারা,' জিনার কণ্ঠে সন্তোষের আমেজ।

উনিশ

ঠিকই অনুমান করেছে জিনা।

বেশি দূর যেতে পারেনি হ্যারি আর বিংগো। এক ঘণ্টা পরই ওদেরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় নামানো হলো ম্যাকআরথারের কেবিনের সামনে উঠানে। দুপাশে পাহারায় রইল পাইলট বোরম্যান আর শেরিফের সহকারী।

করুণ অবস্থা হয়েছে দুই ডাকাতের। রোদে পোড়া, চামড়া, জায়গায় জায়গায় ফোসকা পড়ে গেছে, এতই পরিশ্রান্ত—বসে বসে কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। ভাগ্য ভাল ওদের, হেলিকপ্টারের চোখে পড়েছে, নইলে মারাই যেত। ট্রাক ছেড়ে যাওয়ার পর মাত্র কয়েক মাইল এগিয়েছিল, তাতেই এ-দশা।

ডাকাতদের আগেই টুইন লেকসে ফিরে এসেছে ছেলেরা। হাত-কড়া পরা ডাকাতদের নামতে দেখে আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল জিনা।

আঙ্কেল উইলসন আর ভিকিখালাও রয়েছে ওখানে। মেক্সিকান শ্রমিকদের সহায়তায় সবাইকে স্যাণ্ডউইচ পরিবেশন করছে ভিকি, দিতে একটু দেরি করলেই রেগে যাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর।

আগের রাতেই ফিরে এসেছিল শ্রমিকেরা, সারারাত বসে কাটিয়েছে কেবিনের দাওয়ায়, ভয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। ছেলেদেরকে এখন ঠিকঠাকমত ফিরতে দেখে হাসি ফুটেছে মুখে, স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে ভিকির তাবেদারী।

কেবিনের পাশে চুপচাপ শুয়ে আছে ম্যাকআরথারের কুকুর, দুই ডাকাতের মতই জিভ বের করে নীরবে হাঁপাচ্ছে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়নি এখনও পুরোপুরি।

ম্যাকআরথারকেও তার কুকুরটার মতই দেখাচ্ছে, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত।

'সবাই তো এল,' যেন সভার কাজ শুরু করছে, এমনি ভঙ্গিতে বলল সে, 'দয়া করে কেউ কি বলবেন, ব্যাপারটা কি?' দুই ডাকাতকে দেখিয়ে বলল, 'কি ঘটেছে এখানে?'

ম্যাকআরথারের কথায় কান না দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছিলে। বাড হিলারি সেই চার ডাকাতের একজন, আর এই যে এখানে দুজন। গতরাতে স্বীকার করেছে ওরা।'

'আমরা কিছুই স্বীকার করিনি,' ঘোষণা করল হ্যারি।

'করেছ,' জোরে মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'আমাদেরকে ফেলে দেয়ার কথাও বলেছিলে, যাতে কোনদিন ফিরে আসতে না পারি।'

মিষ্টি করে হাসল কিশোর। 'আমাদের কেস প্রায় শেষ। সব কিছুই খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' আংকেল উইলসনও জানতে চাইলেন। 'আমি তো ঘোর অন্ধকারে। একটু খুলে বলো তো।'

'বলছি,' হাতের বাকি স্যাণ্ডউইচটুকু দুই কামড়ে শেষ করল কিশোর। ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস পানি খেয়ে মুখ মুছে শুরু করল, 'যখন জানলাম, খনিতে পাওয়া লাশটা পাঁচ বছর আগের এক দাগী আসামীর, মনে প্রশ্ন জাগল, ওর মত লোক টুইন লেকসের নির্জন খনিতে কি করছিল? মাইনে কেন ঢুকেছিল? প্রথমেই মনে এল, টুইন লেকসের স্থানীয় পত্রিকাটার কথা। গিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম।

'জানা গেল, পাঁচ বছর আগে এসেছিল বাড হিলারি, খনিতে ঢুকে আর বেরোতে পারেনি, তার আগেই খনির মুখ সীল করে দেয়া হয়। সেদিন একটা পরিত্যক্ত গাড়ি পাওয়া গেল খনির কাছে, লর্ডনবুর্গ থেকে চুরি গিয়েছিল ওটা। অনুমান করলাম, ওই গাড়িতে করেই এসেছিল হিলারি। সুতরাং, গেলাম লর্ডসবুর্গে, তার খোঁজ নেয়ার জন্যে। ওখানকার একটা পত্রিকাতেই ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ সীল করার সংবাদ বেরিয়েছিল, জানলাম সেটা।

'পাঁচ বছর আগে মিসেস রোজি ফিলটার টুইন লেকসে ফিরে এসে সম্পত্তি কিনেছেন। তার অব্যবহৃত একটা ঘরে আরেকটা পত্রিকা পেলাম, পাঁচ বছরের পুরানো, ফিনিক্স থেকে বেরোয়। সেই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল একটা ডাকাতির খবর। পত্রিকাটা ছিল খনিমুখ সীল করার আগের দিনের। তার কয়েক মাস পর এসে সম্পত্তি কিনেছেন মিসেস ফিলটার। আন্দাজ করতে কষ্ট হলো না, পত্রিকাটা বাড হিলারিই এনেছে, খনিতে ঢোকার আগের রাত ওই ঘরে কাটিয়েছে, পরদিন পত্রিকাটা অন্যান্য পত্রিকার স্তূপের ওপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছে। ধরে নিলাম, চার ডাকাতের একজন সে। এখন তো জানি, ঠিকই আন্দাজ করেছি। বাকি দুজন এই যে,' হ্যারি আর বিংগোর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। 'তারপর, গত হপ্তায় পাওয়া গেল হিলারির লাশ। কৌতূহলীরা ছুটে এল দলে দলে। খবরটা শুনে, তুমি, বিংগোও এসেছ। আঙ্কেল উইলসনের গোলাঘরে ঢুকেছিলে রাতে চুরি করে। আমরা যখন দেখে ফেললাম, ছুরি হাতে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকালে খেতে, মুসাকে আরেকটু হলেই শেষ করে দিয়েছিলে। কোন কিছু খুঁজতে ঢুকেছিলে তুমি গোলাঘরে। পাওনি। কাজেই বাধ্য হয়ে তোমাকে থাকতে হয়েছে টুইন লেকসে। কোথায় থাকবে। লোকে তো দেখে ফেলবে। ঠাঁই নিলে গিয়ে মিসেস ফিলটারের অব্যবহৃত ঘরে। তুমিই সেদিন তাঁর রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করেছিলে, সিংকে পোড়া সিগারেটের টুকরো ফেলে গিয়েছিলে। নাকি মিসেস ফিলটারই তোমাকে খাবারগুলো দিয়েছিলেন?'

জবাব দিল না বিংগো।

'যাই হোক,' আবার বলে গেল কিশোর, 'ধারে-কাছেই কোথাও ছিল হ্যারি। কিন্তু তোমার মত সূত্র রাখেনি। ও কোথায় ছিল কে জানে । যাকগে, তক্কে তক্কে ছিলে, গতকাল বিকেলে পেয়ে গেলে সুযোগ। আশেপাশে কেউ নেই। কুকুরটাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ালে। তারপর গিয়ে হ্যারিকে নিয়ে এসে দুজনে খোঁজাখুঁজি

শুরু করলে। হ্যাঁ, ওই যে লুট করেছিলে দশ লাখ ডলার, সেগুলো। তোমাদেরকেও ঠকিয়েছিল হিলারি, না? সব টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিল এখানে। পাঁচ বছর পর খোঁজ পেলে।'

ম্যাকআরথারের দিকে ফিরল কিশোর। 'খনিতে টাকাগুলো পেয়েছেন আপনি, না?'

জোরে মাথা নাড়ল ম্যাকআরথার। 'না। বলেইছি তো, খনির ভেতরে ঢুকে দেখিনি ভালমত। লাশটা পাওয়া যাওয়ার পর অবশ্য শেরিফ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, কিন্তু টাকাটুকা কিছু পাওয়া যায়নি। আসলে কিছুই নেই খনিতে।'

'কিছুই না, মিস্টার ম্যাকআরথার?' পকেট থেকে সোনার টুকরো বের করে শূন্যে ছুঁড়ল কিশোর, লুফে নিয়ে বলল, 'এটাও না? খাঁটি সোনা।'

বিস্মিত হলো ম্যাকআরথার।

'স্বর্ণ?' ভুরু কোঁচকালেন শেরিফ। 'ডেথ ট্র্যাপে সোনা আছে বলে তো শুনিনি?'

'কিন্তু এখন আছে,' মুচকি হাসল কিশোর। 'এটা পেয়েছি…আরেকটা,' পকেট থেকে নুড়ি বের করে দেখাল, 'এই যে, এটাও পেয়েছি। লর্ডসবুর্গে জুয়েলারের দোকানে গিয়ে পরীক্ষাও করিয়েছি, খাঁটি সোনা। তামার সঙ্গে মেশানো।'

তাজ্জব হয়ে গেছেন শেরিফ। 'কিন্তু…কিন্তু ওই খনিতে তো সোনা ছিল না। থাকলে আগে তার চিহ্নও পাওয়া গেল না কেন?'

'সেটাই তো মজা,' হাসল কিশোর। 'তখন আসলেই ছিল না।' পরে পাওয়া সোনার টুকরোটা শেরিফের হাতে দিয়ে বলল, 'খনির দেয়ালে গেঁথে ছিল। ভাল করে দেখুন তো কিছু বুঝতে পারেন কিনা?'

পারলেন না শেরিফ, মাথা নাড়লেন।

'গতরাতে হেলিকপ্টারে বসে ভালমত ভেবেছি,' বলল কিশোর। 'জানি, অন্যান্য ধাতু—এই যেমন, তামা, রূপার সঙ্গে থাকে অনেক সময় স্বর্ণ, কিন্তু তামাই হোক আর রূপাই হোক, এত গায়ে গায়ে মেশামেশি করে থাকে না, এত বেশি পরিমাণে। সন্দেহ হলো। মনে পড়ল টুইন লেকসে এসে পয়লা রাতে গুলির শব্দ শুনেছি।…শেরিফ, আরেকবার ভাল করে দেখুন তো টুকরোটা, কিছু চোখে পড়ে কিনা?'

তালুতে রেখে আরেকবার দেখলেন শেরিফ। 'নকশা।…নকশার মত কি যেন…'

'নকশাই,' মাথা কাত করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কমলা ফুলের কুঁড়ি আঁকা ছিল। বিয়ের আঙটি ছিল ওটা।'

আগে বাড়ল ম্যাকআরথার। 'কোথায় পেয়েছ তুমি ওটা? খনিতে পেয়েছ, বিশ্বাস করতে বলো একথা?'

'আমার চেয়ে আপনিই তো ভাল জানেন। এত অসতর্ক হওয়া উচিত হয়নি আপনার। বাজারে সোনার টুকরোও কিনতে পাওয়া যায়। পুরানো গহনা কিনেই তো ভুলটা করেছেন।' শেরিফের দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'পুরানো এক খেলা খেলতে চেয়েছিলেন মিস্টার ম্যাকআরথার। শটগানের নলে অলঙ্কার ভরে, চেম্বারে

গুলি ভরে ফায়ার করেছেন গিয়ে খনির দেয়ালে। তারপর লোক ডেকে এনেছেন দেখানোর জন্যে যে খনিতে সোনা আছে। যখনই কাউকে দেখাতে এনেছেন, মেকসিকান শ্রমিকদের দিয়ে ডিনামাইট ফাটিয়েছেন ভেতরে, যেন নিয়ম মাফিক খোঁজা হচ্ছে খনি। মনে হয়, বোকা টাকার কুমীরগুলোকে লর্ডসবুর্গে পাকড়াও করেছেন মিস্টার ম্যাকআরথার। ওদের ধরে নিয়ে এসেছেন। দেখিয়েছেন, ডেথ ট্র্যাপে সোনা আছে, টাকা ইনভেস্ট করতে রাজি করিয়েছেন।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' বাধা দিয়ে বললেন আঙ্কেল উইলসন, 'ম্যাকআরথার এ-কাজ করতে যাবে কেন? সে তো কোটিপতি। টাকার অভাব নেই। কেন তৃতীয় শ্রেণীর ঠগবাজি করতে যাবে?'

দাঁত বের করে হাসল, না হুমকি দিল ম্যাকআরথার, বোঝা গেল না। বলল, 'বুঝতে পারছেন না, কারণ আমি এসব করিনি। বাজে গল্প ফেঁদেছে।'

'খনিতে ঢুকলেই প্রমাণ হয়ে যাবে,' বলল কিশোর। 'গল্প না, সত্যি···'

'খবরদার!' রাগে জ্বলে উঠল ম্যাকআরথার। 'আমার খনিতে ঢুকবে না। আগে আমার উকিলকে ডাকছি···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকো,' কঠিন কণ্ঠে বললেন শেরিফ। 'তোমাকে অ্যারেস্ট করছি আমি। দরকার হলে অফিসে গিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব।'

'শেরিফ, আপনি ওই পাগল ছেলেটার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'আমার কাছে তো পাগল মনে হচ্ছে না।'

'থ্যাংক ইউ, শেরিফ,' বলল কিশোর। 'আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' হ্যারি আর বিংগোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ফিলটার কোথায়? তোমাদের সঙ্গে কোথায় দেখা করার কথা?'

'মিসেস ফিলটার?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি।

'আরে, ওই বুড়িটা,' বলল বিংগো। 'ওই যে, ওদিকে ওই বাড়িটায় থাকে।'

অবাক হলো কিশোর। 'তুমি···তোমার···মিসেস ফিলটার তোমাদের দলে ছিলেন না?'

মাথা নাড়ল হ্যারি। ভাবে মনে হলো, সত্য কথাই বলছে।

জোরে জোরে কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'আমি তো ভেবেছিলাম, মিসেস ফিলটারও চারজনের একজন। কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি, শুধু সমস্ত বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যায়। ডাকাতির পর পরই ফিনিক্স থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর, বাড হিলারি আর ডাকাতির ব্যাপারটা যখন তদন্ত করছি আমরা, আবার গায়েব হলেন তিনি।'

চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকআরথার, 'তখন থেকেই বলছি, ছেলেটা পাগল। নইলে মিসেস ফিলটারের মত মহিলাকে সন্দেহ করে?' চকিতের জন্যে খনিমুখের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে শঙ্কার ছায়া।

'আমি না হয় পাগল, কিন্তু আপনি ঘামছেন কেন, মিস্টার ম্যাকআরথার?' ভুরু নাচাল কিশোর। হঠাৎ চাপড় মারল নিজের কপালে। 'আমি একটা আস্ত গাধা, ক্ষমার অযোগ্য, বুদ্ধু। হায়, হায়, কি ভেবেছি? ডাকাতিতে জড়িত ছিলেন বলে তো গায়েব হননি মহিলা! তাঁকে গায়েব করা হয়েছে! মিস্টার ম্যাকআরথার, আপনাকে

চিনে ফেলেছিলেন তিনি, না? আপনার ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কি করেছেন তাঁকে, কোথায় রেখেছেন?'

ঢোক গিলল ম্যাকআরথার। 'আমি কি জানি?' আবার খনিমুখের দিকে তাকাল।

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। শেরিফের গাড়ি থেকে একটা শক্তিশালী টর্চ নিয়ে ছুটল খনির দিকে।

ম্যাকআরথারকে দেখিয়ে গর্জে উঠলেন শেরিফ, 'এ-ব্যাটাকে আটকাও,' সহকারীকে নির্দেশ দিয়েই দৌড় দিলেন কিশোরের পেছনে। তাদেরকে অনুসরণ করল জিনা, মুসা, রবিন, আংকেল উইলসন।

ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল কিশোর। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে অন্যেরা।

যে দেয়ালে সোনার টুকরো পাওয়া গেছে, তার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। মোড় নিয়ে সেই করিডরে ঢুকে পড়ল, যেটার শেষ মাথায় রয়েছে গর্ত, যাতে পাওয়া গেছে হিলারির লাশ।

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর।

খাদের ভেতরে পড়ে আছেন মিসেস ফিলটার। হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল গোঁজা। অসহায়।

বিশ

উজ্জ্বল হলো মিসেস ফিলটারের চোখ।

তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে একটা মই এনে গর্তে নামলেন শেরিফ।

'ইস্, খুব কষ্ট পেয়েছি,' মুখ থেকে রুমাল সরাতেই বললেন মিসেস ফিলটার। 'আমি তো ভাবছিলাম আর বুঝি কেউ আসবেই না।'

হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই স্বচ্ছন্দে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বাঁধা জায়গাগুলো বার কয়েক ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলেন, হাত দিয়ে কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে এসে মই ধরলেন।

মিসেস ফিলটারের স্যুটকেসটা তুলে আনলেন শেরিফ।

'ঠগটা কোথায়?' ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফিলটার।

'মিস্টার ম্যাকআরথার?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'ও ম্যাকআরথার নয়। বাচ্চাটার মাঝে অদ্ভুত কি ছিল, পরে মনে হয়েছে। জন্মের সময়ই ওর চোখ ছিল বাদামী। এমনিতে, নীল চোখ নিয়ে জন্মায় যে কোন বাচ্চা, বড় হলে ধীরে ধীরে চোখের রঙ বদলায়, একেক জনের একেক রকম হয়। কিন্তু ম্যাকআরথারের জন্মের সময় যা ছিল, পরেও তাই রয়েছে, কয়েক বছর তো দেখেছি, এখনও নিশ্চয় ওরকমই আছে। নীল বদলে বাদামী হয়, কিন্তু বাদামী বদলে নীল হয়েছে শুনিনি।'

'লোকটাকে বলেছেন নাকি একথা?'

'বলেই তো পড়লাম বিপদে। বন্দুক ধরে রেখে আমাকে স্যুটকেস গোছাতে বাধ্য করল। এখানে এনে ফেলল। কোথায় সে?'

'বাইরে,' জানালেন শেরিফ। 'আরেকটু পরেই হাজতে ঢুকবে।'
'হাজত তার জন্যে অনেক ভাল জায়গা,' এই শাস্তি পছন্দ হচ্ছে না মিসেস ফিলটারের।
'আপাতত এরচে খারাপ জায়গা আর পাচ্ছি না, মিসেস ফিলটার,' হেসে বললেন শেরিফ। 'পরে অন্য ব্যবস্থা করব।'
আসামীদেরকে হাজতে নিয়ে গেলেন শেরিফ।
সেই বিকেলেই ফিরে এলেন আবার আংকেল উইলসনের র‍্যাঞ্চে, একা। ইতিমধ্যে হ্যামবোনে গিয়ে মিসেস ফিলটারের পিকআপটা চালিয়ে নিয়ে এসেছেন উইলসন আর ভিকি।
উইলসনের ঘরেই রয়েছেন মিসেস ফিলটার, চা খাচ্ছেন বসে।
'কি খবর, শেরিফ?' শেরিফকে দেখে হাসলেন তিনি।
শেরিফও হাসলেন। একে একে তাকালেন তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে। 'ঠিকই বলেছ তোমরা। ওই দুই ব্যাটা ডাকাতিতে জড়িত। এক্কেবারে দাগী আসামী। অপকর্ম এর আগেও অনেক করেছে। চারটে স্টেটের পুলিশ খুঁজছে ওদেরকে। আর হ্যাঁ, বাড হিলারিও ছিল ওদের দলে।'
'হারামীটার কি করলেন?' জানতে চাইলেন মিসেস ফিলটার।
'উকিলকে ফোন করেছে। লাভ হবে কচু। ওর আঙুলের ছাপ নিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছি। আমার ধারণা, পুলিশের খাতায় রেকর্ড মিলবেই। লোক ঠকানোয় ওস্তাদ তো, সেটা একবারে হয়নি। ঠিকই ধরেছেন, ম্যাকআরথার নয় সে, আসল ম্যাকআরথারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এলাম।'
'শুরু থেকেই বলছি, ওটা একটা আস্ত ভণ্ড!' সুযোগ পেয়ে ঝাল ঝাড়ল জিনা। 'কেউ শুনলেন না আমার কথা। পুরানো গাড়িটার কথা যখন মিথ্যে বলল, তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার চাচার।'
'যা হবার হয়েছে, মিস জিনা, ভুল স্বীকার করছি, যাও,' হাত-জোড় করে দেখিয়ে জিনার রাগ কমালেন শেরিফ। 'এখন তো ধরা পড়েছে। সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি, বাড়ি তল্লাশি করব ওর।'
'আরও প্রমাণ খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'হ্যাঁ। এবং দশ লাখ ডলার।'
খবরটা হজম করার সময় দিলেন সবাইকে, তারপর বললেন, 'হ্যারি আর বিংগো মুখ খুলেছে। ওদের সঙ্গে যে মেয়েমানুষটা ছিল, তার নাম ভিকি নরমা···না না, ভিকি, তুমি চমকে ওঠো না, তুমি না। আরেকজন। জেলে পচছে এখন। ডাকাতি করে সোজা লর্ডসবুর্গে গিয়ে এক হোটেলে উঠেছিল চারজনে। কিন্তু পরদিন অন্য তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে সব টাকা নিয়ে কেটে পরে চোরের সর্দার বাড হিলারি। পালিয়ে আসে টুইন লেকসে। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পায়নি সহকারীরা। ইতিমধ্যে আরেক চুরির কেসে ফেঁসে গিয়ে ধরা পড়ল ভিকি। কিন্তু হ্যারি আর বিংগোকে ধরতে পারেনি পুলিশ। তারা হিলারির লাশ পাওয়া গেছে শুনে ছুটে এসেছে টুইন লেকসে, টাকার সন্ধানে।'
'কিন্তু ম্যাকআরথার পেয়ে গিয়ে যে কোথাও লুকিয়ে রাখেনি, কি করে

জানছেন?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'না, তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এত টাকা পেলে ও ঠগবাজি করার জন্যে আর এখানে বসে থাকত না এক মুহূর্তও। টাকাগুলো নিয়ে সোজা নিখোঁজ হয়ে যেত। আমি ডাকাত হলে অন্তত তাই করতাম।'

'আমিও,' শেরিফ বললেন। 'সে-জন্যেই ভাবছি, টাকাগুলো কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে। কিন্তু কোথায়? খনিতে নেই, আমি শিওর। লাশটা পাওয়ার পর খনির ভেতরে কোথাও খোঁজা বাদ রাখিনি, টাকা খুঁজিনি অবশ্য, সূত্র খুঁজেছি।'

'মিসেস ফিলটারের কোন ঘরে লুকায়নি তো?' বলে উঠল জিনা। 'ওখানেই তো প্রথমে উঠেছিল হিলারি।'

'অসম্ভব না,' একমত হলো মুসা। 'চলো, খোঁজা শুরু করি। আরিব্বাপরে, দশ লাখ। জিন্দেগীতে এক সঙ্গে চোখে দেখিনি।'

'এর চেয়ে অনেক বেশি দেখেছ, জলদস্যুর দ্বীপে,' মনে করিয়ে দিল জিনা।

'সে তো সোনার মোহর, নগদ টাকা না।'

প্রথমে মিসেস ফিলটারের বাড়ি থেকে শুরু করল ওরা। এক ঘরে একটা সোফার নিচে পাওয়া গেল আঙ্কেল উইলসনের হারানো ছুরি। কিন্তু টাকা নেই।

খনিতে খোঁজা হলো আরেকবার।

খনির কাজকর্মের বিল্ডিং, নকল ম্যাকআরথারের কেবিন, চিরুনি দিয়ে উকুন খোঁজার মত করে খোঁজা হলো। তার বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল ঃ বেশ কিছু ধনী লোকের নাম ঠিকানার তালিকা, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বই—ধাপ্পা দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওসব অ্যাকাউন্টে জমা করত ঠগটা। কিন্তু লুটের টাকা পাওয়া গেল না।

কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। শেরিফ বেরিয়ে আসতেই বলল, 'আর একটা মাত্র জায়গা আছে।'

'কোথায়?' ভুরু কোঁচকালেন শেরিফ।

'আংকেল উইলসনের গোলাঘরে।'

হই হই করে ছুটল সবাই।

ধুলো আর মাকড়সার জালে ঢাকা কোণা-ঘুপচি কিছুই বাদ দেয়া হলো না। কিন্তু পাওয়া গেল না টাকা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে পুরানো টি-মডেলের দিকে এগোল কিশোর। কি ভেবে ঢুকে গেল ভেতরে। শেরিফের কথা কানে আসছে, 'বোধহয় টাকাগুলো অন্য কোথাও রেখে এসেছিল ব্যাটা, টুইন লেকসে আনেইনি...'

প্রথমেই পেছনের সীটে চাপ দিল কিশোর।

নড়ে উঠল গদি। আলগা।

হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল গদি। চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

ছুটে এল সবাই। হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়ল জিনা আর মুসা, অন্যেরা পারল না, জায়গা নেই।

'আরিব্বাপরে! এত টাকা?' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'যাক বাবা, চোখ সার্থক হলো।'

সুন্দর পরিপাটি করে অনেকগুলো বাণ্ডিল করা হয়েছে নোটের তাড়া দিয়ে, যত্ন করে ভরেছে প্ল্যাসটিকের ব্যাগে।

একটা ব্যাগ ছিঁড়ল কিশোর। পাঁচ বছর পরেও আনকোরাই রয়েছে বিশ ডলারের নোটগুলো, তাজা গন্ধ আসছে।

'গুণতে কদিন লাগবে? মুসার প্রশ্ন।

'ঈশ্বরই জানে,' হাত নাড়লেন শেরিফ। বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ির জানালায় নাকমুখ চেপে রেখেছেন, ধুলো-ময়লায় যে মাখামাখি হচ্ছে খেয়ালই নেই।

একুশ

কয়েক দিন পর। রকি বীচে ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এসেছে দেখা করতে, সেই সাথে লেটেস্ট কেসের রিপোর্ট দিতে।

'কি ব্যাপার?' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বললেন চিত্রপরিচালক। 'টেলিফোনে তো বললে মালির কাজ করতে গেছ? হাতে ফাইল কেন?' জবাবটা নিজেই দিলেন। 'বুঝেছি। এমন একটা জায়গায় গেছ। রহস্য কি আর মিলবে না। তাছাড়া সঙ্গে ছিল জরজিনা পারকার...'

হেসে ফাইলটা টেবিলের ওপর দিয়ে পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।

মন দিয়ে রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। 'মিসেস ফিলটারের কাছে মাপ চেয়েছ তো, কিশোর? ভাগ্য ভাল, বাড়ি গিয়ে তাঁকে পাওনি সেদিন, নইলে আরও লজ্জা পেতে।'

'পাইনি বলেই ভুলটা আরও বেশি হয়েছে, স্যার,' স্বীকার করল কিশোর। 'নইলে জানতে পারতাম, নকল ম্যাকআরথারকে চিনে ফেলেছেন তিনি। আরও আগেই ধরা যেত হ্যারি আর বিংগোকে, জিনা আর মুসারও মরু-সফর হত না।'

'হুঁ,' তা ঠিক,' মাথা দোলালেন চিত্রপরিচালক। 'কিন্তু ডাকাতির পর পরই কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন মহিলা? টুইন লেকসে জায়গা কেনার টাকা পেলেন কোথায়?'

'ঘটনাগুলো অনেকটা, কি বলব, কোইনসিডেন্সই হয়ে গেছে। ডাকাতিও হলো, সেই সময় মিসেস ফিলটার খবর পেলেন, তাঁর এক ফুফু মরে মরে অবস্থা। দোকানে খবর দেয়ার সময় পাননি তিনি, আর কিছুটা গাফিলতিও বটে, দেননি। না দিয়েই চলে গেলেন ফুফুকে দেখতে, আল পেসোতে। সেটা মে আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। জান দিয়ে ফুফুর সেবা করলেন কয়েকদিন। কিন্তু বাঁচলেন না মহিলা, অনেক বয়েস হয়েছিল। চিরকুমারী ছিলেন, আর কোন আত্মীয় নেই। তাই, মৃত্যুর আগে যাঁর কাছ থেকে সেবা পেয়েছেন, সমস্ত সম্পত্তি তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তবে সেটা খুব বেশি কিছু ছিল না। তবু, সেটাই তখন ছিল মিসেস ফিলটারের কাছে অনেক বেশি। ফুফুর জায়গা বিক্রি করে দিয়ে টুইন লেকসে, তাঁর প্রিয় শহরে এসে জায়গা কিনলেন।

'বুঝলাম।...তা, নকল ম্যাকআরথারকে কি আদালতে হাজির করেছে?'

'করেছে। তার আসল নাম জনি হারবার। অনেক জায়গায় তার নামে পুলিশ ওয়ারেন্ট আছে। অনেক জায়গায় ঠগবাজি করে এসেছে। শেষবার করতে চেয়েছে ডাল্লাস-এর এক মস্ত ধনীর সঙ্গে। তাকে নিয়ে গিয়েছিল ডেথ ট্র্যাপ মাইন দেখাতে। শুধু ধাপ্পাবাজই নয়, পাকা জালিয়াতও সে। ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট আর জায়গার দলিল জাল করে মক্কেলদের দেখিয়েছে, সে কত বড় লোক। এককে জায়গায় গিয়ে একেক সময় একেক পরিচয় দিয়েছে। শেষবার ম্যাকআরথার সেজে এসেছে।

'তবে ডেথ ট্র্যাপ মাইনে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি জনি, সময়ও পায়নি অবশ্য। আংকেল উইলসনের কাছ থেকে জায়গা কিনেছে পঁচিশ হাজার ডলারের, কিন্তু দিয়েছে মাত্র এক হাজার। বুঝিয়েছে, স্টক মার্কেটে তার কোটি কোটি টাকা আটকে গেছে, এই ছুতো বলে, তারপর এক সঙ্গে বাকি চব্বিশ হাজার দিয়ে দেবে। আসলে আর এক পয়সাও দিত না। খালি সময় বাড়াত, ইতিমধ্যে বোকা কিছু মক্কেল জুটিয়ে ভাল রকম একটা দাঁও মেরে সরে পড়ত একদিন। আগেও এ-রকম করেছে বহুবার।'

কিশোর থামতেই রবিন বলল, 'কিন্তু এবার বাদ সাধলেন মিসেস ফিলটার। বুঝে ফেললেন লোকটা ম্যাকআরথার নয়। ফলে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে খনির মুখে গর্তে ফেলে রাখল জনি। পিকআপটা নিয়ে গিয়ে রেখে এল হ্যামবোনে। এমনভাবে সাজাল, যেন হঠাৎ জরুরী খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে বেড়াতে কিংবা অন্য কোন কারণে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার, কাউকে কিছু জানানোর সুযোগ পাননি। পিকআপটা হ্যামবোনে নিয়ে ফেলে এসেছে যাতে কেউ খুঁজে না পায়। পার পেয়েও যেত, কিন্তু এবারে জনির কপাল খারাপ। আমরা গিয়েছি টুইন লেকসে। তাছাড়া হ্যারি আর বিংগোও গেছে লুটের টাকার খোঁজে।'

'মেকসিকান দুই শ্রমিকের ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'জনি হারবারের সহকারী ছিল?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'ওদেরকে শ্রমিকের কাজ করার জন্যেই ভাড়া করে এনেছে জনি। বেড়া দেয়া, বাড়িঘর রঙ করানো থেকে শুরু করে খনিতে ডিনামাইট ফাটানো, সব কাজই করাত। তবে, ওরাও একেবারে সাধু নয়, সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে এসেছে, বেআইনী অনুপ্রবেশ, তাই জনির শয়তানী কিছুটা বুঝে থাকলেও মুখ বুজে ছিল। আর এ-কারণেই বেছে বেছে ওদেরকে ভাড়া করেছে জনি।'

'তবে লোকগুলো ভাল, মেকসিকোয় কাজের আশায়ই এসেছে, ক্রিমিনাল নয়,' রবিন বলল। 'সব খুলে বলেছে আংকেল উইলসনকে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের কাগজপত্র ঠিক করেছেন আংকেল, নিজের র‍্যাঞ্চে কাজ দিয়ে রেখে দিয়েছেন। জনির কুকুরটা নিয়ে এসেছে ভিকিখালা। এনেই আগে পেট ভরে খাইয়েছে, তার ভক্ত হয়ে গেছে কুকুরটা। রাতে তার বিছানার পাশে শোয়। পেট ভরা থাকে, ফলে মুরগীর দিকে ফিরেও তাকায় না আর, চুরির স্বভাবও চলে গেছে।'

'শুনে সুখি হলাম,' চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। 'চমৎকার একটা কেস। কিন্তু পুরোপুরি মীমাংসা হলো না সব কিছুর।'

'কোনটা, স্যার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বাড হিলারি খনিতে পড়ে মরেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই,' বললেন

পরিচালক। 'কিন্তু কেন মরেছে, জানা যাবে না। আর টাকাগুলোই বা কেন টি-ফোর্ডের সীটের তলায় লুকাল?'

'অনুমান করা যেতে পারে,' বলল কিশোর। 'সাময়িকভাবে হয়তো গাড়িতে টাকাগুলো লুকিয়েছিল হিলারি, তারপর খনিতে গিয়ে ঢুকেছিল আরও ভাল কোন জায়গা খোঁজার আশায়। তারপর কোন কারণে আর বেরোতে পারেনি। কারণটা কি, কোনদিন জানা যাবে না। আরও একটা ব্যাপার জানা যাবে না, খনিমুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখন সে জীবিত ছিল, না মৃত...'

'মৃতই হবে,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'নইলে হাঁকডাক শুনে মুখের কাছে চলে আসত। দেখলে তো আর তখন তাকে ভেতরে রেখে সীল করা যেত না।'

'কিন্তু তার আগেই যদি গর্তে পড়ে গিয়ে থাকে? পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলে তো বেঁচে গেছে, কিন্তু যদি জীবিত থাকে? ক্ষুধাতৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরেছে বেচারা...'

'এত বড় শাস্তি আল্লা পরম শত্রুকেও না দিক,' কথাটা অন্তর থেকে বেরোল মুসার।

'আরেকটা ব্যাপার,' বললেন পরিচালক, 'লাশটা নিশ্চয় আগেই দেখেছিল জনি?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'এ-জন্যে কাউকে খনিতে ঢুকতে দিত না, জানাজানি হলেই লোক ছুটে আসবে দলে দলে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ। জনির হয়েছে তাই। বেশি লোক যাতায়াত করলে কত রকম গোলমালই হতে পারে, তার আসল কাজে বাধা আসতে পারে, তাই ব্যাপারটা চেপে রাখতে চেয়েছিল।'

'হুঁম্,' মাথা দোলালেন পরিচালক।

'আপনার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যার,' পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। 'একটা ছোট স্যুভনির।' তামা মেশানো সোনার টুকরোটা বের করে দিল।

খুব আগ্রহ দেখিয়ে জিনিসটা নিলেন পরিচালক। 'থ্যাংক ইউ। খনি থেকে পাওয়া কাঁচা সোনার টুকরো বেশ কয়েকটা আছে আমার, কিন্তু ওগুলো কৃত্রিম, আসল একটাও নেই। তার ওপর আবার নকশা কাটা...আচ্ছা, তামা মিশল কি করে? কার্তুজের ভেতরে তো জানি, সীসা বা লোহার বল থাকে?'

'সেটাও জনি হারবারের কীর্তি,' হেসে বলল কিশোর। 'নিজেই কার্তুজ বানিয়ে নিয়েছে সে, লোহার বলের জায়গায় ছোট ছোট তামার টুকরো ভরেছে।'

'হুঁ, চালাক ঠিকই। ফেঁসে গেছে কপাল খারাপ বলে।...নুড়িটা কি করেছ?'

'জিনাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'ওটা ওর প্রাপ্য,' মুসা বলল, 'আরিব্বাবারে, অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মত মেয়ে...খুনে ডাকাতগুলোর সঙ্গেও যা...ইয়ে, যা...'

'গোঁয়ার্তুমি,' শব্দটা ধরিয়ে দিলেন চিত্রপরিচালক।

'হ্যাঁ, যা গোঁয়ার্তুমি করল। কিছুতেই হেঁটে যেতে রাজি হলো না ডাকাতগুলোর সঙ্গে। গেলে আর আমাদের খুঁজে পেত না হেলিকপ্টার। এই কেসই হত তিন গোয়েন্দার শেষ কেস।'

****